মার্জিন অফ মার্জিন: একটা অটেকনিকাল ভূমিকা

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

১।। অর্ডারি লেখা

"এবার একটা বড় ভূমিকা লেখো, মার্জিন অফ মার্জিন-এর", সোমনাথ বলেছিল, আমার টেবিলে ঠ্যাং তুলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে। "নন-টেকনিকাল পাঠকদের জন্যে একটা ভূমিকা, যে ভূমিকাটা পড়তে বা বুঝতে আর কোনো ভূমিকা লাগেনা"। দুতিন টুকরো কষা মাংস ছোট বাটিতে করে খেয়ে, তার হাড় চিবিয়ে গুড়ো করে দিতে দিতে বলেছিল, তাই বলে ওর বলাটার ভিতর সম্পাদকীয় আদেশের, অর্ডারের কোনো অভাব ছিল না। কেউ কেউ তাদের আদেশ-প্রদানের অবস্থানের সঙ্গে কী চমৎকার মানিয়ে যায়। "কী ... ইংরিজিতে সোশাল সায়েন্স করে যাচ্ছ, ও শালা কেউ পড়ে, এবার একটু লোকের কাজে লাগো?"

আসুন, এবার, অর্ডার মাফিক, একটু কাজে লাগা যাক। চলো পড়াই, কিছু করে দেখাই।

যে কোনো থিওরির কাজের সামনেই এটা একটা চ্যালেঞ্জ, কতটা সরল এবং সহজবোধ্য করে বলা যায়। স্টিফেন হকিং-এর ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম-এই বোধহয় ছিল, সমীকরণের সংখ্যার বর্গের ব্যাস্তানুপাতে পাঠকের সংখ্যা কমে যায়। আমাদের অবশ্য এই চিন্তাটারই কোনো মানে হয়না, নিজের লেখা আমি নিজে ছাড়া অন্য কেউ পড়ে কিনা এই বিষয়েই নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই, সেক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলার ওঠাই বা কী আর বসাই বা কী। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা তাও রয়েই যায়, কতটা সহজ করে লেখা যায়।

এ নিয়ে নানা জনের সঙ্গে নানা সময়ে কথা উঠেছে। 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' ছাপা হওয়ার পর থেকে। "বইটা ঠিক কী নিয়ে বলো তো", এরকম প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। যাদের প্রতি পছন্দটা কিঞ্চিৎ শীর্ণ, তাদের নয় বলা গেছে, "বইটায় যা ছাপা আছে হুবহু তাই নিয়ে"। কিন্তু অন্য আরো অনেককে উত্তরটা দিতে হয়েছে, যাদের প্রতি উত্তর দেওয়ার কোনো দায় আছে, অন্তত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়েছে। মাঝেমাঝে কিছুটা গুছিয়ে বলে উঠতে পেরেছি, মাঝেমাঝে আরো জটিল হয়ে গেছে। সেই বলা গুলো বলতে বলতেই লক্ষ্য করেছি, প্রায় প্রতিবারই শুরু করেছি আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে, সেখানের গত দু-তিন দশকের ইতিহাস, আমাদের হতাশা-উত্তেজনা-হতাশা-পুনর্নির্মাণ — এইসব।

আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল 'মার্জিন অফ মার্জিন' নামে কমিউনিটিতে। নেটে একটা এমএসএন কমিউনিটি বানিয়েছিলাম আমরা এই বইকে ঘিরে, 'মার্জিন অফ মার্জিন'। সেখানে, অ্যাড্রিয়ানা বলে একজন, বেশ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিল, বইটার বেশ অনেকটা জায়গা, রীতিমত চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারছে না। অ্যাড্রিয়ানা একজন ব্যস্ত নারী, তার নিজের কাজ, দুই ছেলে মেয়ে, অসুস্থ বোন (অ্যাড্রিয়ানার কথা মত ন্যাম যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যার ইনকিওরেবল অসুখ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস), সেই বোনের ছেলেমেয়ে, বর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে, শ্বশুর শাশুড়িকে দেখাশোনার কাজ, সব কিছুর পর অ্যাড্রিয়ানার পক্ষে বোধহয় সত্যিই কঠিন, কঠিন কেন অসম্ভবই বলা যায়, মম-এর (মম মানে ছোট করে 'মার্জিন অফ মার্জিন', এম ও এম) জার্গন-জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। তারপর সেই চেষ্টাই শুরু করেছিলাম, টেকনিকাল শব্দ বাদ দিয়ে একটা ভূমিকা লেখার।

বই লেখার সময় টেকনিকাল শব্দ রাখতেই হয়েছে। পলিটিকাল ইকনমি বা দর্শন বা ক্রিটিকাল থিয়োরির অন্যান্য অবস্থানগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে, আমাদের অবস্থানের মিল বা গরমিলগুলোকে স্পষ্ট করতে গিয়ে, ওরকম শব্দ অজস্র এসেছে। আর টেকনিকাল শব্দের নিজস্ব প্রয়োজন তো থাকেই। যে ভাবে এসেছে শব্দগুলো, কোনো কোনো জায়গায় ঠিক অর্থটা বোঝাতে গিয়ে ওই শব্দগুলো না ব্যবহার করে কোনো উপায় থাকেনা। জেদ করে যদি না করতে হয় তাহলে হয়তো প্রচুর প্রচুর পরিমানে, অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত রকমের, বেশি লিখতে হয়।

বাম রাজনীতি বা সেই সংক্রান্ত হতাশা আমাদের কাছে খুব চেনা কন্টেক্সট। অ্যাড্রিয়ানার কাছে দূরত্বের। ফ্লোরিডার তথা আমেরিকার রাজনৈতিক ভুবন সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের। বরং একাধিক সাপোর্ট গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকায়, কোনোটা যুদ্ধ-পীড়িত মানুষদের, কোনোটা শোকগ্রস্থদের, যার অনেকটাই একটা জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মবোধের সঙ্গে জড়িত, ধর্মটাকে, ধর্মবোধটাকে, ও অনেক বেশি চেনে। ওর ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল অনেক বেশি উপযোগী হবে যদি ধর্ম তথা ধর্মগত/ধর্মরিক্ত চিন্তাপদ্ধতির আলোচনা থেকে শুরু করা যায়।

এক্ষেত্রে, এই লেখাটার ক্ষেত্রে আমি এই দুটো জায়গাকেই রাখতে চাইছি। একটা রাজনৈতিক ইতিহাস। মানে, চালু রাজনীতির ব্যক্তিগত ইতিহাস। আর একটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়ে যাওয়া দার্শনিক অবস্থানগুলো।

অবশ্য ইতিহাস ব্যাপারটাই আদৌ ব্যক্তিগত ছাড়া অন্য কিছু হয় কিনা তাই নিয়ে আমার বেশ সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' ভাবুন। অনেকদিন আগে একবার ভেবেছিলাম, অনেকদূর লিখেও ফেলেছিলাম, একটা চিত্রনাট্য, মহাভারতের যুদ্ধ, একজন মারসেনারির, ভাড়াটে সৈনিকের, দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছিল কুরু-পক্ষে, তারপর যখন দেখল, এদের মানে কৌরবদের তো কাম-তামাম হয়ে এসেছে। তখন উল্টোদিকে, মানে পাণ্ডব-পক্ষে এসে যোগ দিল। ভেবে দেখুন, আমরা মহাভারতের রাজসভার দ্যূতক্রীড়ার উপাখ্যান জানি, তারপর যুদ্ধের। কিন্তু আমরা জানিনা ওই মারসেনারিটি তখন কী ভেবেছিল, কী দেখেছিল, কী কী দেখে ডিসাইড করেছিল সে কোনদিকে খেপ খেলবে। সেটা হত ওর ব্যক্তিগত ইতিহাস, যেমন, যে মহাভারতটা আমরা পড়ি সেটা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ব্যক্তিগত ইতিহাস। যে ইতিহাস যে তত্ত্বই লেখা হোক না কেন, তা ঐ ঐতিহাসিকের, ঐ তাত্ত্বিকের ব্যক্তিগত ইতিহাস বা তত্ত্ব। এই শেষ বাক্যটা আপাতদৃষ্টিতে কত ভালোমানুষ বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু আদতে তার ঠিক উল্টোটা। এই বাক্যটা বুঝতে পৃথিবীর তাবড় তাত্ত্বিকদের লেখকদের ঐতিহাসিকদের রাজনৈতিক নেতাদের কত শো বছর যে লেগে যাচ্ছে, তাও কি বুঝতে পারছে তারা? পারলো কই?

বিষণ্ণ অশোকের সৈন্যদল যখন কলিঙ্গ থেকে রিটার্ন নিচ্ছে, যে লোকটা তার সমস্ত জমিতে দাঁও লাগিয়ে, সব বেচেবুচে বড় কড়াই আর শোকেস কিনে বসেছিল, যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকদের ফুলুরি বেচে লাল হবে বলে, তাতে মেয়ের বিয়েরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে বলে, সে ঠিক কী চীৎকার করতে করতে মাথার চুল ছিঁড়েছিল যখন অশোক, সম্পূর্ণ আকস্মিক, ঘোষণা করলেন সিজফায়ার? ঘর হারানোর বেদনা তার ঠিক কোথায় কীভাবে বেজেছিল? বা, ফলতঃ, ফুলুরি বেচা আর হল না তো হায়, এবার খাবে কী? তখন তার মেয়ে তার উৎকলিকা পণ্যনারীত্বের ডেবিউ-র দিনে ঠিক কী রঙের শাড়ি পরেছিল? যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা কি এই তথ্যগুলো জানে? কিন্তু এই লোকগুলোর কাছে ইতিহাস তো এটাই। অশোকের কাছে কলিঙ্গ যেমন এই লোকটার কাছে তেলেভাজা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাহলে ওটা, মানে, অশোকের কলিঙ্গযুদ্ধটা কেন ইতিহাস? এবং এটা, মানে তেলেভাজাটা কেন নয়? বেশি লোক ওটায় ইন্টারেস্টেড বলে? দার্শনিক শঙ্করের একটা মজার প্যারাডক্স শুনুন। আমরা জেগে থাকা অবস্থাকে বলি বাস্তবতা, আর নিদ্রিত অবস্থাকে স্বপ্ন বা মায়া, কেন? বেশির ভাগ সময় জেগে থাকি বলে? যদি কেউ বেশির ভাগ সময়টা ঘুমোয়?

অর্থাৎ, ইতিহাস মানেই ব্যক্তিগত ইতিহাস। এবার, প্রত্যেক ব্যক্তির একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। তাহলে সমষ্টি কোথায়? সমষ্টির ইতিহাস? সমষ্টির ইতিহাস বলতে আদৌ কি কিছু হয়? এখানে, একটু অতিনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া যাক। অতিনিয়ন্ত্রণ মানে ওভারডিটারমিনেশন। একমুখী নিয়ন্ত্রণ আমাদের দর্শন ভাবনার ক্ষেত্রে একটা চিরাচরিত মডেল। যেখানে দুটি সত্তার একটি কারণ, অন্যটি কার্য। কারণ কার্যকে নির্মাণ ও নির্ণয় করে। এটাই একমুখী কার্য-কারণ সম্পর্কের ছক। সেখানে অতিনিয়ন্ত্রণ পাল্টা স্রোতকেও নিয়ে আসছে তার ছকে। কার্যও যখন কারণকে নির্মাণ করছে। কার্যও যখন কারণের কারণ। তাই কার্য আর কারণ কেউই আর কার্য বা কারণ রইল না। দুজনে হয়ে পড়ল দুটি সত্তা মাত্র যারা পরস্পর পরস্পরকে নির্মাণ ও নির্ণয় করে।

২।। অতিনিয়ন্ত্রণ

আমাদের উদাহরণটাকেই ভাবুন। সম্রাট অশোক। সম্রাট অশোকের ইতিহাস আর ওই তেলেভাজা-ওয়ালা আর তার কন্যার ইতিহাস। এরা অবশ্যই পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু, আপাতত, দেখে যা মনে হচ্ছে — সম্পর্কটা একমুখী। অশোক কী করলেন বা বললেন তার উপর এই তেলেভাজা-ওয়ালা নির্ভর করছে, কিন্তু, অশোক, যা মনে হয়, সারা জীবনে একবারও, জানতেও পারেননি এই লোকটির কথা। যে কারণে, দেখবেন, কোনো ইতিহাস বইয়েই লোকটার উল্লেখ নেই।

যদি সম্পর্কটা একমুখীই হয় তখন আমরা তাকে বলি নিয়ন্ত্রণ। রাজা প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দাম চাহিদাকে। সার সেচ এবং বীজ কৃষিকে। ভর এবং অভিকর্ষ ওজনকে। অঙ্কের ভাষায় বললে — ফাংশন। অপেক্ষক। এই অপেক্ষক-সম্পর্ককেই আমরা বলি নিয়ন্ত্রণ। আমরা ইতিহাস যেভাবে পড়ি, তাতে বলা যায়, সম্রাট অশোকের ইতিহাস দ্বারা ওড়িয়া তেলেভাজা-ওয়ালাটির ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। বা, অঙ্কের ভাষায় বললে, তেলেভাজাওয়ালার ইতিহাস হল সম্রাট অশোকের ইতিহাসের একটা ফাংশন। অশোকের ইতিহাস নামক কারণের একটা কার্য।

তেলেভাজাওয়ালার ইতিহাস = f(অশোকের ইতিহাস)

কিন্তু সম্পর্কটা তো এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি জটিল এবং সুদূর পরাহত হতে পারে? ধরুন আপনার প্রোমোশনে আপনি অফিস থেকে প্রাইজ পেলেন একটা টাইম মেশিন। সেটায় করে, আপনার বাড়ির লোকজনদের নিয়ে, গেলেন জুরাসিক যুগের ডাইনোসর দেখতে। ওসব স্পিলবার্গ-মার্গ না — একদম ওরিজিনাল টেরানোসোরস দেখে টেরা হয়ে যাওয়া চোখে যখন দেখলেন আপনার হৃদপিণ্ডটা গলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ধকধক করছে, ঝটিতি আপনি ইগনিশন টিপলেন, কিন্তু তাড়াহুড়োয় স্টার্ট নেওয়া আপনার মেশিনের ডানায় পিষে গেল একটা অকিঞ্চিতকর পোকা।

অত্যন্ত সামান্য। কিন্তু, ধরুন, এই পোকাটার মধ্যেই সেই জেনেটিক সম্ভাবনা ছিল যা থেকে বদল হয়ে পরে গড়ে উঠবে সেই প্রজাতি, যা, বহু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে জন্ম দেবে ভারতীয় বিছে নামক কীটটির। এতে, আপনাদের ভ্রমণ-মধ্যবর্তী এই বিপুল কালে ঘটে গেল অনেককিছু। ধরুন বিছে না থাকায়, মহাবীর কর্ণের কোলে মাথা রেখে যখন ঘুমোচ্ছিলেন পরশুরাম, তখন কোনো কীট কর্ণকে দংশন করল না, কর্ণকেও কিছু সহ্য করতে হল না। পরশুরামও বুঝতে পারলেন না যে আসলে কর্ণ একজন ক্ষত্রিয়। কোনো শাপ দিলেন না। এবং কর্ণও কৃষ্ণার্জুনকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন করে দিল। দুর্যোধন এবং শকুনি হিরো হয়ে গেল।

আপনি টাইম মেশিন থেকে নামতে নামতেই শুনলেন, বাড়ির সামনে ইলেকশন মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে, "সবসে বড়া রাবণ কৌন, আদবানি আওর কৌন।" ভাবলেন, এটা সিপিএম-এর মিছিল। তারপর দেখলেন, ও হরি, এতো পদ্মফুল নিয়ে বিজেপিরই মিছিল। শুধু রাম নয়, রাবণ এখন ন্যাশনাল হিরো, বিজেপি লড়ে যাচ্ছে রামজন্মভূমি নয় রাবণলীলাভূমির দাবিতে। আপনার সেই একটা পোকা নিধন থেকে এতবড় একটা কেলো ক্যাঁচাল কেরোসিন হয়ে গেছে জাতীয় ইতিহাসে।

ধরুন ওই তেলেভাজা-ওয়ালাটি অশোকের ব্যোম-কবন্ধ-সন্দর্শনের আগের সন্ধ্যায় শিবিরে এসে আসব-মাধ্বী-মদিরার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে গরম গরম ঝাল আলুর চপ বেচে গেল। অশোক তাই খেয়ে সারারাতে একশো তেত্রিশ বার প্রাতঃকৃত্যে গেলেন। পরের দিন যুদ্ধ করবেন কি, পুরো ফ্ল্যাট, গেলাস গেলাস ইলেক্টরাল খেয়েও বাঁচেন না মরেন তাই সন্দেহ। হতেই তো পারে, আকাশে ওসব কবন্ধের নাচ ফাচ পুরো মাইথলজি। আসল হল তেলেভাজা। বা সত্যি যদি এমনটা ঘটে নাও থাকে, ওই এক তেলেভাজার কারণেই বদলে যেতেই পারত ভারতের ওই মুহূর্তের ইতিহাস, তাই সেখান থেকে ক্রমগজায়িত পরবর্তী প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি যুগের ইতিহাস?

এ তো গেল চ্যাংড়ামি। আসল কথাটা যেখানে সেটা হল, এমন একটা সর্ম্পক দেখান তো যেখানে সম্পর্কটা একমুখী? সত্যিই একমুখী? এবং সম্পর্কটা শুধু ওটুকুর মধ্যেই নির্দিষ্ট?

ধরুন, আপনি একটি ছাত্রকে বললেন, "ভালো করে লেখাপড়া করো, রেজাল্ট ভালো হবে"। আঙ্কিক ভাবে বললে, আপনি তাকে জানালেন 'রেজাল্ট' নামক বিষয়টি লেখাপড়ার সময় বা 'আওয়ার' নামক বিষয়ের ফাংশন।

রেজাল্ট = f(আওয়ার)

এবার, ছেলেটি সখেদে জানাল পড়বে কী — তার তো বইখাতাই নেই যথেষ্ট পরিমানে। আপনি আপনার তত্ত্বকে বিস্তৃত করলেন, রেজাল্ট শুধু আওয়ার নয়, মেটিরিয়ালস বা পড়াশোনার সরঞ্জামেরও ফাংশন। এরকম এক এক করে আপনি ঢুকিয়ে আনলেন হেলথ, ফুড, ট্রান্সপোর্ট — এগুলো না হলেও ছেলেটার রেজাল্ট ভালো হবেনা। আপনি আপনার ফাংশনটাকে বাড়িয়ে করলেন :

রেজাল্ট = f(আওয়ার, রিডিং মেটিরিয়ালস, হেলথ, ফুড, ট্রান্সপোর্ট)

তাতেও কি হল? ধরুন ছেলেটির বাবা-মা ভীষণ ইগো-ক্ল্যাশে ভোগে, প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে নিজেদের ভিতর। পারিবারিক পরিবেশের জন্যে একটা তফাৎ তো ঘটেই — ধরুন একটা 'হাম আপকে হ্যায় কৌন'-এর পরিবার, আর একটা 'আকেলা হাম আকেলা তুম' বা জ্যাকি শ্রফ-ডিম্পল এর 'কাশ'-এর পরিবার। যতক্ষণ সময়ই বই নিয়ে বসে থাকুক না কেন, তাদের মনসংযোগ, স্মৃতি, ধারণক্ষমতা সবজায়গাটাতেই তফাৎ ঘটবে। আপনি কতকিছুকে আনবেন আপনার ফাংশনের আওতায়? তারপরেও রয়ে যাবেনা দেশের সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাস, ছাত্রটির ব্যক্তিগত আবেগ-যৌনতার সমস্যা?

অর্থাৎ, যে কোনো একটা ক্ষুদ্র কিছুকেও খুব ভালো ভাবে ধরতে গেলে, বুঝতে গেলে আপনাকে এনে ফেলতে হবে সমগ্রটাকে। সমগ্র — মানে সমস্ত কিছু। প্রতিটি কিছু। প্রতিটি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিছু। কারণ, সবকিছুই আর প্রতিটি কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তারপরেও আছে। ধরুন, আমরা তো লিখেছিলাম,

রেজাল্ট = f(আওয়ার)

কিন্তু এর উল্টোটাও কি সত্যি নয়?

আওয়ার = f(রেজাল্ট)

দেখেননি, একবার একটা সাফল্য পেয়ে যাওয়ার পর, একটা ছাত্রের উৎসাহটাই কী ভাবে বদলে যায়, তার নেওয়ার ক্ষমতাটাই? যখন আপনি আর এই একমুখী নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন না, বলছেন অনেকগুলো উপাদানের প্রত্যেকটাই অন্য প্রত্যেকটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন আপনি আসলে অতিনিয়ন্ত্রণের, ওভারডিটারমিনেশনের কথা বলছেন।

প্রচলিত দর্শন-ভাবনা কাজ করে একমুখী কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে। যেখানে দুটো সত্তার একটা কারণ, অন্যটা কার্য। কারণ কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই একমুখী নিয়ন্ত্রণ ভেঙে তার জায়গায় অতিনিয়ন্ত্রণ অন্য আর এক রকম সম্পর্কের কথা বলল। যেখানে এই দুটো সত্তার মধ্যে একমুখী সম্পর্কটা আর নেই। কার্যও যখন কারণকে নিয়ন্ত্রণ করে, বা, কার্যও যখন কারণের কারণ। অর্থাৎ, কেউই আর কারুর কারণ বা কার্য নয়। দুটি সত্তার প্রত্যেকটিই অন্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানে, নির্মাণ ও নির্ণয় করে। অর্থাৎ, অতিনিয়ন্ত্রণ একমুখী সম্পর্কের জায়গায় একটা উভয়মুখী সম্পর্ককে নিয়ে এল। এবং মাত্র দুটি সত্তা নয়, যে কোনো সংখ্যক উপাদানের ভিতর পারস্পরিক ভাবে এই ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন আলথুসেরের সমাজভাবনা আলোচনার সূত্রে আমরা এই সম্পর্ককে দেখব তিনটি উপাদানের ভিতর। পুরোনো একমুখী সম্পর্কের জায়গায় ডায়ালেক্টিক্স একটা দ্বিমুখী পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক এনেছিল, অতিনিয়ন্ত্রণ সেই ছকটাকেও আরো বদলে তোলে আরো জটিল বাস্তবতাকে বোঝাতে গিয়ে। আমরা পরে ডায়ালেক্টিক্স আলোচনার সূত্রে এই প্রসঙ্গে কথা বলব।

এবং, মজাটা দেখুন, কার্য-কারণ সম্পকের ভিতর কারণ ছিল মূল এবং প্রাথমিক, আর কার্য হল উপজাত এবং পরবর্তী। ইম্পর্টান্সের হায়েরার্কিতে, গুরুত্বের ক্রমে, কারণ উপরে, কার্য নিচে। অতিনিয়ন্ত্রণের কাঠামোতে প্রতিটি উপাদানই হয়ে দাঁড়াল অন্য প্রতিটি উপাদানের সমান। কেউ কারুর চেয়ে বড় বা ছোট নয়।

৩।। ওপ্‌নিং, ক্লোজার, এন্ট্রি পয়েন্ট

কিন্তু, আর একটা জায়গাও খেয়াল করুন, ছেলেটির — ওই ছাত্রটির কী করা উচিত এটা বলার বা বোঝার জন্যে তো অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায়না। সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হয়। অর্থাৎ, এই জটিলতা, আরো জটিলতা, আরো আরো জটিলতার মেলট্রেনটা এক জায়গায় থামাতেই হয়, আমরা তাই থামাই। মানে, একটা সমস্যাকে বুঝতে গিয়ে কতদূর গভীরতা অব্দি আমরা তাকে অনুধাবন করব, তার একটা সীমা আছে। অসীম সংখ্যক জটিলতা সেখানে থাকতে পারেনা। কিন্তু জটিলতা গুলো আসলে, আমাদের চারপাশের বাস্তবতার মতই, অসীম-সংখ্যক। তার মানে, আমরা, আমাদের প্রয়োজন মোতাবেক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী মোতাবেক, তাতে আমাদের নিজস্ব সীমাটা নিয়ে আসি।

আমাদের উদাহরণটাকেই ধরুন। ভাবুন এবার, ছাত্রটির সামনে তার একজন শিক্ষক, যিনি চান যে তার একটি ছাত্র অন্ততঃ সত্যিকারের বড় কিছু করুক। ছাত্রটির বাবা, যিনি চান, কোনোক্রমে তাড়াতাড়ি দাঁড়াক ছেলেটি, তার নিজের রিটায়ারমেন্টের দিন ঘনিয়ে আসছে। আর ধরুন, ছেলেটি একটি নাটকের গ্রুপ করে, তার পরিচালক, যার ধারণা, ছেলেটির বেশ কিছুটা ক্ষমতা আছে নাটকের এলাকায়। ওই পাগল অধ্যাপকটি তাকে বলবেন, আর কোনো দিকে না তাকিয়ে পড়ে যেতে, লেখাপড়া করে যেতে, যদি তাতে পরিবারটির অর্থনৈতিক সঙ্কটও ঘটে সেদিকে না তাকিয়ে — বড় কিছু করতে গেলে কিছুটা স্বার্থপর তো হতেই হয়। ছেলেটির বাবা বলবেন, এমন একটা কোনো লাইনে যেতে যেখানে যত তাড়াতাড়ি পারে দাঁড়ানো যায়। আর পরিচালকটি বলবেন, সিরিয়াস বাংলা নাটকের আজ বড়ই দুর্দিন, তোমার ক্ষমতা যখন আছে তাকে ছেড়ে যেওনা। পাশ চাকরি সংসার ধর্মের ষাঁড় বিদেশভ্রমন এতো সবারই হয়, নাটকটা সবার হয়না, সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।

দেখুন, এই তিন জন — অধ্যাপক, পিতা এবং পরিচালক, এদের তিনজনেরই মিল একটা জায়গায়, তিনজনেই একটা না একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন, মানে, অনন্ত জটিলতায় না গিয়ে কোথাও না কোথাও সীমিত করে নিয়েছেন তাদের দৃষ্টিক্ষেত্রটাকে। আর তাদের তফাৎটা এখানেই যে তারা তিন জনে কথা বলেছেন তিনটে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে। তার কোনোটাই ভুল নয়, মিথ্যা নয়, বোকা নয়, শুধু তাদের গুরুত্বপ্রদানের এলাকা গুলো আলাদা।

যে কোনো রাজনীতি বা রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ভাবুন। এদের মোদ্দা কথাটা কী? ধরুন, মমতা বললেন, বুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে ভাঁওতাবাজি করছেন, বা জ্যোতি বসু বললেন, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করাটা ঐতিহাসিক ভুল হয়েছিল। বা, বাজপেয়ী বললেন, মসজিদ ভাঙাটা জাতীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এর যে কোনো মতের পিছনেই জগত সংসার তথা ভারতবর্ষ কেমন হওয়া উচিত তার সম্পর্কে এদের নিজের নিজের ধারণা। অর্থাৎ একটা তত্ত্বের জগত। সেটার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এরা প্রত্যেকেই কিছু জিনিষকে ভালো তথা কাম্য বলে মনে করছেন, এবং, উল্টোদিকে, কিছু জিনিষকে খারাপ। এবং সেই অনুযায়ী ভালো জিনিষকে বাড়িয়ে তুলতে চাইছেন তারা, এবং মন্দ জিনিষকে কমাতে। যদি সেই কুখ্যাত মন্তব্যটা আমরা মেনেও নি, যে, পলিটিশিয়ান হল এমন একটা পাছা যার উপর কোনোদিন কোনো সত ভদ্দরলোক বসেনি, অর্থাৎ, এরা মুখে যা বলছেন তা পাবলিকের জন্যে, মনে মনে অন্য কিছু ভাবছেন, সেক্ষেত্রেও তাদের সেই ভাবনা এবং তাদের সেই বলা — দুটোর ক্ষেত্রেই ওই তত্ত্ব-এবং-ভালোমন্দ-বিচার মডেলটা প্রযোজ্য। যা চাইছেন সেটা কেন চাইছেন এ বিষয়ে তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের একটা মতামত আছে।

এই মতামত অর্থাৎ থিয়োরি। ভালো-মন্দ বিচার অর্থাৎ জাজমেন্ট। এবং সেই মোতাবেক পরামর্শ-মতামত অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন। এই তিনটে উপাদানকে মিলিয়ে একটা রাজনৈতিক অবস্থান। বা, যে কোনো অবস্থান। যে কোনো বিষয়ে কোনো মতামত কোনো কথা আপনি বলতে যান না কেন, আপনিও আসলে এর মধ্যে দিয়ে চলেছেন। "ওসব থিয়োরি ফিয়োরি বুঝি না ভাই, যা মাথায় আসছে তাই বলছি", এই কথাটার মধ্যেও এই মডেল রয়েছে, অনেকগুলো তত্ত্বের একটা সমাহার। যেমন এক, থিয়োরি আমি বুঝিনা, কারণ, থিয়োরি বোঝার আমি দরকার মনে করছি না, বা, আমার ইচ্ছে নেই। দুই, থিয়োরি ছাড়াই বেশ ভালো বেঁচে থাকা যায়, মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে কোনো থিয়োরির দরকার পড়েনা। তিন, সম্পূর্ণ থিয়োরি বাদ দিয়েই মানুষের মাথায় কোনো কথা আসতে পারে, বা কথা আসার জন্যে কোনো সচেতন ভাবনার দরকার পড়েনা। অথচ দেখুন পুরোটা মিলিয়ে এটাই একটা থিয়োরি, জাজমেন্ট এবং প্রেসক্রিপশন।

তার মানে পৃথিবীর প্রতিটি সচেতন শব্দমালার, বাক্যের, অবস্থানের পিছনেই একটা থিয়োরি-জাজমেন্ট-প্রেসক্রিপশন আছে। এবং, তার মানেই, এছাড়াও রয়েছে একটা সীমায় বেঁধে ফেলা। কারণ, মোট বাস্তবতা, এই ব্রহ্মাণ্ড, জগত-সংসার সমস্ত অর্থেই অসীম, তার পুরোটাকে বিচারের আওতায় আনা যায় না, কখনোই না, কারণ, যদি এমনকি সুপার কম্পিউটার নিয়ে সেই চেষ্টাটাও করা হয়, চেষ্টা করা কালীনই সংসার বদলে যেতে থাকবে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ওই সুপার কম্পিউটার এবং তার চেষ্টার ক্রিয়াটা ওই বিচারের বাইরে থেকে যাবে। পুরোটাকে কখনো কোনো ভাবেই জানা যায়না।

পুরোটাকে কখনো কোনো ভাবেই জানা যায় না। এই কথাটাকেই আর এক ভাবে বলা যায়, "পুরো" বা সমগ্র বলেই কিছু হয়না, নেই। কারণ, "পুরো" এই শব্দটাই তো জানাজানির প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত একটা শব্দ তথা ধারণা, আর তাই, "পুরো" কী তা যদি জানাই না যায়, ধারণাই না করা যায়, তার মানে "পুরো" নামের শব্দ বা ধারণাটাই নেই।

আবার আমরা আমাদের ওই ছাত্রটির উদাহরণে ফিরে আসি আসুন। সে তার বাবার, মাস্টারমশায়ের, নাটকের গ্রুপের দাদার সব পরস্পরবিরোধী মতামতে ঘাবড়ে গিয়ে একজন দার্শনিকের কাছে গেল। প্লিজ আমায় বলুন তো কার মতামতে ভরসা করি এবং কেন? দার্শনিক এখানে কী উত্তর দেবেন? তিনি একটু মুচকি হাসবেন। তারপর তাকে থিয়োরির ওপ্‌নিং এবং ক্লোজার বোঝাবেন। দেখো বাবা, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। তোমার কী করা উচিত তা যদি নিশ্চিত ভাবে জানতে হয় তাহলে প্রথমে তোমার নিজেকে জানতে হবে। তারপরে পৃথিবীকে। তারপর মতামত দিতে হবে এই পৃথিবীতে কী করা তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। ধরো যদি তোমার নিজেকে জানাটা এবং পৃথিবীকে জানাটা মোটামুটি একটা সাধারণ ধারণার পরে ছেড়েও দাও, এবার আসবে কোন জাজমেন্ট এবং প্রেসক্রিপশন তুমি ব্যবহার করবে, তার প্রশ্ন। তখন আসবে তোমার প্রবণতার প্রশ্ন। কিন্তু সেই প্রবণতাও তো অনড় কিছু না। তুমি তো নিজেও বদলাতে থাকবে। হয়তো নাটকটা বেশ কিছুদিন করে চলার পরেই তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে, নাটকে তোমার কতটা বিতৃষ্ণা। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা তুমি জানবে কী করে? তাই, এটা বোঝো, বাবা, মুচকি হাসা ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব না।

দার্শনিক এখানে তার চিত্রনাট্যে একটু স্মিতহাস্য ও নিষ্ক্রিয়তা দিতেই পারেন। কিন্তু ছাত্রটি তো পারেনা। তাকে, তার চারপাশের জগত সংসারের মতই, কিছু না কিছু সিদ্ধান্তে তথা ক্রিয়ায় পৌঁছতে হয়। এবার স্টেপগুলোকে লক্ষ্য করুন।

এক। ছেলেটা কিছুই ভাবছেনা, অভিভাবক যা বলছে তাই সে করছে। অচেতন, কারণ তার কাছে কোনো বিকল্পই নেই।
দুই। একাধিক বিকল্প গজিয়ে উঠলো তার সামনে। একাধিক থিয়োরি-জাজমেন্ট-প্রেসক্রিপশন।
তিন। বাবা, মাস্টারমশাই, নাটকের দাদা — এদের বিভিন্ন প্রস্তাবের বিকল্পগুলো এলো তার সামনে। সে এবার ভাবতে শুরু করলো। সচেতন। পৃথিবীর জটিলতাগুলো তার চিন্তার কাছে উন্মুক্ত হতে শুরু করলো। এটাই উন্মোচন বা ওপ্‌নিং।
চার। কিন্তু এই উন্মোচন আসলে অনন্ত। একজায়গায় তাকে থামতেই হবে। সেই খানটায় থমকে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে হবে, "যাকগে, যা মনে হচ্ছে এটাই ঠিক"। এই "যা মনে হচ্ছে" বাক্যাংশটির পিছনে আর একটি অনুচ্চারিত অংশ আছে। পুরো কথাটা হল, "এই অব্দি ভেবে যা মনে হচ্ছে"। একটা নির্দিষ্ট সীমা অব্দি ভেবে তাকে থেকে যেতে হয়েছে। সেই সীমাটাই হল ক্লোজার বা সমাপ্তি।

পৃথিবীর কোনো তত্ত্বের পক্ষেই কখনোই, সংজ্ঞাগতভাবেই, সম্ভব না সম্পূর্ণকে ভেবে ওঠা। কারণ, আমরা আগেই বলেছি, সম্পূর্ণ বলেই কিছু হয়না। পৃথিবীকে সে একটা দিক থেকে খুলতে শুরু করে, সেটা তার ওপ্‌নিং। এবং যে সীমা অব্দি সে এগোয় সেটা তার ক্লোজার।

এবার দার্শনিকের বলা সেই "প্রবণতা"-র প্রশ্নে ফেরত আসুন। নানা জন নানা জায়গায় ওপ্‌ন এবং ক্লোজ করছেন: বাবা, মাস্টারমশাই, নাটকের দাদা। প্রত্যেকে তার নিজস্ব প্রবণতার উপর দাঁড়িয়ে, যেখানটা যে দেখতে চায় সেটাই সে দেখে, এটাই তার প্রবণতা। তার দৃষ্টিকোণ। যার তাত্ত্বিক নাম এন্ট্রি-পয়েন্ট বা প্রবেশ-পথ। এই ওপ্‌নিং ক্লোজার এন্ট্রি-পয়েন্ট দিয়ে বাস্তবতাকে বুঝতে চেয়েছেন রেজনিক-উল্ফরা। তারা এই পুরো অবস্থানটার নাম দিয়েছেন স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিম। কৌশলগত সারবাদ। আমরা পরে অনেক বিশদভাবে এসেনশিয়ালিজম-এর আলোচনায় আসব। কিন্তু, যতটুকু আমরা এর মধ্যেই পড়েছি তার ভিত্তিতে দেখুন, ইতিহাস এক না অনেক, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত একপিস ইতিহাস। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ইতিহাসকে ইতিহাস বলে ভাবছি, যেমন, অশোকের ইতিহাস, যেমন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখা ইতিহাস। কারণ, আমরা ধরে নিচ্ছি ওই ইতিহাসগুলো একভাবে তাদের সময়ের সারকে ধারন করে, ওইসময়কার অন্য সমস্ত ব্যক্তিগত ইতিহাসকে কোনো এক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করে, প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো এক ভাবে মানে কী ভাবে? এসেনশিয়ালি করে। মূলগত ভাবে করে। মোদ্দা কথায় করে। সমস্ত ব্যক্তি-ইতিহাসকেই, ঐ তেলেভাজাওয়ালার ইতিহাসকেও আমি তাদের মূল গতিটার জায়গায় অন্তত বুঝে যাব, যদি অশোকের ইতিহাসটা জানি, এরকমই ভেবে নেওয়া হয়। এটাই এসেনশিয়ালিজম। একটা মূলগত জায়গা দিয়ে সবটাকে বুঝে যেতে পারি এরকম ভাবা।

এবার এটা যদি না করতে চাই, তাহলে কী করব? অনন্ত সংখ্যক মানুষের অনন্ত সংখ্যক ইতিহাস অনন্ত সংখ্যক খুঁটিনাটিতে পড়তেই থাকব অসীম সময় ধরে? তাতো কাজের কথা না। আমাকে একটা জায়গায় থামাতেই হবে। তার মানে কী দাঁড়াল পুরোটা?

আমরা পুরোনো কিছু এসেনশিয়ালিজম থেকে ভেঙে বেরোলাম। এটাই ওপ্‌নিং। ব্যাখ্যাটা চলছে। তারপর একটা জায়গায় সেটাকে থামিয়ে দিলাম। এটাই ক্লোজার। কিন্তু কেন সেটাকে ওখানেই থামালাম তার একটা নির্দিষ্ট কারণ থাকবে, আমি কী করতে চাই বলে থামাচ্ছি তার একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা। এটাই এন্ট্রি-পয়েন্ট। এবার এই পুরোটাকে মিলিয়ে আমি যেটা করলাম এটা একটা আত্মসচেতন এসেনশিয়ালিজ, পুরোনো এসেনশিয়ালিজম নয়। আমি বললাম এটা আমার ব্যক্তিগত তত্ত্ব। কিন্তু এই ব্যক্তিগত তত্ত্বের মধ্যে রয়ে গেছে আমার এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি-অবস্থান। আমি নাটকের প্রসার চাই অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে তাই আমি ছেলেটাকে এটাই বলেছি। এটাকে রেজনিক উল্ফ ডেকেছেন স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম। তারা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম করেছেন শ্রমিক শ্রেণী বা ওয়ার্কিং ক্লাসকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুরো বাস্তবতাটাকে দেখেছেন। ক্লোজ করেছেন শ্রেণীর জায়গা থেকে। এই স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম বলার মধ্যেই আরও অনেক ব্যক্তিগত ইতিহাসের সম্ভাবনাটা রয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের কাউকেই উড়িয়ে দিচ্ছি না, কারণ, আমি জেনে গেছি এসেনশিয়ালিজম নামের বোকামিকে যে ভেবেছিল ইতিহাস অনেক না এক।

৪।। রাজনৈতিক শূন্যতা

ফেরত আসা যাক আমাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ইতিহাস-এর প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত: এই ব্যাপারটায় আর একটু জোর দেওয়া দরকার এই জন্যে যে যে বইটার ভূমিকা এখন লিখছি সেটা আমাদের তিনজনের লেখা। তার মধ্যে অজিতদা আর অঞ্জনের জায়গাটা আমার থেকে আলাদা হতে পারে, এবং, কতকগুলো জায়গাতে তো নিশ্চিতভাবেই আলাদা। এই বইটা ঠিক কী নিয়ে এই কথাটা বোঝাতে আমার কাছে জরুরি মনে হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাগুলোকে নিয়ে আসা। সেই অভিজ্ঞতাগুলো ব্যক্তিগত। আমার। আমার সঙ্গে এই বইটার এবং এই বইটার পিছনের ভাবনাচিন্তাগুলোর সম্পর্কটা নির্ণীত হয়েছে অনেকটাই আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই তাদের বাদ দিয়ে তত্ত্বের বই লেখাই যেতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্বের সঙ্গে জ্যান্ত জীবনের সম্পর্কটাকে তুলে ধরা আমার পক্ষে শক্ত।

এখানে আমি একটা স্যাম্পল। আমার মতো আরো অনেককে আমি চিনি। যাদের জীবন এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কটা আমার সঙ্গে ভীষণ ভাবে মেলে, এবং তৈরি হয়েছে ভীষণ একই রকমের একটা ঘটনা পরম্পরায়। সেই ঘটনা পরম্পরার কিছু ডিটেইলস আনছি এখানে পদ্ধতিটাকে বোঝানোর জন্যে। আমি সিপিআইএম রাজনীতি করতাম। আটাত্তর থেকে নববই এই বছর গুলো আমার জীবন মূলতঃ সিপিআইএম সাংগঠনিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে। আর সবই সেখানে ছিল, কিন্তু তা সবই নির্ণীত হয়েছে এই মূল কেন্দ্রীয় উপস্থিতির দ্বারা।

সময়টাকে খেয়াল করুন। এটাই সেই সময় যখন বাম-রাজনৈতিক কর্মীর বিপ্লবী-বীর-বিদ্রোহী এই সামাজিক পরিচিতিটা বদলে যাচ্ছিল দালাল-প্রোমোটার-ধান্দাবাজ এই পরিচিতিতে। তখন প্রায়ই নিজেকে, নিজেদের নিজেরা এই প্রশ্নটা করতাম, সিপিআইএম রাজনীতি মানে কি পুরোটাই এই দ্বিতীয় পরিচয়টা? ঘেন্নাটা বাড়ছিল। শেষ অব্দি এতটাই বেড়ে গেছিল যে পার্টিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবং ছাড়তে যে কিছুতেই মন মানছিল না এটাও ঠিক।

কাঁটাকলে এমএসসি পড়ার সময় আমার এক সহপাঠী আমার সঙ্গে আমার বাড়ির রাজনীতির কারণে অশান্তির কথা শুনে বলেছিল, "সেকি, অশান্তি হয় কেন, তুই তো সিপিএম করিস। ওটা তো এখন একটা ডিগ্রীর মত, চাকরি টাকরি পাওয়া যায়।" সহপাঠীর কথায় রাগিনি, কারণ জানতাম, ও মিথ্যে কথা বলছে না। আবার কষ্টও পেয়েছিলাম, কারণ, ওর সত্যিটা তো আমার সত্যির সঙ্গে মিলছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, সত্যের বহুবচনতার এতো জলজ্যান্ত উদাহরণ আমার জীবনে বোধহয় কমই আছে।

এই পুরো সময়টা জুড়ে আমি আমার নিজস্ব সত্যিকে চারপাশের মানুষের সত্যের থেকে প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত হয়ে যেতে দেখছিলাম। সেটা ঘটছিল পার্টির ভিতরেও। যেসব লোকদের ব্যক্তিগত ভাবে চোর জুয়াচোর মিথ্যেবাদী লোভী এবং নষ্ট বলে জানতাম তাদের দেখছিলাম ক্রমশঃ বড় আরো বড় নেতা হয়ে যেতে, রাজত্ব করতে — এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটাই ছিল আইন। বরং অন্য রকম লোকেরাই ছিল হাতে গোনা। সেই লোকগুলোও, যে দু-চারজন, মুহূর্মুহু মরে যাচ্ছিল, পার্টি থেকে বসে যাচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে ওই প্রশ্নটারও উত্তর দেওয়া যাচ্ছিল না, সিপিএম করা মানে কি পুরোটাই এই? বাংলা বাজারে বিজেপি ল্যান্ড করে গিয়ে প্রশ্নটাকে আরো জটিল করে দিয়েছিল, অন্ততঃ সিপিএমকে ভালোবেসে যদি না-ও হয়, বিজেপি-আরএসএস-বজরং-ভিএইচপির ভয়ে।

তখন ওই প্রশ্নটা মাথায় গজিয়ে উঠছিল, কেন এমন হয়? সত্তর থেকে সাতাত্তর যাদের ইতিহাস ছিল ক্ষতবিক্ষত দেহে প্রায়ই নর্দমায় পড়ে থাকা, সেই লোকগুলোই এত সহজে মাফিয়া হয়ে গেল কী করে? পার্টিতে স্ট্যালিন ছিলেন গোমাতার মতো, তার শরীরে কোনো কাটাকুটি করা যেত না। কিন্তু আমাদের অনেকেরই কাছে স্ট্যালিন আমলের বীভৎসতা সত্যিই বীভৎসতা বলে মনে হত। তার প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছিলাম গরবাচভ আমলে ঘটতে থাকা সমাজতন্ত্রের একের পর এক পতনে। পূর্ব ইউরোপের সিনেমায় পরে যখন দেখেছিলাম লেনিন মূর্তি মাটিতে ফেলে তার উপর উঠে মানুষ পেচ্ছাপ করছে, তখন খুব কষ্ট হয়েছিল, আমরা তো অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি লেনিনকে পৃথিবীর 'জীবন্ততম জীবনের নাম' জেনে, 'কমরেড লেনিনের আহ্বান/চলে মুক্তিসেনাদল' গাইতে গাইতে সত্যিই একটা বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ ঘটত আমাদের।

গরবাচভ সম্পর্কে একটি পার্টি ডকুমেন্ট-এর একটা বাক্যাংশ মনে আছে, 'সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার জারজ', বাস্টার্ড অফ ইম্পেরিয়ালিজম অ্যান্ড কোলোনিয়ালিজম। এটা সিপিআইএমের একটা খসড়া কর্মসূচীর লাইন। গালাগালি এবং বাক্যাড়ম্বর তো সবসময়ই আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। শুধু সিপিএম কেন, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল সমস্ত বামপন্থী শক্তি গুলোই। তাদের ভগবান মরে যাচ্ছিল। যাকে তারা ভগবান বলে ভাবত। 'রাজা ল্যাংটো'

এই কথাটাই কত ভয়াল, আর 'ভগবান ল্যাংটো' — এতো দেবহত্যা পিতৃহত্যা স্যাক্রিলেজ। ঠিক এই নামেই, 'নেকেড গড', একখানি কেতাব লিখেছিলেন হাওয়ার্ড ফাস্ট, স্ট্যালিন আমলের কীর্তিকাহিনীর সিক্রেট রিপোর্ট ক্রুশ্চেভ ছাপিয়ে দেওয়ার পর।

আর গড যে কোনো মেটাফর নয়, নিতান্তই ফুলবেলপাতা গঙ্গোদক দিয়ে অঞ্জলি দেওয়া হয় তাতো কিছুদিন আগে দেওয়ালে দেওয়ালেই দেখেছি আমরা, "মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা সত্য"। অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান বলে যে কিছু হয় এটা মার্ক্সবাদীরা মানে, এবং তাদের প্রয়োজন পড়ে একজন সর্বশক্তিমান পিতা বা পতি বা দেবতা মাথার উপরে থাকার। ফর্সা ধুতি পরা এইসব পুরুতদের বালকতা দেখলে সত্যিই হাসি পায়। কিন্তু এই অতিদীর্ঘায়িত বাল্যকাল আপাত হাস্যকর হলেও আসলে বীভৎস, তার সামাজিক পরিণামে। ভারতবর্ষের গরিব মেহনতি মানুষের ইতিহাসের, সংগ্রাম-আন্দোলনের নিয়ন্তা তো এরাই।

এদেরই একজন তাত্ত্বিক একবার মার্ক্সীয় অর্থনীতির ক্লাসে পড়িয়েছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্লেভারি বা ক্রীতদাসপ্রথার মোড অফ প্রোডাকশন হিশেবে উপস্থিতির কথা, কারণ, বড়ঠাকুর মার্ক্স নাকি বলে গেছেন স্লেভারির কথা। উনি তা থেকে নড়বেন কী করে? (যদিও ভেরা জাসুলিচকে লেখা চিঠিতে মার্ক্স উল্লেখ করে গেছিলেন 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে দেওয়া ঐতিহাসিক গতির মডেল নিতান্তই পশ্চিম ইউরোপের)। অন্য এক তাত্ত্বিক, তিনি আবার তাত্ত্বিক তথা আত্মিক প্রয়োজনে পার্টিও ছেড়েছিলেন, যদিও মার্ক্সবাদী বিপ্লববাদ ছাড়েননি, নিয়ত লিখে চলেন, তার লেখায় মার্ক্সবাদী তত্ত্বের 'শ্রম' আর 'শ্রমশক্তি' একই অর্থে ব্যবহার করে গেছেন, যে তফাৎটা যে কোনো ছাত্র মার্ক্সবাদী থিয়োরি পড়ার প্রথম দিনেই শিখে যায়।

এই উদাহরণ গুলো আর কিছুই না, বামপন্থী রাজনীতির কতকগুলো নেতৃস্থানীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বোকামিকে চিহ্নিত করে। এই বোকামির আবহ যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিটা করে সেটা হল পরিধিতে ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে কাজ করতে থাকা কর্মীদের, কোনো তাত্ত্বিক জায়গা থেকে নয়, একদম কাজের সুবিধা অসুবিধার জায়গা থেকে যে চিন্তাভাবনা যে মতামত গুলো তৈরি হয় সেগুলোকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয় এই তাত্ত্বিক বোকামি দিয়ে। নতুন যা আসতে পারত তার পথকে আটকে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব এসেনশিয়ালিজম বা সারবাদ-এর আলোচনায়।

এই চুপ করিয়ে দেওয়া কেবল একটা দেশের অভিজ্ঞতা নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই। যা, দিনকে দিন, মার্ক্সবাদী বিপ্লবী রাজনীতির শরীরে গজিয়ে তুলছিল বড় বড় গর্ত। ধরুন, নারীবাদ। ধরুন, সাইকোঅ্যানালিসিস। ধরুন, সমকামীদের সমস্যা। পরিবেশবাদী আন্দোলন। এগুলো নিয়ে মার্ক্সবাদের কিছু বলার নেই। কমরেড, মূল সমস্যার সমাধান করুন, এগুলো আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে, এগুলো বড় কিছু নয়, মূল জায়গাটা হল শ্রেণীসংগ্রাম, এসব নিয়ে ভেবে ব্যস্ত হয়ে শক্তির অপব্যয় করবেন না। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামালে এই কথাগুলোই বলা হয়, কিন্তু এটা গোঁজামিল। এবং একটা ফ্যাসিজমও। এসেনশিয়ালিস্ট ফ্যাসিজম। এই পৃথিবীতে কেউ কারোর অভিভাবক নয়। কেউ তার সমস্যাকে ভুলে থাকার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে, সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু আর কারুর অধিকার নেই তাকে উপদেশ দেওয়ার যে তার সমস্যাটা আদতে কোনোই সমস্যাই নয়। আসলে মার্ক্সবাদ এই সমস্যাগুলোকে বোঝেই না। কেন, সে প্রসঙ্গে আসব আমরা, আরো কিছুটা আলোচনা হয়ে যাওয়ার পরে।

সব মিলিয়ে, দেশের এবং বিদেশের এই সমস্ত ঘটনায়, যা তৈরি হয়েছিল তা এক রাজনৈতিক শূন্যতা। অবশ্য, ঠিক ভাবে দেখতে জানলে, শূন্যতাও তো আর এক রকমের পূর্ণতা। সেই পূর্ণতাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাই বানিয়ে তুলেছে আমার সঙ্গে এই বইয়ের সম্পর্কটাকে।

৫।। পোস্টমডার্নিজম

সেই সম্পর্কটার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে পোস্টমডার্নিজম। কিন্তু তার বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে পোস্টমডার্নিজম নিয়ে প্রাথমিক দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক। পোস্টমডার্নিজমের একটা খুব গুরুত্বের জায়গা এই যে এটা একটা তত্ত্বের বিষয়ে তত্ত্ব। দেখাকে দেখা। উত্তরআধুনিকতার এলাকায় আমার দৃশ্যবস্তু বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল দৃষ্টিকোণ এবং দৃষ্টিকোণ বিষয়ে আমাদের দর্শন।

পেন্টাগন যুদ্ধ নামে একটা ছবি দেখেছিলাম। তাতে একটা জেনেরাল বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি টাকা প্যাঁদাচ্ছিল আর্মার্ড কার তৈরির নাম করে। একজন অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হল পুরোটা তদন্ত করার। অফিসার পুরো ঘাপলাটা নিয়ে একটা রিপোর্ট বানাল। কিন্তু আ মোলো যা, সেই রিপোর্ট মন্ত্রকে যাবে জেনেরালের মারফৎ। যতক্ষণ না জেনেরাল অনুমতি দিচ্ছেন সেই রিপোর্ট সে কাউকে, এমনকি দেশের প্রেসিডেন্টকে অব্দি দেখাতে

পারবেনা। তাহলে তার কোর্ট মার্শাল অবধারিত। তার প্রথম রিপোর্ট বাতিল করল জেনেরাল। সে আর একটা রিপোর্ট লিখল জেনেরালের পছন্দ মোতাবেক। সেটা গেল সবার কাছে। গুড, কোনো ঘাপলাই নেই। এবার তার কলটা খেলল সেই খচ্চর অফিসার। সে রুলবুক বার করে দেখাল, জেনেরালের কাছে দেওয়া রিপোর্ট যদি বদলাতে হয়, তাহলে সেই সংক্রান্ত মেমোটা সকলের কাছে প্রকাশযোগ্য। সে তখন দুটো রিপোর্ট এর তফাৎ নিয়ে একটা মেমো লিখল — যাতে প্রথম রিপোর্টের প্রতিটি প্যারাগ্রাফই তোলা হল, কোট-এর ভিতর, দুটো রিপোর্টের তফাৎ ব্যাখ্যা করার সূত্রে। এবং সেই বিপুলায়তন মেমোর অগণ্য কপি পৌঁছে গেল সংশ্লিষ্ট প্রতিটি লোকের কাছে।

রিপোর্ট যেতে পারেনা, কিন্তু রিপোর্টের বিষয়ে মেমো তো যেতেই পারে। পোস্টমডার্নিজমের ভিতরেই এই খচরামিটা নিহিত আছে। দৃশ্যবস্তু নিয়ে যদি এমনকি কিছু বলার নাও থাকে, বলার আছে দৃশ্যবস্তুকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তার ভিতর নিহিত দর্শন নিয়ে। উমবের্তো একো তার রম্যরচনা লেখার অসাধারণ স্টাইলে একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন।

"পোস্টমডার্ন বলতে আমি বুঝি একটা লোককে যার প্রেমিকা ভারি আঁতেল, আর তাই, সেই বেচারা, হায়, কোনোদিনই তার প্রেমিকাকে বলে উঠতে পারবেনা, "আমি তোমায় পাগলের মতো ভালোবাসি", কারণ সে জানে যে তার প্রেমিকা জানে (এবং তার প্রেমিকাও জানে যে সে এটা জানে) যে এই কথাগুলো ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন বারবারা কার্টল্যান্ড তার প্রেমের উপন্যাসে। তাও, একটা উপায় এখনো আছে। সে এখন বলতেই পারে, "বারবারা কার্টল্যান্ড এখানে যা লিখত তা হল, "আমি তোমায় পাগলের মত ভালোবাসি"।" এই জায়গায় এসে, তার ফাৎরা সরলতা (ফলস ইনোসেন্স) সে ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে, সে এবার খুব স্পষ্ট ভাবেই এটা সে স্বীকার করে নেবে যে সেই আদিম সরলতায় কথা চালিয়ে যাওয়া আর তার কেন কারুর পক্ষেই সম্ভব না এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে। তাও সে এখনো নিশ্চিতভাবেই জানাবে তার নারীটিকে, যা সে জানাতে চায় — যে সে তাকে ভালোবাসে, পাগলের মত ভালোবাসে। কিন্তু সেই ভালোবাসা এমন এক যুগের যা ইতিমধ্যেই ইনোসেন্সরিক্ত। এই দ্বিতীয় রকমে বলায় ওই নারীটির কাছেও পৌঁছবে ভালোবাসার সেই ঘোষণা। কিন্তু তাদের কারোরই আর নিজেকে 'সরল' বলে মনে হবেনা। তাদের অতীত, তাদের লিপিবদ্ধ অতীত, ইতিমধ্যেই বলা হয়ে যাওয়া কথার গুদামে ভরা অতীত, তাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে পারবে তারা — এই অতীতকে তো তারা বদলাতে পারেনা। এখন দুজনেই, তাদের সচেতনতায় এবং তাদের উল্লাসে, খেলে চলতে পারবে তাদের অপাঙ্গ পরিহাসের খেলা, দি গেম অফ আয়রনি ... কিন্তু এখন দুজনেই তারা সফল, তাদের প্রেমের প্রকাশে প্রস্তাবে প্রস্তাবনায়।"

আসুন, এবার, পোস্টমডার্নিজম নিয়ে দুটো ডিকশনারির দুটো ডেফিনিশন পরপর পড়া যাক। প্রথমটা অক্সফোর্ড কনসাইজ।

পোস্টমডার্ন (অ্যাডজেক্টিভ) (ইন লিটারেচার, আর্কিটেকচার, দি আর্টস, এটসেটেরা) ডিনোটিং এ মুভমেন্ট রিঅ্যাক্টিং এগেইন্সট মডার্ন টেন্ডেন্সিজ, এসপেশালি, বাই ড্রয়িং অ্যাটেনশন টু ফর্মার কনভেনশনজ।

এবারেরটা মাইক্রোসফট বুকশেলফ বেসিকস এর হাফটন মিফিন অ্যামেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারি।

পোস্টমডার্ন (অ্যাডজেক্টিভ) অফ অর রিলেটিং টু আর্ট, আর্কিটেকচার, অর লিটারেচার দ্যাট রিঅ্যাক্টস এগেইন্সট আর্লিয়ার মডার্নিস্ট প্রিন্সিপলজ, অ্যাজ বাই রিইনট্রোডিউসিং ট্র্যাডিশনাল অর ক্লাসিকাল এলিমেন্টস অফ স্টাইল অর বাই ক্যারিং মডার্নিস্ট স্টাইলজ অর প্র্যাক্টিসেজ টু এক্সট্রিমজ : " দি পোস্টমডার্ন মোড অফ ট্যাপারিং দি টপজ অফ বিল্ডিংজ" (জেন হোল্টজ কে)।

এই দুটো সংজ্ঞাতেই দেখুন — মূল জায়গাটা দুটোতেই এক — রিঅ্যাক্টিং এগেইন্সট। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায়। কার বিরুদ্ধে? কেন এই বিরুদ্ধতা? এবং সেই প্রতিক্রিয়ারই বা মূল চরিত্রগুলো কী? এগুলোকে আমরা একটু বাদেই বোঝার চেষ্টা করব, আমাদের সম্মুখীন রাজনীতির থেকে উদাহরণ টেনে টেনে। তার আগে থিয়োরি এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আরো কয়েকটা কথা বলা দরকার।

৬।। ধর্মের থিয়োরি

ধর্ম এবং ধর্মের থিয়োরি নিয়ে দু-চার কথা এখানে বলে নেওয়া যাক, যা আমাদের পরের আলোচনায় সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, আমরা এই আলোচনা মোটেই কোনো অ্যাকাডেমিক রকমে করছিনা। তাই অ্যাকাডেমিক পরিপাটিয়ানার কোনো দায়িত্ব আমি নেবনা। আমাদের এই আলোচনা নিতান্তই ইংরিজিতে যাকে বলে অফ-দি-কাফ। নিজেদের

বৈঠকখানায় বসে বাতেলাবাজি, রোয়াকে বসে রোয়াবি মানে রোয়াকি, ম্যাক্সিমাম চণ্ডীমণ্ডপ, বারোয়ারিতলা। কোনো আড়ষ্ট অ্যাকাডেমিকের যোগ্যতাই নেই যে ভা টপুজোয় অংশগ্রহণের।

একজন লোক যে ধর্ম মানে, ধর্ম দিয়েই দুনিয়াকে বোঝে এবং ব্যাখ্যা করে, ধর্মের মডেলেই নিজের তথা পৃথিবীর ভালোমন্দ নির্ণয় করে, তার চিন্তাপদ্ধতিকে যদি আমরা ধার্মিক চিন্তাপদ্ধতি বলে ডাকি, তাহলে, সেই ধার্মিক চিন্তাপদ্ধতি ঠিক কী ভাবে দেখে আমাদের সম্মুখস্থ দুনিয়াকে? কী কী উপাদান দিয়ে তৈরি হয় একজন ধার্মিকের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী?

ধর্মের দুনিয়া সে অর্থে বেশ তরল, যেখানে সবকিছু সমস্ত কিছুই প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, শুধুমাত্র একটা জিনিষকে বাদ দিয়ে, গোটা কাঠামোর একটামাত্র উপাদানকে বাদ দিয়ে, সেটা হল ভগবান। একটা ধর্ম থেকে আর একটা ধর্ম আলাদা, তার ভগবানও আলাদা, কিন্তু ভগবান সেখানে আছেই। একটা সুনির্দিষ্ট সংহত অনড় ভগবান। ভগবান সেখানে অপরিবর্তনীয় প্রদত্ত এবং অপ্রশ্নেয়। তাকে বদলানো যায়না, প্রশ্ন করা যায়না। অন্য সব অস্থায়ী নশ্বরতার ভিতর একমাত্র ঈশ্বরই চিরস্থায়ী আদি এবং অনন্ত।

এবার দেখা যাক ধার্মিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে ব্যক্তি আবেগ-উচ্ছ্বাসের সম্পর্কটা ঠিক কী? ধার্মিক চিন্তাপদ্ধতির মডেলটা অনেকটা একটা বিপন্ন-বাচ্চার। যে তার মাকে খুঁজছে, বাবাকে খুঁজছে। এবং হয়ত এই জন্যেই পিতা-মাতা-শিশু-বিপন্নতা এই মোটিফগুলো এত ফিরে ফিরে আসে আবহমান ধর্মীয় আলোচনাগুলোয়। প্রার্থনা আবদার মানত। কিম্বা অন্যায় স্বীকার করা দেবতার কাছে। সবটাই একটা শিশুকে পিতামাতার শাসন এবং সুরক্ষার মডেল — শুধু বহু বহু গুণ বড় আকারে — অপরিমেয় আকারে বড়। ঈশ্বর যিনি সমস্ত পিতামাতার আদি পিতামাতা। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কিছু ঘটে যার শাসনে, তত্ত্বাবধানে। ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতির আবেগের মূল আধারই এই অপত্যের মডেল।

ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতি আসলে আমাদের আবেগ-অনুভূতির মৌলিক আকারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। যে মৌল অনিরাপত্তাবোধকে আমরা বহন করে চলি আজীবন তারই প্রত্যক্ষ সমাধান। এই অনিরাপত্তাবোধকে আমরা বহন করি আমাদের প্রাথমিকতম শৈশব থেকে, হয়ত মাতৃগর্ভ থেকে চ্যুত হওয়ার আদিম বিপন্নতা থেকেই। মাতৃগর্ভে আমরা ভ্রূণ আকারে ভেসে থাকি, ভারহীন, দায়হীন। শুধুই নিদ্রা আর ক্রীড়া আর ভেসে থাকা আর আ মাদের অপরিণত হাত পা ছোঁড়া কারণহীন আনন্দের স্বাভাবিকতায়। জন্মের পর থেকে, মাতৃগর্ভ হতে চ্যুত হওয়ার পর থেকে আজীবন হয়ত আমরা শুধুই আবার সেই আরামে ফিরে যেতে চাই, কিন্তু পারিনা, আর তাই নিয়ত ফ্যান্টাসির জন্ম হয়। সেই ভারহীন দায়হীন আদিম নিরাপত্তার আরামে পুনর্বাসিত হওয়ার, সংজ্ঞাগত ভাবেই অসম্ভাব্য সব ফ্যান্টাসি। অচেতনে এই ফিরে যেতে চাওয়া আর সচেতনে জানা যে এটা একটা অসম্ভাব্যতা — দুয়ে মিলে আমাদের ও ই অনিরাপত্তাবোধকেই আরো বাড়িয়ে তোলে। তার সাথে যুক্ত হয় মৃত্যুভয়। আমি আমার ফ্যান্টাসিতে পৌঁছতে পারবনা তার আগেই ফুরিয়ে যাব। আমি আর থাকব না। শেষহীন প্রত্যাগমনহীন অবলোপ। মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর — আর সকলে কথা কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।

মাতৃগর্ভে আমরা কোনোদিনই ফিরে যেতে পারিনা, বাস্তবে। কিন্তু বারবার সেখানে ফিরে যেতে পারি, আমাদের স্বপ্নে। জানিনা, আপনারা একমত হবেন কিনা, আমার নিজের মনে হয়, আমাদের যৌনতার আরামবোধও এরকম একটা নিরাপত্তাবোধের স্বপ্ন। আমার শরীরের বাইরে আর একটা শরীরে, সেই শরীর আমার বাইরে, সেও আমার সঙ্গে একই আরামের শরিক হল, অর্থাৎ আমি আমার বাইরে আর এক রকম আমাকে আবিষ্কার করলাম, আর একটু ছড়িয়ে গেলাম, আর একটু অমর হলাম।

এই প্রবণতাই তার চূড়ান্ত আকার পায় সন্তানস্নেহে। হিন্দুদের মুখাগ্নির প্রথাকে ভাবুন। আমি কতজনকে দেখেছি — কী নিবিড় তৃপ্তি তাদের মুখে খেলা করে — এই বাক্যটা উচ্চারণকালীন, আমার ছেলে আমার মুখে আগুন দেবে। কেন ওই তৃপ্তি? ধর্মরক্ষা হবে বলে? বোধহয় না। অনেকক্ষেত্রেই লোকগুলোকে আমার ঠিক অতটা ধর্মপ্রাণ মনে হয়নি। কারণটা বোধহয় অন্যত্র। আমার ছেলে, সে জ্যান্ত, আমার মৃতদেহের মুখাগ্নি করল, আমার চিতাভস্ম ছড়িয়ে দিল গঙ্গার জলে। অর্থাৎ, আমি পুরো মারা গেলাম না, বেঁচে রইলাম, অন্য একটা আধারে, মুখাগ্নিটা ওই আধারবদলেরই একটা প্রতীক। চিরস্থায়ীত্বের অমরতার বাসনারই একটা মেটাফর।

তাই, মাতৃগর্ভ থেকে চ্যুতি, এবং তার থেকে সঞ্জাত মৃত্যুভয়ের মেটোনিমরা — এবং তার বিপরীতে গজিয়ে ওঠা বেঁচে থাকার অমর হওয়ার বাসনার মেটাফর — এই নিয়েই যে কোনো ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মের থিয়োরি। এবং, সত্য অর্থে,

যে কোনো থিয়োরি, যে কোনো দর্শন। আমরা সেই আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে মেটাফর এবং মেটোনিম এই দুটোর সংজ্ঞা দিয়ে নেওয়া যাক।

মেটোনিম মানে একটা শব্দ (বা ধারণা) যখন অন্য একটা শব্দের (বা ধারণার) প্রতিনিধিত্ব করছে, যে শব্দ অনুপস্থিত কিন্তু তাকে অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চেনা যাচ্ছে, এবং যে শব্দেরই একটা অংশ বা তির্যক প্রতিভূ এই সম্মুখবর্তী উপস্থিত শব্দটি। অনুপস্থিত "রাজা"-র মেটোনিম "রাজদণ্ড"। একটা রচনায় বা আলোচনায়, টেক্সট-এ বা ডিসকোর্স-এ, মেটোনিম মানে আমাদের মনোযোগাধীন একটা শব্দ, যা একটা অনুপস্থিত শব্দের প্রতিভূ, যার উদ্বৃত্ত অর্থ বহন করছে এই সম্মুখস্থ শব্দটি।

মেটাফর মানে একটা শব্দ (বা ধারণা) যখন অন্য আর একটা শব্দের (বা ধারণার) বিকল্পের কাজ করছে। আমাদের সম্মুখস্থ শব্দটা আমাদের চেনা, অজানা অচেনা অনুপস্থিত শব্দটির বদলি হিশেবে কাজ করছে সে। একটা ফিল্মে যখন পরপর দুটো শট একটা অন্যটার সাপেক্ষে, অন্যটির সঙ্গে প্রতিতুলনার ভিতর দিয়ে অর্থ তৈরি করে আমরা তাকে মেটাফর বলি। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। তারপরের শটেই গভীর সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটছে মেলট্রেন। প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের আবেগের ধাবমানতাকে, যা দর্শকের কাছে অজানা, দর্শকের চেনা ধারণা দিয়ে উপস্থিত করা হল।

এই মৃত্যুভয় এবং তার মেটোনিমরা, আর বাঁচার বাসনা এবং তার মেটাফরেরা, এই নিয়েই, বোধহয়, আমাদের সব তত্ত্ব, সব থিয়োরি, সব ধর্মপালন, সব আলাপ-আলোচনা, সব কথা চিঠি ছবি কাজ জীবন। সব দর্শনই তার নিজের নিজের প্রকারে এই দুইয়ের ভিতর একটা সম্পর্ক নির্মাণ করেছে, নিজের মত করে সমাধান করতে চেয়েছে এই আদিহীন অন্তহীন গোলোকধাঁধার। আসুন এবার দেখা যাক, কাকে বস্তুবাদ এবং কাকে ভাববাদ বলে।

৭।। ভাববাদ বস্তুবাদ

পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনকে সচরাচর এই দুটো বড় ভাগে ভাগ করা হয় — ভাববাদ এবং বস্তুবাদ। এমন নয় কিন্তু যে এই দুটো বর্গ পরস্পর জল-অচল।

এবং অন্য যে কোনো বর্গীকরণের মতো এই বর্গীকরণেরও একটা নিজস্ব সীমা আছে যে সীমা পেরিয়ে গিয়ে এই বর্গীকরণ জটিল বোকা এবং অর্থহীন। হেগেলের ক্ষেত্রে যেটা খুবই স্পষ্ট। সে কথায় আমরা পরে আসছি। প্রথমে দেখা যাক এই শব্দ দুটো দিয়ে, ভাববাদ বস্তুবাদ, আইডিয়ালিজম মেটিরিয়ালিজম, আমরা আসলে কী বোঝাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কিন্তু দুটো শব্দই বেশ লোডেড, তাদের নিজস্ব আবহ আছে ভালো এবং মন্দ অর্থের। আইডিয়ালিজম বেশ সম্মানিত শব্দ, সেই সমস্ত খদ্দর পরা তালি দেওয়া ছাতা হাতে ঘোরা মাস্টারমশাইরা যারা শেষ জীবনে না-খেতে পেয়ে মরা টিকটিকির মত পথে বা বিছানায় শুকিয়ে থাকতেন তাদের সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, আদর্শ আধ্যাত্মিকতা মূল্যবোধ ইত্যাদি অনেকগুলো উদ্বৃত্ত অর্থ 'আইডিয়ালিজম' শব্দটার। আর 'মেটিরিয়ালিজম' শব্দটা সচরাচর ব্যবহৃত হয় — টাকা টাকা টাকা, সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা — এই ফাঁকা এবং হীন বাণিজ্যের সফলতার অর্থে। আইডিয়ালিজম এখানে সুন্দর, ভালো, গভীর, অ্যাপোলোনিয়ান। আর মেটিরিয়ালিজম হল নীচ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, ডায়োনিজিয়ান। দর্শনের এই বর্গদুটো কিন্তু সে অর্থে নয়।

আইডিয়ালিজম এবং মেটিরিয়ালিজমের পার্থক্য বুঝতে একটা খুব সহজ জায়গা, কোনো একটা দর্শন তার যুক্তির যাত্রা কোথা থেকে শুরু করছে। ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতির কথা ধরুন, একটু আগেই যা আমরা আলোচনা করলাম। যে কোনো ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতিই সে অর্থে ভাববাদী, কারণ তা শুরু করে কোনো বস্তু থেকে নয়, একটা ভাবনা, একটা ভাব থেকে। একটা চিন্তাজাত সত্তা থেকে। ঈশ্বর গড আল্লা সে যাই হোক না কেন। তারা কেউই বস্তু নন, চিন্তাজগতের সত্তা। সেই সত্তা থেকে প্রবাহিত হয় এই বিশ্বপৃথিবী এরকম ধরে নেওয়া হয়, গোটা দর্শনটাই গড়ে ওঠে ভাবজগতের এই সত্তার উপর। তাই এরা ভাববাদ। অন্যদিকে মার্ক্সবাদী দর্শনকে ভাবুন। এই দর্শনের যুক্তিশৃঙ্খল শুরু হয় আমাদের চারপাশের বস্তুজগত থেকে। আমাদের সম্মুখবর্তী ইন্দ্রিয়-অনুভূতির বস্তুজগত থেকে। সেই জন্যে মার্ক্সবাদকে আমরা ডাকি বস্তুবাদ বলে।

এর সাপেক্ষে হেগেলের তত্ত্বকে ভাবুন। হেগেল বিয়িং বা অস্তি থেকে শুরু করেন। লক্ষ্য করুন — বিয়িং বা অস্তি একটা ধারণা — একটা চিন্তা। অর্থাৎ, ভাব। কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, একটা বিমূর্ত ভাবনা। তাই, হেগেল শুরু করছেন ভাব থেকে। তিনি ভাববাদী। কিন্তু তারপর? হেগেল তার প্রসিদ্ধ অস্ত্র, ডায়ালেকটিক্স, একটি বিশেষ ধরনের যুক্তিশৃঙ্খল, ব্যবহার করতে শুরু করলেন এই ভাব-জগতের জমির উপর। তাই তার তত্ত্বকে আমরা ডাকি

ডায়ালেক্টিকাল আইডিয়ালিজম। মার্ক্স তার ডায়ালেক্টিক্স-এর অস্ত্র নিয়েছিলেন হেগেলের কাছ থেকে। তাকে প্রয়োগ করেছিলেন বস্তুবাদে, তাই তার তত্ত্বের নাম ডায়ালেক্টিকাল বস্তুবাদ বা ডায়ালেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজম। (দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এই পপুলার অভিধাটা ইচ্ছে করে এড়ালাম, কারণ 'ডায়ালেকটিক' শব্দের অনুবাদ হিশেবে 'দ্বন্দ্ব' আমার বেশ গাজোয়ারি বলে মনে হয়।) হেগেল এবং মার্ক্স নিয়ে একটু বিশদ একটা আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তার আগে অন্য আর একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

মার্ক্স কিন্তু হেগেল থেকে শুধু ডায়ালেক্টিক্সই নেননি। আরো একটা জিনিষ তিনি পেয়েছিলেন তার হেগেলীয় উত্তরাধিকারে। সেটার আমরা নাম দিতে পারি কমপ্লিটনেস মেটাফিজিক্স, বা, পূর্ণতার রূপকথা। মেটাফিজিক্স মানে অবশ্যই রূপকথা নয়, কিন্তু এখানে ওটাই যাচ্ছে ভালো।

প্রাচীনকালে, মার্কসবাদী নামের প্রজাতিটা যখনো পৃথিবীর মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, যখনো তারা রীতিমত বেঁচে ছিল, ঘুরতো ফিরতো, নিঃশ্বাস ফেলত, ওই প্রজাতির শেষ নিদর্শনগুলোর মত সংগ্রহশালার তাকের ফরম্যালিন জারের বাইরে, পৃথিবীর মাটিতে হাওয়ায় জ্যান্ত নিশ্বাস ফেলত, তখন একটা শব্দ খুব চলত বাজারে — বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী: ওয়ার্ল্ড আউটলুক। এই 'বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী' শব্দটার ভিতরেই হাজির আছে একটা দৃষ্টিভঙ্গী, সমগ্রের একটা ধারণা। বিশ্ব সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সুসংহত সংজ্ঞাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী আনতে পারছি মানেই বিশ্ব আর এলোমেলো আনতাবড়ি কিছু নয়, সেটা একটা সম্পূর্ণ সমগ্র। 'সমগ্র' — এই শব্দটা খেয়াল করুন, একটা পূর্ণতার ধারণা এটাকে অধিকার করে আছে, পরে আমরা বারবার এখানে ফেরত আসব।

জঙ্গলটা হেভি বিপজ্জনক — এই কথাটা যখন বলছি আমি তখন আর কেউ একথাটা বলতেই পারত — আরে দাদা, কত গাছ মাইরি, এই একটা গাছ, ওই আরেকটা, কত গাছ গুরু, আবার একটা সাপও আছে দেখেচো। প্রথম জন সম্পূর্ণ জঙ্গলটাকে ভাবছে, আর দ্বিতীয় জন দেখছে ব্যক্তিগত একক ইনডিভিজুয়াল গাছ, গাছ হি গাছ। কোনো সম্পূর্ণতা আকারে নয়। গাছ আর জঙ্গলের এই তুলনাটা মাথায় রাখুন। গাছ দেখতে গিয়ে জঙ্গল হারিয়ে যাওয়া আর জঙ্গল দেখতে গিয়ে গাছ হারিয়ে যাওয়া তত্ত্ব দিয়ে পৃথিবীকে বোঝার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা।

মার্কস তথা সমস্ত প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শন (এক নিটশেকে বাদ দিন), পোস্টমডার্নিজমের আগে অব্দি একটা সম্পূর্ণতার ধারণাকে কোনো না কোনো ভাবে ক্যারি করে। একটা রূপকথা। এই রূপকথার আমার দেখা সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভিক শান্তিপাঠ:

ওং পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে / পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। / ওং শান্তি শান্তি শান্তি।। ওটা পূর্ণ, এটা পূর্ণ, মানে সবকিছুই পূর্ণ, পূর্ণ থেকে গজিয়ে ওঠে পূর্ণ, আবার যদি পূর্ণ থেকে পূর্ণকে ছেঁটে ফেলেন যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে তাও ফের পূর্ণ। লাস্টের তিনবার শান্তি-টা হল উইশ করা, অলৌকিক আধালৌকিক এবং লৌকিক, আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক, সব জগতের শান্তি হোক।

সম্পূর্ণ সমগ্রের এই স্বর্গে সুখী এবং শান্ত হয়েছিল পাশ্চাত্যের দর্শন। মানুষ আর কত এলোমেলোপনা বরদাস্ত করতে পারে? হেগেলের জগত ছিল নিঁখুত এবং নিটোল কেন্দ্র এবং পরিধিতে বিন্যস্ত। একেশ্বর এসেন্স এবং তার থেকে গজিয়ে ওঠা তার ছানাপোনা থিং-দের বস্তুদের তৈরি কংক্রিট বাস্তবতার জগত, আমাদের চারপাশের বাস্তবতা, চোখের সামনের পৃথিবী, সম্মুখস্থ বস্তুজগত। ঈশ্বরের জায়গায় হেগেলের এসেন্সকে মার্কস ফের বদলালেন — অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার-এ। বুঝব এক অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারকে, বুঝে ফেলব সারা দুনিয়া — সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছুকে। ভিত্তি, বেস হল সেই অর্থনীতি মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার, তার থেকে গজিয়ে উঠছে উপরিকাঠামো, সুপার-স্ট্রাকচার, সংস্কৃতি সমাজনীতি সমস্ত কিছু।

পূর্ণতার এই রূপকথাটাকে খেয়াল করুন, আর মনে করুন সেই অসহায়তার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলা বাচ্চার কথা, যে তার চারপাশে একটা স্থির পোক্ত থিতু আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইছে। একটা তাত্ত্বিক অবস্থান আসা মাত্রই সে ধরে নিতে চাইছে এইটা দিয়েই সে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝে ব্যাখ্যা করে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে। আমরা পরে আবার ফেরত আসব এই প্রসঙ্গটায়। কিন্তু, তার আগে ছোট করে একটু হেগেল আর মার্ক্স। একটু অতিসরলীকৃত, তাই একটু অশ্লীল রকমেরই ছোটো। মনে রাখবেন, আমরা এখানে হেগেলের তত্ত্ব আলোচনা করতে যাচ্ছি না, হেগেলের দু-একটা বিষয় বলে নিতে চাইছি যাতে সেখান থেকে মার্ক্সবাদ এবং উত্তরআধুনিকতা বিষয়ে আমরা যা বলতে চাই তাতে পৌঁছতে পারি।

৮।। এককুচো হেগেল

হেগেল দার্শনিক। তিনি তার যাত্রা শুরু করেন যুক্তিবিদ্যা বা লজিক থেকে। কোনো কিছু 'নেই' থেকে দর্শন শুরু হয়না। দর্শন শুরু হয় 'আছে' দিয়ে। হেগেল 'আছে' দিয়ে শুরু করেন। হেগেলের শুরুর জায়গা বিশুদ্ধ অস্তি, ইজনেস বা পিওর বিয়িং। নিখাদ 'থাকা' নামের এই ধারণাটা। লজিক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ভাবুন, অস্তি থাকলে একটা নাস্তি থাকে, বিয়িং থাকলে একটা নাথিং থাকে, 'আছে' থাকা মানেই একটা 'নেই' থাকা। আর, 'আছে' এবং 'নেই' এই দুটোই থাকা মানে আরো একটা জিনিষ থাকা, 'আছে' থেকে 'নেই' বা 'নেই' থেকে 'আছে' হতে পারা। অস্তি থেকে নাস্তিতে বা বিয়িং থেকে নাথিং-এ একটা পরিবর্তন থাকা। 'আছে' থেকে 'নেই'-এ বদলের সম্ভাবনাটা থাকা। এটারই নাম বিকামিং, হয়ে-ওঠা। তার মানে আমরা তিনটে দার্শনিক ধারণা পেয়ে গেলাম, বিয়িং, বিকামিং এবং নাথিং।

হেগেল লজিশিয়ান, তিনি বিয়িং নাথিং বিকামিং — এই ক্যাটিগরি বা বর্গগুলোকে সৃষ্টি করেন। এই ক্যাটিগরি নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করব কেন? আমরা মার্ক্সকে এবং মার্ক্সোত্তর উত্তর-আধুনিকতাকে বুঝতে চাইছি, আমরা চর্তুপার্শ্বিক বাস্তবতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে শুরু করব। এই যে পুরো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতটা, আমাদের চোখের সামনে যে পৃথিবী, এই সম্মুখস্থ বাস্তবতা তৈরি হয়েছে কী দিয়ে? এই বাস্তবতা জুড়ে আছে বিভিন্ন বস্তু ও সত্তা। বিভিন্ন বস্তু ও সত্তা যাদের আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরতে পারি। চোখ দিয়ে দেখছি, বা কানে শুনছি, নাকে তার গন্ধ পাচ্ছি, বা আমাদের ত্বকে তাদের স্পর্ষ পাচ্ছি। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের নিয়ে নির্মিত আমাদের পৃথিবী, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তবতা। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরা কোনো অধরা মাধুরী নয়, তাদের খুব স্পষ্ট ভাবেই নির্ণয় করা যায়, ডিটারমিন করা যায়। আমি আমার অ্যাশট্রেটা তুলে আপনার মাথায় ছুঁড়ে মারলেই আপনি স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারবেন ওটার ওজন। ডিটারমিন করা যায় বলে আমরা তাদের বলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা বা ডিটারমিনেট বিয়িং। ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের তত্ত্ব আমরা পড়া শুরু করব আমাদের কেজো বস্তুবাদী রকমে, আমরা শুরুই করব ডিটারমিনেট বিয়িং বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা থেকে।

আমরা আমাদের চারপাশে দেখি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু — আলাদা আলাদা থিং, আলাদা আলাদা বিয়িং। বিভিন্ন বস্তুকে আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় একমাত্র তাদের ভিন্নতাকে বুঝেই। গরু এবং টেবিলকে আলাদা আলাদা ভাবে গরু এবং টেবিল বলে বোঝা যায় গরু এবং টেবিলের পার্থক্যটা বোঝার পরই। অর্থাৎ আমরা আমাদের চিন্তার যাত্রাটা শুরুই করলাম একটা পার্থক্যের ধারণা থেকে। গরু আর টেবিলের পার্থক্য, টেবিল আর হেডফোনের পার্থক্য। একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা থেকে আর একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার পার্থক্য। এই পার্থক্য বা ডিফারেন্স থেকে শুরু করছি আমরা, হেগেলের দর্শন পাঠ করার আমাদের যাত্রায়।

পার্থক্যের উলটো জায়গাটা কী? ঐক্য। ডিফারেন্সের উল্টো ইউনিটি। (দুটো উল্টো বা বিপরীত ধারণার ছকে যুক্তিনির্মাণের জায়গাটা মনে রাখুন, পরে আমাদের বারবার এটার কথা টানতে হবে।) ডিফারেন্স থেকে শুরু করে তারপর সেই ডিফারেন্স থেকে আমরা পরবর্তী ইউনিটিকে তৈরি করছি। ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স ...। এরকম করতে করতে শেষ অব্দি শেষ ইউনিটিতে পৌঁছই। যার পর আর এগোনো যায়না। হেগেল এটাকে বলেছিলেন ইতিহাসের সমাপ্তি — এন্ডপয়েন্ট অফ হিস্ট্রি। চূড়ান্ত ও শেষ অনড়তা।

বিয়িং বিকামিং নাথিং বাদ দিয়ে আমরা শুরু করেছি সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে, সেই জগতের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার পারস্পরিক পার্থক্য থেকে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাদের আর একটু চেনার চেষ্টা করা যাক। দর্শনের যুক্তিবিদ্যার জগতে তাদের সংজ্ঞায় পৌঁছনোর চেষ্টা করা যাক। সম্মুখস্থ বাস্তবতা তৈরি হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা বা ডিটারমিনেট বিয়িংদের দিয়ে, এই ডিটারমিনেট বিয়িং নির্দিষ্ট হয়, নির্ণীত হয়, ডিটারমিন্ড হয় কী দিয়ে? অবশ্যই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়রাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার বা ডিটারমিনেট বিয়িং-এর কাল এবং ভূমি, টাইম এবং স্পেসের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে দেয়। যে বিশিষ্টতার বাইরে ওই ডিটারমিনেট বিয়িং অনস্তিত্ব।

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তারা, যারা সম্মুখস্থ বাস্তবতাকে রিয়ালিটিকে নির্মাণ করে, এদেরকে যখন আমি আলাদা আলাদা করে এদের পার্থক্য দিয়ে বুঝতে পারছি, তখন এদের বর্গীকরনও সম্ভব। আসুন, সেই চেষ্টা করা যাক। আমরা কী ভাবে চিনছি আমাদের সামনের এই জগতকে? যখন আমরা একটা সত্তাকে অন্য আর একটা সত্তাকে আলাদা করছি, তখন আমরা ঠিক কী ভাবে ভাবছি? আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার ভিতরে যুক্তিনির্মাণটা ঠিক কী ভাবে ঘটছে? ভাবুন, আপনি আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে সামনের পৃথিবীকে বুঝছেন। খুব হাতের কাছেই আছে কিছু জিনিষ। তারা হল আপনার কাছে 'এই' জিনিষ। অন্য সব, যারা আপনার তত কাছে নেই, তারা হল 'ওই' জিনিষ।

সম্মুখস্থ এই বাস্তবতার অভ্যন্তরে কিছু ডিটারমিনেট বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা নিতান্তই সন্নিকটবর্তী — তারা 'এই' বা দিস এবং অন্যরা 'ওই' বা দ্যাট। 'এই' বা দিস বা সন্নিকটবর্তীকে হেগেলের দর্শনে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে রিয়ালিটি (হেগেল যার টেকনিকাল নাম দিলেন বিয়িং-বাই-সেল্ফ)। আর 'ওই' বা দ্যাট বা অন্যান্যকে, আদারস-কে বলা হচ্ছে নিগেশন, রিয়ালিটির নিগেশন (যার টেকনিকাল নাম বিয়িং-ফর-অ্যানাদার)। ওই জিনিষ কী? যা এই জিনিষ নয়। এই জিনিষ হল রিয়ালিটি। ওই জিনিষ হল নিগেশন।

(সম্মুখস্থ এই বাস্তবতার অভ্যন্তরবর্তী এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাদের এই দিস/দ্যাট বর্গীকরন ঘটানোটা হেগেলের একটা গাঁজাখুরি। অস্পষ্টতা। দিস কেন একটুও দ্যাট নয়? দিস বা দ্যাটকে আসলে ভাবা যেতে পারে ফোর্স বা বলের ফ্লাক্স হিশেবে। ফিল্ড হিশেবে। চুম্বকের বলরেখা মনে করুন। আমরা এঁকেছি ধরুন দশটা বারোটা রেখা, কিন্তু রেখাগুলোর বাইরে, ধরুন দুটো রেখার মধ্যের জায়গাটায় চুম্বকের চৌম্বকত্ব কি হারিয়ে যাচ্ছে? নিশ্চই না, পুরোটা জুড়েই তা রয়েছে। আমরা, কত আর আঁকব, তাই গোটাকয়েক এঁকেছি মাত্র। এবার যদি কেউ একটা চুম্বকের বলক্ষেত্রকে শুধু ওই রেখাকটায় বুঝতে চায়, যদি মনে করে তার বাইরে চুম্বকটা আর কাজ করছে না, যে ভুল হবে, হেগেল এখানে ঠিক সেই ভুলটাই করলেন। দিস একটা ফিল্ড, দ্যাট আর একটা ফিল্ড। কিন্তু, এদের ভিতর কোনো সুস্পষ্ট ভেদসীমা আনা সম্ভব নয়। ধরা যাক একটি শিশুর কথা। তার মা তার কাছে দিস। অন্য সবাই, আর সমস্ত কিছু — দ্যাট। তাহলে তার বাবার স্থান কোথায়? দিস না দ্যাট? আসলে কোনো নির্দিষ্ট ডিটারমিনেট বিয়িং-কেই দিস বা দ্যাট বলে চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভব নয়। হেগেল বলবেন, বুঝবার জন্য দিস বা দ্যাট বলতে হচ্ছে। এই 'বুঝবার জন্য' বাক্যাংশটাই গোঁজামিল।)

দিস হল রিয়ালিটি বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ। এবং দ্যাট হল তার নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। ধরা যাক, আমরা একটা অরণ্যে রয়েছি। একটা গাছকে, এই সামনের গাছটাকে বললাম দিস, তাকে নিগেট করল আর একটা গাছ বা তার নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। যে গাছ তখন দ্যাট। সেই গাছকে, সেই দ্যাট গাছকে আবার নিগেট করল আর একটা গাছ। তাকে আমরা ডাকলাম নবতর দ্যাট, মানে দ্যাট$_১$। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাকে নিগেট করল আর একটা গাছ ... এরকম চলল।

দিস $\rightarrow$ দ্যাট $\rightarrow$ দ্যাট$_১$ $\rightarrow$ দ্যাট$_২$ $\rightarrow$ দ্যাট$_৩$ $\rightarrow$ ...

এইভাবে দিসকে নিগেট করে দ্যাট, তাকে নিগেট করে দ্যাট$_১$, তাকে নিগেট করে দ্যাট$_২$, তাকে নিগেট করে ... এই অনন্তকাল ধরে নিগেশন চলতে থাকাকে হেগেল বললেন ব্যাড ইনফিনিটি। বললেন, এইভাবে কোথাও পৌঁছনো যায়না। হেগেলের মতে, বুঝতে গেলে, কোথাও পৌঁছতে গেলে একটা উত্তরন — একটা লিপ ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে। উত্তরন বা লিপের মাধ্যমে একটা বর্গ বা ক্যাটিগরিতে পৌঁছতে হয়। সেই ক্যাটিগরি যা দিস এবং দ্যাট উভয় ডিটারমিনেট বিয়িংকেই ধারণ করে, ইনক্লুড করে।

দিস এবং দ্যাট-এর পরবর্তী সেই ক্যাটিগরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ, যা দিস বা রিয়ালিটি বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ এবং দ্যাট বা নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার — এই দুই বর্গের একটা সংশ্লেষণ (সিন্থেসিস)। দিস বা বিয়িং-বাই-সেল্ফ ছিল থিসিস। তাকে নিগেট করল দ্যাট বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার অর্থাৎ অ্যান্টিথিসিস। তৈরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ বা সিন্থেসিস। এই থিসিস কে অ্যান্টিথিসিসের নিগেট করা, এবং সেখান থেকে সিন্থেসিস-এ পৌঁছনো — এই পুরো পদ্ধতিটার নাম ডায়ালেক্টিকাল পদ্ধতি। এর পর আমরা স্তরে স্তরে হেগেলের এবং মার্ক্স-এর দর্শনে এর প্রয়োগ হতে দেখব।

দিস থেকে নাকচ করে দ্যাট, তাকে না কচ করে আর একটা দ্যাট, তাকে না কচ করে আর একটা — এই না-না করে আমরা কোথাও পৌঁছচ্ছিলাম না। পৌঁছলাম লাফ দিয়ে উপরের ধাপটায় উঠে গিয়ে। উপরের উচ্চতর যে ধাপটার ভিতর আমাদের দিস আর দ্যাট দুজনেই আছে। এই পরবর্তী উচ্চতর বর্গ বা ক্যাটিগরিতে পৌঁছনোর ক্রিয়াটাই নামকরন — লেবেলিং বা নেমিং। অরণ্যের দিস বা এই গাছকে নিগেট করল দ্যাট বা ওই গাছ। দিস এবং দ্যাট এই উভয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে অন্তর্গত করে আমরা পেলাম একটি উচ্চতর বর্গ — গাছ। দিস-ও একটা গাছ। আবার দ্যাট-ও একটা গাছ। এই 'গাছ' একটা নাম, লেবেল। আমরা এই বর্গটির নাম বা লেবেল 'গাছ' না দিয়ে 'দ্রিঘাংচু'-ও দিতে পারতাম। অর্থাৎ, নেম বা লেবেল বা নামটির একটি কাকতালীয়তা বা অ্যারবিট্রারিনেস থাকে। বর্গটি তা বলে কাকতালীয় নয়।

আমাদের বস্তুজগতের এই/ওই দিস/দ্যাট দের একত্রিত করছে বিয়িং-ফর-সেল্ফ। তাদের পার্থক্য, ডিফারেন্স সহ তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে উচ্চতর, হায়ার বর্গে — বিয়িং-ফর-সেল্ফ। তাই, বিয়িং-ফর-সেল্ফ একটা ইউনিটি যা আমাদের সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার পারস্পরিক বৈচিত্র এবং পার্থক্য (ডিফারেন্স) থেকে নির্মিত। এবার, নাম কী করল? সে এই ডিফারেন্স থেকে একটা ইউনিটি তৈরি করল। পার্থক্য ছিল অনেক, তার থেকে বানিয়ে তুলল একটা ঐক্য, মানে এক।

ডিফারেন্স (সামনের বাস্তবতা) → ইউনিটি (নেম বা বর্গ : ওয়ান)

নানা রকমের মানুষ। আর্য, অনার্য, রাক্ষস, কিন্নর, গন্ধর্ব — এই সমারোহে মানুষ নেই। 'মানুষ' শব্দটা নেই তখনো। একসময় 'মানুষ' এই ক্যাটিগরিটা ইমার্জ করল। সবাইকে আমি মানুষ বললাম। 'ম্যান' —এই লেবেল লাগালাম, নাম দিলাম। 'ম্যান' — তৈরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ — ওয়ান, এক। (মার্ক্স যখন আবার পুঁজিতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলেন সেখানে কোমোডিটি বা পণ্য হল সেই বর্গ যা এই ইউজ ভ্যালু ওই ইউজ ভ্যালু সব ইউজ ভ্যালুকেই ধারণ করে। কী ভাবে সেই কথায় আসছি আমরা।)

আমরা শুরু করেছি আমাদের সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে। সেখানে বস্তুকে বুঝবার চেষ্টায় আমি পেয়েছি বর্গ, নেম। এই নেমটা ওয়ান, ঐক্য, ইউনিটি। যেমন মানুষ এই ইউনিটিটা সমস্ত রাক্ষস কিন্নর গন্ধর্বদের এক করল। তাদের ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি নির্মিত হল। মানুষ নামক দোর্দণ্ডপ্রতাপ একক বর্গের ছত্রছায়ায় ইউনিটির ছায়াসুনিবিড় শান্তি। বর্গীকৃত একীকৃত এই 'মানুষ' নামক বর্গের একটা দিকচিহ্ন তৈরি হল — মনুষ্যত্ব — একটা কোয়ালিটি, গুণ। এই কোয়ালিটি আছে বলেই সে মানুষ। এই কোয়ালিটিই তাদের সবাইকে, দিস দ্যাট সবাইকে, একত্রিত করে বিয়িং-ফর-সেল্ফ নির্মাণ করেছে। তাদের সবাইকেই ওই বর্গ করে তুলেছে, ওই 'মানুষ' নামে ডেকেছে। ডিফারেন্স মানে — এই মানুষ / ওই মানুষ। ডিফারেন্সকে আমরা এই ভাবেই পাই। সেই ডিফারেন্সকে বৈচিত্রকে একত্রিত করে আমরা পেলাম বিয়িং-ফর-সেল্ফ বা ওয়ান। ওয়ান মানে কোয়ালিটেটিভলি ওয়ান, গুণগতভাবে এক, মানুষ হল সে যে মনুষ্যত্ব নামক গুণের অধিকারী, কোয়ালিটি হল তাই যা ডিফারেন্সকে ওয়ান করে।

এবার ওই ওয়ানের ঐক্য থেকে আবার আমরা ডিফারেন্স পাব। সেই ওয়ানকে আমরা দেখি নানা ওয়ান হিশেবে। ওয়ানকে পাই মেনি হিশেবে। এককে পাই বহুর রূপে। এই মেনি তৈরি হয় ওই কোয়ালিটির পরিমাণগত পার্থক্য বা কোয়ান্টিটেটিভ ডিফারেন্স দিয়ে। যে কোয়ালিটি ডিফারেন্সকে ওয়ান করে সেই কোয়ালিটির ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টিটি দিয়ে ডিফারেন্স চিহ্নিত হয়। আমাদের চোখের সামনে আমরা 'মানুষ' নামক বর্গটাকে কী ভাবে পাই? অনেক মানুষ, আলাদা আলাদা মানুষ হিশেবে, মনুষ্যত্ব নামক গুণটা তাদের কারুর কম কারুর বেশি। ম্যানকে পাই মেনি মেন, মানুষকে পাই নানা মানুষ হিশেবে। হিউম্যানিটি, মনুষ্যত্ব — এই কোয়ালিটি সেই মেনি মেন-এর এক এক জনের ভিতর এক এক পরিমানে এক একটা কোয়ান্টিটি নিয়ে উপস্থিত। (হেগেলের এই মডেল সমাজবাস্তবতা দিয়েই সবচেয়ে ভালো ভাবে বোঝা সম্ভব, অন্য রকম উদাহরণে একটু অস্বস্তি আসে। আমরা এর পরের সেকশন অধিকারের তত্ত্বে গিয়ে এই যুক্তিনির্মাণগুলো খুব ভালো ভাবে পাব। হেগেলের ফিলোজফি অফ রাইটের সামাজিক উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে।)

সেই পরিমানের ভিন্নতা ওয়ান ম্যানকে মেনি মেন করে। পরিমানের ভিন্নতা ও পরিমাপ। পরিমানের ভিন্নতা থেকে আসে পরিমাপের প্রসঙ্গ। কোয়ালিটির কোয়ান্টিটেটিভ ডিফারেন্স থেকে আমরা পরিমাপ, মেজার-কে পাই। (অষ্টাশিতে আমার বন্ধু ব্যানার্জি সমাজবিজ্ঞান পত্রিকায় এই কোয়ালিটি-কোয়ান্টিটি-মেজার নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল, তাতে ওর শরীরের উপর ভারি চাপ পড়ে, কারণ, পাঠকরা দাবি করেছিল বোঝার অধিকার, এবং এতে ওকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেসব বুঝিয়ে আসার নিষ্ফল চেষ্টা করতে হয়েছিল, এবং শেষ অব্দি সেই পাঠকেরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ওসব বোঝা যায়না। তারপর থেকে ব্যানার্জি আর ওই পত্রিকায় লেখেনি, ইন ফ্যাক্ট আর লেখেইনি প্রায়। বড় দাগা পেয়েছিল ছেলেটা।) ওয়ান এই ক্যাটিগরি তৈরি করার পর সেই ক্যাটিগরি থেকে বড়/ছোট এই পরিমাপ, মেজার তৈরি করতে পারছি। যে কোয়ালিটি আমাদের সম্মুখস্থ ডিফারেন্সকে ওয়ান করেছে সেই কোয়ালিটির পরিমান যার ভিতর বেশি সে বড়, লার্জ। যার কম সে ছোট, স্মল। মনুষ্যত্ব যার বেশি সে বড় মানুষ, যার কম সে ছোট মানুষ। অর্থাৎ, ওয়ান থেকে আমরা পেলাম একটা সমস্বত্ব তল, হোমোজিনিয়াস স্পেস, যার ভিতর স্থাপিত অবস্থায় আমরা বহুকে পাচ্ছি, মেনি-কে পাচ্ছি। ওয়ান একটা অর্ডারড হোমোজিনিয়াস স্পেস, যে স্পেস-এ তাদের আমি র‍্যাঙ্ক করতে পারি। মাপজোক করতে পারি। মাপতে পারি। মেনির একজন থেকে আর একজনকে পৃথক করতে পারি। তাদের

ভিতর উপস্থিত কোয়ালিটির কোয়ান্টিটেটিভ ডিফারেন্সের নিরিখে। যেমন আমার চোখের সামনে আমি মানুষদের দেখছি, বহু মানুষ, মেনি। তারা প্রত্যেকেই বর্গটাকে বহন করছে। প্রত্যেকেই মানুষ। এবার তাদের আমি মাপতে পারছি, কেউ বড় মাপের মানুষ, কেউ ছোট মাপের মানুষ। এই যে মাপতে পারলাম, একটা স্কেল বরাবর তাদের আগে পরে উপরে নিচে রাখতে পারলাম তার কারণ, 'মানুষ' নামের এই বর্গটা তাদের ওয়ান করেছিল তাদের মনুষ্যত্ব নামক কোয়ালিটির সাপেক্ষে। (মনুষ্যত্ব মাপা এই ব্যাপারটা একটু অশ্লীল লাগছে না? লাগবে না, যখন এর পরের সেকশনে আমরা সম্পত্তি মাপব।) তাই, ওয়ান কন্সটিটিউট করে একটা ক্রমবদ্ধ সমস্বত্ত্ব ভূমি (অর্ডারড হোমোজিনিয়াস স্পেস) অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা (মেনি ডিটারমিনেট বিয়িংস) যার অন্তর্ভুক্ত, যাদের এবার র‍্যাঙ্ক করা যায় — উঁচু/নিচু, বেশি/কম, হাই/লো, মোর/লেস। তারা র‍্যাঙ্কড ওই মেজারের নিরিখে। মেজারের কাজ করল মনুষ্যত্ব নামক কোয়ালিটি, তার কম পরিমাণ, বেশি পরিমাণ।

আমাদের ওয়ানকে আমরা পেয়েছিলাম একটা ক্যাটেগোরাইজেশন, নেমিং-এর ভিতর দিয়ে। অর্থাৎ, নেমিং-এর ভিতরেই একটা মেজার উপ্ত, ইমপ্লিসিট রয়ে যায়। ওয়ানকে পাওয়াটা ছিল একটা অন্তর্ভুক্তির, ইনক্লুশনের পদ্ধতি। ওয়ানকে পেয়েছিলাম দিস/দ্যাট — এই সবাইকে ইনক্লুড করে। মেনিকে ওয়ান করার ভিতর দিয়ে আমরা মেনির স্পেসের অভ্যন্তরে একটা র‍্যাঙ্কিং সৃষ্টি করলাম। র‍্যাঙ্কিং মানেই কিন্তু অসাম্য, ইনইকুয়ালিটি। তার মানে আমাদের ঐক্য আবার পার্থক্য হয়ে গেল। ওয়ান আবার মেনি হয়ে গেল।

ডিফারেন্স (সামনের বাস্তবতা) → ইউনিটি (নেম বা বর্গ : ওয়ান) → ডিফারেন্স (মেনি)

ওয়ানকে যা ওয়ান করল সেই কোয়ালিটি বা গুণ মেনিকে একটা ক্রমপর্যায়ের, হায়েরার্কির ভিতর স্থাপিত করল। একটা পরিমাপ তাদের ক্রম-অনুসারী করল। ক্রম যা অসাম্য। অর্থাৎ, ওয়ানকে পেতে গিয়ে মেনিকে আমরা একত্রিত করলাম। মেনিকে ওয়ান করলাম, সমান করলাম। তার ভিতর দিয়েই তাদের ক্রম-অনুসারী করলাম। অসমান করলাম।

এই পরপর ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি — এই ভাবে চলতে চলতে হেগেলের লজিক একসময় তার এন্ড-পয়েন্ট অফ হিস্ট্রি অর্থাৎ আইডিয়ায় গিয়ে পৌঁছয়। এই যে দুটো ধারণা — ওয়ান, মেনি — এক, অনেক — এদুটো হেগেলের লজিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোদ্দা কথাটা হল, যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি সেখানে 'এক'-এর মধ্যেই 'অনেক' নিহিত আছে। দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্য। এই দ্বান্দ্বিক ঐক্যকেই নানা স্তরে ধরতে চেয়েছে হেগেলের যুক্তিবিজ্ঞান। তার ডকট্রিন অফ বিয়িং-এ আমরা আমাদের চারপাশে দেখছি ওয়ান বা এক-কে, যা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অনেক রূপে।

কিন্তু, মাথায় রাখুন, দার্শনিক হেগেল শুরু করেছিলেন চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী নয়, তার পিওর বিয়িং বা বিশুদ্ধ অস্তির ধারণা থেকে। যে বিশুদ্ধ অস্তি তার বাস্তব আকার পেয়েছিল সম্মুখবর্তী পৃথিবীর 'দিস' এবং 'দ্যাট'-এ, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছি। তাই খোদ হেগেলে শৃঙ্খলটা আসলে এরকম

ইউনিটি (পিওর বিয়িং) → ডিফারেন্স (দিস এবং দ্যাট) → ইউনিটি (ওয়ান) → ডিফারেন্স (মেনি) → ...

অর্থাৎ, ওয়ান এখানে প্রকাশিত হচ্ছে মেনি রূপে, ঐক্য প্রকাশিত হচ্ছে পার্থক্যে, ইউনিটি ডিফারেন্স-এর ভিতর শাইন ফর্থ করছে, ঝকঝক করে উঠছে। তাই, বিশ্বপৃথিবী হল একটা ঐক্য এবং পার্থক্যকে মিলিয়ে একটা হায়ার ইউনিটি বা উচ্চতর ঐক্য। এই উচ্চতর ঐক্যকে হেগেল ডাকলেন গ্রাউন্ড বলে। এবং ঐক্য আর পার্থক্যকে ডাকলেন পজিটিভ আর নেগেটিভ বলে। গ্রাউন্ড দাঁড়িয়ে আছে পজিটিভ আর নেগেটিভ এর উপর।

গ্রাউন্ড (হায়ার ইউনিটি)

পজিটিভ (ইউনিটি) নেগেটিভ (ডিফারেন্স)

লক্ষ্য করুন, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তবতায় আমরা কিন্তু গ্রাউন্ডকে পাইনা, সেখানে পাই পজিটিভ আর নেগেটিভ, ইউনিটি আর ডিফারেন্স, দিস আর দ্যাট। গ্রাউন্ড একটা লজিকাল বর্গ, যুক্তিবিজ্ঞান মোতাবেক যেখানে আমরা পৌঁছই, কারণ, আমরা চোখের সামনে, আমাদের সম্মুখবর্তী বাস্তবতায়, দেখছি ঐক্য আর পার্থক্যকে, তাদের মেলাচ্ছে কে? কেউ তো একটা নিশ্চয়ই মেলাচ্ছে? কোনো একটা জায়গায় তো তারা মিলেমিশেই থাকছে? এই মিলনভূমিটাই হল গ্রাউন্ড, যারই মধ্যে রয়েছে তার বিভিন্ন মুহূর্ত (মোমেন্টস) — পজিটিভ আর নেগেটিভ।

কিন্তু, হেগেলের দর্শনে, যা কিছু যুক্তিসিদ্ধ তা দৃষ্টিগোচরে আসবেই, ঝকঝক করে উঠবে। গ্রাউন্ডও তাই চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে ওঠে, বস্তু বা থিং এর আকারে। এর অন্য নাম এক্সিস্টেন্ট — যে আধারে গ্রাউন্ড এক্সিস্ট করে।

এই গ্রাউন্ড আর থিং — এই দুটোর হেগেলীয় দর্শনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ নাম আছে — এসেন্স এবং অ্যাপিয়ারেন্স, সার এবং প্রকাশ। এর মানে কিন্তু এই না যে এসেন্স সত্য এবং অ্যাপিয়ারেন্স মিথ্যা। এসেন্স প্রকাশমান হয়, দৃষ্টিগোচর হয় অ্যাপিয়ারেন্স এর বস্তুজগতে।

এই পুরোটার আরো অজস্র খুঁটিনাটি আছে। কিন্তু আমরা এখানেই থামিয়ে দেব। এর পরের সেকশনে হেগেলের এই লজিকের একটা সহজবোধ্য উদাহরণ দেব হেগেলেরই ফিলোজফি অফ রাইট দিয়ে। তারপর চলে যাব মার্ক্স এর আলোচনায়।

৯।। অধিকারের তত্ত্ব

হাতে গোনা কয়েকটা বাক্যে হেগেলের ফিলোসফি অফ রাইট বোঝার চেষ্টা করা যাক। সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকারের বোধ কী ভাবে গজিয়ে ওঠে বা উঠতে পারে তার একটা হেগেলীয় পাঠ।

একজন শিশু তার সামনে দেখে তার খেলনা, যা তার নিজের, তার কাছে 'আমার'। সে দেখে — এই, দিস। আর আরো অনেক জিনিষ রয়েছে তার সামনে যা তার নয়, তাই তাতে হাত দেওয়া যায় না। সেগুলো হল — ওই, দ্যাট। সেগুলো 'আমার' নয়, 'অন্যের'।

আমার সম্পত্তি। অন্যের সম্পত্তি। 'আমার' নামক চৌম্বকক্ষেত্র একটা জায়গায় শেষ হয়। তার বাইরে পড়ে থাকে অন্তহীন 'অন্যের' নামক সাম্রাজ্য। অর্থাৎ 'আমার' নামক ক্ষেত্রটা থাকা মানেই তার একটা সীমা থাকা। যে সীমার এপারে 'আমার' এবং অন্য পারে 'অন্যের'। এটা যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। অর্থাৎ, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। সামাজিক ভাবেই, সর্বসাধারণের জন্যেই সত্য, সাধারণ সত্য।

আমি যদি 'আমার' নামক ক্ষেত্রের নিজস্ব সীমাটাকে পেরিয়ে 'অন্যের' নামক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করি, তাহলে, তারও অধিকার থাকে আমার সীমা লঙ্ঘণ করে 'আমার' নামক ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ার। আমার সম্পত্তি — এই ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে আমার এবং অন্যের সম্পত্তির আলাদা আলাদা সীমারেখার প্রতি এই দায়িত্ব। আমরা কেউই এই সীমা লঙ্ঘণ করতে পারিনা।

অর্থাৎ, একটা বিমূর্ত সম্পত্তি ধারণা রয়েছে যা আমরা প্রত্যেকেই বহন করি, যারই একটা বিশেষ রূপ হল 'আমার' সম্পত্তির উপর আমার অধিকার এবং 'অন্যের' সম্পত্তির প্রতি দায়িত্ব। এই বিমূর্ত ধারণার নাম অ্যাবস্ট্রাক্ট মরালিটি প্রিন্সিপল বা এএমপি (বিমূর্ত নৈতিকতা সূত্র)।

এবার এই আলোচনাটাকে আগের সেকশনের হেগেলীয় লজিকের মডেলে পড়া যাক।

আমার সম্পত্তি — দিস। বিয়িং-বাই-সেল্ফ।

অন্যের সম্পত্তি — দ্যাট। বিয়িং-ফর-অ্যানাদার।

এর থেকে লাফ দিয়ে উঠে তৈরি হল নতুন বর্গ — সম্পত্তি নামক ধারণা। যা আমার তোমার অন্যের কারুর নয়। বিমূর্ত — বিয়িং-ফর-সেল্ফ।

এই সম্পত্তি হল ওয়ান। যার বিভিন্ন মুহূর্ত বা মোমেন্টগুলো হল আমার সম্পত্তি, তোমার সম্পত্তি, অন্যের সম্পত্তি। ওয়ান বা 'সম্পত্তি' নামক বর্গ প্রকাশিত হল মেনি-র ভিতর, অনেক ব্যক্তির অনেক সম্পত্তি।

এলো কোয়ালিটি — সম্পত্তিধর্ম — সম্পত্তির সম্পত্তি হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য, ধরুন, ধণাঢ্যতা। যে কোয়ালিটির ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টিটি রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সম্পত্তিতে। এলো তার পরিমাপ বা মেজারমেন্ট। যে কারণে আদিত্য বিড়লা আর আমার সম্পত্তি আলাদা। বড়, ছোট, বেশি ধণাঢ্য, কম ধণাঢ্য। বিড়লা বড়লোক, আমি ছোটলোক। আদিত্য যে আমার চেয়ে বড়লোক তা টাকার পরিমাপে পরিষ্কার প্রমাণ করা যায়।

এই ওয়ান এবং মেনির পজিটিভে এবং নেগেটিভে, অ্যাপিয়ারেন্সের দুনিয়ায় প্রকাশমান হচ্ছে কোন এসেন্স?

সম্পত্তিবদ্ধ এই সমাজের সেই সার বা এসেন্সটা হল এএমপি (অ্যাবসলিউট মরালিটি প্রিন্সিপল) বা বিমূর্ত-সম্পত্তি-নীতি। যে এসেন্স প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন বস্তু বা থিং-এর আধারে, বিভিন্ন সম্পত্তিতে।

এবার এই মডেলে রাষ্ট্রকে ভাবুন। তার সংবিধান, তার আইনব্যবস্থা, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা, মিলিটারি এবং ব্যক্তি নাগরিকদের মিলিয়ে।

এই এএমপি লিপিবদ্ধ রইল তার আইনের কেতাবে, সংবিধানে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি নাগরিকের এবং রাষ্ট্রের অধিকার কতটা এবং কতদূর। এই অধিকার নিয়ে যদি কোনো গোলযোগ বাধে, তার ব্যাখ্যা এবং সমাধানের জন্যে রইল আইনব্যবস্থা এবং আইনজীবীরা। কেউ যদি কোনো সম্পত্তির উপর কোনো অনধিকারচর্চা করে তখন আইনব্যবস্থার নিদানকে বাস্তবায়িত করার জন্যে পুলিশ। দেশের অর্ন্তদেশীয় সম্পত্তির উপর কোনো বর্হিদেশীয় হস্তক্ষেপের মোকাবিলার জন্যে মিলিটারি। এই এএমপি-ই তখন রাষ্ট্রের আর এক নাম। তাকে বহন করছে প্রতিটি সভ্য নাগরিক। যদি কোনো পকেটমার এই সম্পত্তিনীতিকে লঙঘণ করে তো নাগরিকেরা তাকে প্রহারে উদ্যত হয়, এমনকি সেই পকেট নিজের না হলেও, কারণ, সেই পকেটমার শুধু একটি সম্পত্তিকে নয়, চ্যালেঞ্জ করেছে এই সামগ্রিক এএমপি-কে যা এখন নাগরিকদের নৈতিকতা।

(আর একটা ছোট্ট জিনিষ এখানে বলে রাখি যেটা আমার আগের সেকশনেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু ভুলে গেছিলাম। সেটা হল ডায়ালেক্টিক্স-এর প্রসঙ্গ। এই যে পরস্পর বিরোধী দুটো সত্তা, ঐক্য আর পার্থক্য, বা পজিটিভ এবং নেগেটিভ, এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা হেগেলীয় সমগ্রের ধারণায় পৌঁছই — এটাকেই বলা হয় ডায়ালেক্টিক্স। কিন্তু, মাথায় রাখবেন যে, ঐক্য আর পার্থক্য, বা পজিটিভ এবং নেগেটিভ — এরা কিন্তু পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নয়। একই বাস্তবতাকে দুটো আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। একই বস্তু বা সত্তা সমগ্র, তাকে একবার আমি দেখছি 'ওয়ান' হিশেবে, আর একবার দেখছি 'মেনি' হিশেবে। যদি তারা পরস্পরের থেকে আলাদা হত তখন আমরা একে আর ডায়ালেক্টিক্স বলতাম না, বলতাম কন্ট্রাডিকশন। দুটো ভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে যা ঘটে থাকে। ধরুন দুটো ব্যক্তি, বা পার্টি বা অন্যকিছু। এই প্রসঙ্গটা এখানে আনলাম কিন্তু কোনো দার্শনিক কূটকচাল হিশেবে না, এই তফাৎটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে মার্ক্স-এর 'শ্রেণী' নামক বর্গটা বুঝতে গিয়ে। অনেক মার্ক্সবাদীই এখানে গুলিয়ে ফেলেন। মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী দুটো আলাদা সত্তা, তুমি ভাই এবার ঠিক করে নাও তুমি কোনদিকে, শ্রমিক না মালিক, ব্যাপারটা আদৌ এরকম না। গোটা সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে দেখার দুটো দৃষ্টিকোণ 'মালিক' এবং 'শ্রমিক'। কোনো একজন ব্যক্তি কোন শ্রেণীর মানুষ এই কথাটার কোনো মানেই নেই, একজন রিক্সাওয়ালাও যদি একটা শেয়ার কেনে সে মালিক হয়ে বসে। আবার একজন মালিকও যদি তার সংস্থায় কোনো কাজ করে সে শ্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। আবার একটাও শেয়ার না-থাকা সত্ত্বেও একজন শ্রমিক মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। শ্রেণী মানে একটা অবস্থান, একটা দৃষ্টিকোণ, একটা বিশিষ্ট এন্ট্রি-পয়েন্ট। শ্রেণী কোনো ভৌত বর্গ নয়। একটা দার্শনিক বর্গ। এর পরেও বারবার আমরা এই আলোচনায় আসব।)

১০।। মার্ক্স — সমাজ বিবর্তন

এবার অসম্ভব সংক্ষেপে মার্ক্স-এর তত্ত্ব নিয়ে দুচার কথা বলার চেষ্টা করা যাক। ভেবেছিলাম পণ্য থেকে শুরু করব। কিন্তু, লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, তার আগে একটু মার্ক্সীয় দর্শনের সমাজ বিবর্তনের তত্ত্ব নিয়ে একটু বলে নেওয়া যাক। এর পরের সেকশনে পণ্য আসবে।

এখানে একটা জিনিষ বোঝার আছে। মানুষের সমাজ চিরকাল একরকম ছিলনা। সময়ের সাথে সাথে তা বদলেছে। সমাজবিবর্তনের এই ইতিহাস নিয়ে আলোচনাগুলোকে মার্ক্সবাদ এককথায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে ডাকে। ইতিহাস বদলায় কেন এবং কী ভাবে তাই নিয়েও মার্ক্সবাদের নিজস্ব একটা ভাষ্য আছে। যেমন, আমরা বলেছিলাম, একটা বড় মাপের সুসংহত থিয়োরি শুধুমাত্র চোখের সামনের জিনিষগুলোকেই নতুন ভাবে দেখে না, তাদের ব্যাখ্যা করে, তাদের কার্যকারণ সম্পর্কগুলোকেও আলোচনা করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মনে করে, মানবসমাজের প্রাচীনতম অবস্থা ছিল আদিম সাম্যবাদ (প্রিমিটিভ কমিউনিজম)। আদিম সাম্যবাদের আবার দুটো স্তর। এক, শিকারী-সংগ্রাহক (হান্টার-গ্যাদারার), যখন যূথবদ্ধ আদিম মানুষের ছোট ছোট দলগুলো জন্তু শিকার করে এবং ফলমূল সংগ্রহ করে খেত। আর দুই, এর পরের স্তর, যাযাবর-পশুপালক (নোমাডিক-প্যাসচোরালিস্ট), যখন যাযাবর এই দলগুলো ক্রমে আরো বড় হচ্ছে, তারা তাদের জীবনধারণের জন্যে পশুপালন শুরু করছে, সেখান থেকে শুরু হচ্ছে আদিমতম চিকিৎসা ও প্রকৃতিবিদ্যা। এর পরে তারা ক্রমে কৃষি শিখলো। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পশ্চিম-ইউরোপ ভিত্তিক যে সংস্করণ মার্ক্স রেখেছিলেন সেখানে এর পরের স্তর দাস-ব্যবস্থা (স্লেভ মোড অফ প্রোডাকশন)। কিন্তু অন্য নানা জায়গায়, বিশেষত, জর্মন কিম্বা পূর্ব-ইউরোপের কথা বলতে গিয়ে, কৃষি-ভিত্তিক জার্মানিক মোড অফ প্রোডাকশনের কথা বলেছেন মার্ক্স, যেমন গ্রুন্ডরিস বইয়ে। এশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন দাস-ব্যবস্থা সেভাবে কখনোই না থাকায়, এর পরের অবস্থা বলা যায় এশিয় উৎপাদন ব্যবস্থা (এশিয়াটিক মোড

অফ প্রোডাকশন)। মূল মডেলে, মানে পশ্চিম-ইউরোপে, দাস-ব্যবস্থার পরের স্তর সামন্ত-ব্যবস্থা (ফিউডাল মোড অফ প্রোডাকশন)। তার পরে এলো পুঁজি ব্যবস্থা (ক্যাপিটালিস্ট মোড অফ প্রোডাকশন)। অর্থাৎ, পশ্চিম-ইউরোপের মডেল ভাবলে স্তরগুলো এরকম — আদিম সাম্যবাদ → দাস ব্যবস্থা → সামন্ত ব্যবস্থা → পুঁজি ব্যবস্থা।

একটা ব্যবস্থা থেকে আর একটা ব্যবস্থায় বদলানোর রীতিবিধিগুলো মার্ক্সবাদের একটা মূল উপজীব্য। সেটা একটা বিরাট আলোচনা। আমরা এখানে একদুকথায় ছুঁয়ে চলে যাব। মার্ক্সবাদ এই বদলের ব্যাকরণকে নিহিত দেখে অর্থনীতির ভিতর। সে গোটা সমাজব্যবস্থাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে। ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো, বা, বেস এবং সুপারস্ট্রাকচার। বেসের উপর বেস করে সুপারস্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে থাকে। বেস হল অর্থনীতি। এবং সুপার স্ট্রাকচার হল কালচার, সংস্কৃতি, তত্ত্ব, জ্ঞান — এই সব কিছু। এই বেস-সুপারস্ট্রাকচার আলোচনায় আমাদের আবার ফেরত আসতে হবে, পরে। এখন এই বেসকে ভাবুন। অর্থনীতি। মানে, সম্পদ কিভাবে তৈরি হয় এবং সেই সম্পদের উপর মালিকানা কার হয়, কী করে হয়।

সম্পদ, বা তার তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া, বা সেই তৈরি হয়ে ওঠা সম্পদের আলোচনায় প্রথমেই যে বর্গটা আসে সেটা হল উৎপাদিকা শক্তি, একটা সমাজব্যবস্থার মোট সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা। সম্পদ বলতে এখানে সেই সমস্ত কিছু মানবসমাজ যা অধিকার করতে চায়। আমরা যদি বাজারের নিরিখে ভাবি তাহলে বলা যায় এমন কিছু যার বিনিময় মূল্য আছে, অর্থাৎ, বাজারে যা বিক্রি করে পয়সা পাওয়া যায়। বিনিময় মূল্য বা এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর আলোচনায় আমরা পরে আসছি। একসাথে গোটা মানব সমাজের উৎপাদিকা শক্তির কথা ভাবুন, কী ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেছে সেটা যুগের পরে যুগে, মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, সেটা হঠাৎ করে আমাদের মাথায়ই আসেনা। আর মোটের উপরে এই বেড়ে যাওয়া সম্পদের সম্ভার বদলে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রাকে। গরীব বড়লোক নির্বিশেষে। এমন নয় যে গরীবরা সব বড়লোক হয়ে গেছে। গরীব বড়লোকদের ফারাকটা ফারাকই আছে। কিন্তু আজকের একজন গরীব মানুষের জীবনযাত্রাও আজ থেকে কয়েকশো বছর আগেকার পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী মানুষটির কাছেও অকল্পনীয় ছিল। এটা ঘটেছে মানবসভ্যতার অধিকারে এই মোট সম্পদের পরিমাণ এতটা বেড়ে যাওয়ায়।

সম্রাট অশোক, তার আমলে অবভিয়াসলি সবচেয়ে বড়লোকদের একজন, ধরুন আজকের বিল গেটস। সেই সম্রাট অশোকের কোনো হাতঘড়িই ছিল না, আমার মত ডিজিটাল ঘড়ি তো ছেড়েই দিন, যাতে স্টপ ওয়াচ আছে, ঘন্টা আছে, আবার তারিখও দেখা যায়। শোনা যায়, মহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধু প্রদেশের ইলিশ খেয়ে ডায়োরিয়ায় এন্তেকাল করেছিলেন, এটা হত না যদি নুন-চিনি-জলের ওআরএস পেতেন, আজকের বস্তির বাচ্চারাও যা পায়। গায়ককে সামনে বসিয়ে ছাড়া গান শোনার কোনো উপায় ছিলনা প্রতাপাদিত্যর, আর আমরা ক্যাসেট সিডি তো ছেড়েই দিন, ধ্যাড়াধ্যাড় এমপিথ্রি ফাইল ডাউনলোড করছি ইন্টারনেট থেকে। বুশ গোরের বাতেলা শুনছি। যাতায়াত ভাবুন। এরকম সবকিছুই। মোট সমস্ত জিনিষ পত্তর দ্রব্য সেবা পরিসেবা খাবার বই ডাক্তারি জামা কাপড় ফিল্ম নাটক গান ট্রান্সপোর্ট সবকিছু মিলিয়ে সমস্ত বস্তুর মোট উৎপাদনের যে ক্ষমতা একটা মানবসমাজের থাকে, তাকে যদি উৎপাদনী শক্তি বলে ডাকি আমরা, তা কিন্তু একটানা বাড়তেই থেকেছে মানবসমাজের গোড়া থেকে আজ অব্দি। মোট বস্তু, মোট উৎপাদন, মোট সম্পদ, মোট নিয়ন্ত্রণ।

এই উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে চলার সাথে সাথে মানুষের সমাজও বদলাতে থেকেছে। একটা সমাজকে বোঝার জন্যে প্রথমে বোঝা দরকার পড়ে ক্ষমতা কার হাতে আছে, এবং কী ভাবে সেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে গোটা মানবসমাজটাকে। যেমন দাস-ব্যবস্থায় দাসমালিক নিয়ন্ত্রণ করত দাসদের। সামন্ত অবস্থায় রাজা, তার নিচে তার জমিদার সামন্তরা। পুঁজি ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা। এবার প্রশ্ন করুন, ক্ষমতা এই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কেন? কারণ, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ যার, মালিকানার চাবিকাঠি তার হাতে। মালিকানা মানে উৎপাদন পদ্ধতির উপর মালিকানা। তার মানে উৎপাদিত সমস্ত কিছুর উপর মালিকানা। প্রতিটি দ্রব্য বা সেবার উপর নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতা, আর এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি মানুষকে, কারণ উৎপাদিত ওই দ্রব্য বা সেবা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। ধরুন সামন্তযুগে একজন রাজা বা জমিদার আদেশ দিল যে বিদ্রোহী প্রজাকে কোনো চাষী তার ধান দেবেনা, কোনো তাঁতি তার কাপড়, বা কোনো কবিরাজ তার চিকিৎসা। (যদিও নিয়ন্ত্রণকে শুধু এই দ্রব্য বা সেবা মানে অর্থনীতি দিয়ে ভাবা মানে একটা যান্ত্রিকতা। দেখুন না, যদি তাই হত, তাহলে যে কোনো যুগেই এই দ্রব্য বা সেবার উপর নিয়ন্ত্রণ থেকেছে তো সেই যুগের শাসকেরই, দাসযুগে দাসমালিকের, সামন্তযুগে সামন্তর, বা পুঁজিযুগে পুঁজিপতির, তাহলে তো কোনোদিনই কোনো বিদ্রোহ ঘটত না, কোনো যুগই বদলাত না, তাহলে বদলগুলো ঘটেছে কী করে? নিয়ন্ত্রণ শুধু এই অর্থনীতি

দিয়েই না, সংস্কৃতি দিয়েও নিয়ন্ত্রণ হয়, মানুষের চিন্তার উপরে নিয়ন্ত্রণ। দুটোই সেখানে মিলে মিশে আছে, যেমন বিদ্রোহেরও অর্থনৈতিক কারণ থাকে, সে কথায় পরে আসছি আমরা।)

সম্পদ বলতে আমরা মোট দ্রব্য ও সেবার সম্ভারকে বুঝছি, গোটা সমাজ জুড়ে যা উৎপাদিত হচ্ছে। সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা যেমন সবকিছুর চূড়ান্ত মালিক। এমনকী জমিও সব তার, যে কারণে প্রজাকে খাজনা দিতে হয়, কৃষিকাজে ব্যবহার করার জন্যে মূল্য ধরে দিতে হয়। কিছু মানুষ সম্পদের মালিক আর অন্য কিছু মানুষ নয় — ধরুন এই পুরোটাকে আমরা ডাকছি সম্পত্তি-সম্পর্ক বলে। প্রত্যেকটি আলাদা যুগে আলাদা সমাজে আলাদা আলাদা সম্পত্তি সম্পর্ক। দাস-ব্যবস্থায় দাসেরা ছিল মালিকের সম্পত্তি, এখন আর কোনো মানুষই অন্য আর কারুর সম্পত্তি নয়।

উৎপাদিকা শক্তি যে বস্তু-সমাহার অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদন করছে সেটার মালিক কে হবে সেটাই নির্দিষ্ট করে দেয় উৎপাদন সম্পর্ক তথা সম্পত্তি-সম্পর্ক। যেমন দেখুন, দাসেরা সম্পদ উৎপাদন করত, মালিকানা হত দাসমালিকের। আবার একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারখানা ভাবুন, মানে যেরকম সব কারখানা আমাদের চারপাশে, সেখানে কী হয়? বস্তু উৎপাদন করে শ্রমিক, সেটা বিক্রি করে মুনাফা, নতুন সম্পদ, কিন্তু সেই নতুন সম্পদের মালিক হয় শ্রমিক নয়, পুঁজিপতি মানে পুঁজির মালিক। (এখানে অনেক সময়ই চালু অর্থনীতির জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন আসে, ইকনমিক্সের ক্লাসে ছাত্ররাও এরকম জিগেশ করেছে, কেন, স্যার, শ্রমিক তো তার প্রাপ্য পায়, তার শ্রমের বদলে, তার মজুরি, আর মালিক পায় তার প্রাপ্য, তার পুঁজির বদলে, তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়? এই মালিকের প্রাপ্য প্রসঙ্গটায় আমরা পরে আসছি।) সম্পদের মালিক যে হয় সে সম্পদশালী। তখন দু ধরনের মানুষ গড়ে ওঠে, সম্পদশালী আর সম্পদহীন। হ্যাভ আর হ্যাভ-নট। এই সম্পদশালী অংশ হল অশ্রমিক — যারা শ্রমিকের শ্রমের ফসল ভোগ করে।

এবার, এই সম্পত্তি-সম্পর্ক যখন বদলেছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও বদলেছে। পুরু বলেছিল যে সে রাজার কাছ থেকে রাজার ব্যবহার আশা করে, কিন্তু পুরু ছাড়া অন্য অনেক পুরুষও তো লড়াই করেছিল এবং বন্দী হয়েছিল, তাদের কাউকে তো আলেকজান্ডার প্রশ্নটাই করেনি। কারণ তারা রাজা নয়। বচ্চন আর জয়া দুজনেই ফিল্মস্টার, বিয়ে করেছেন তারা, কিন্তু শোলের বচ্চন তো পাগলের মতো প্রেমে পড়েও জয়াকে পায়নি, বেঘোরে মারা গিয়ে জয়ার চোখের জলেই খুশি থাকতে হয়েছিল, কারণ সে সামাজিক সম্পর্ক মানেনি। নেমকহারাম ভাবুন — রাজেশ আর অমিতাভের অত নিবিড় বন্ধুত্বও কেমন ফেঁশে গেছিল। গোটা সমাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্কটা গড়ে ওঠে এই সম্পত্তি-সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এরকমই মার্ক্সবাদের ধারণা। আবার সেই বেস-সুপারস্ট্রাকচার মডেল মনে করুন। সম্পত্তি-সম্পর্ক মানে অর্থনীতি — বেস, আর সামাজিক সম্পর্ক মানে সংস্কৃতি — সুপারস্ট্রাকচার। মার্ক্সবাদী মডেলে বেস হল কারণ, সুপারস্ট্রাকচার কার্য। সুপারস্ট্রাকচার = f(বেস)। অতয়েব, মার্ক্সবাদের অন্য সব জায়গার মত এখানেও বেস সুপারস্ট্রাকচারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সম্পত্তি-সম্পর্কের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হবে সামাজিক সম্পর্ক কী হবে।

তাহলে একটা সমাজকে বোঝার যে উপাদানগুলো আমরা পেলাম সেগুলো হল —

উৎপাদিকা শক্তি

সম্পত্তি সম্পর্ক

সামাজিক সম্পর্ক

মার্ক্সবাদী সমাজ-রূপান্তরের তত্ত্ব আমাদের জানায়, সমাজের উৎপাদিকা শক্তি নিয়ত বেড়েই চলে, এবং সেই ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে একসময় পুরোনো সমাজকাঠামোর (মানে সম্পত্তি-সম্পর্কের এবং সামাজিক সম্পর্কের) সংঘাত হতে থাকে, একসময় পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পুরোনো ক্ষমতার জায়গায় নতুন ক্ষমতা দেখা দেয়। সামন্ত ব্যবস্থা থেকে পুঁজি ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় পুরোনো সামন্ত সমাজপতিদের জায়গা নেয় ব্যবসায়ীরা, নব্য ক্ষমতা। সমাজের সর্বস্তরে আপাদমস্তক বদল হতে থাকে। এই বদল যখন অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বদলের স্বাভাবিক গতিতে ঘটতে থাকে, কোনো নাটকীয় এবং হিংস্র বদল ব্যতিরেকে তখন সেটা বিবর্তন, এবং যখন সেই বদলটা ঘটে কোনো সচেতন শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা তখন তাকে আমরা বলি বিপ্লব। এবং সেই বিপ্লবের সেই সচেতন নেতাকে বিপ্লবী। যেমন, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবে বিপ্লবী নেতৃত্ব দিয়েছিল সেখানের কমিউনিস্ট পার্টি। আর গ্রেট বিটেনের পুরোনো সামন্ততন্ত্র থেকে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে বদলটা ঘটেছে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পথে। সেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কোনো রক্তক্ষয় ঘটেই নি বলেই শোনা যায়। ছোটো ছোটো সামাজিক বদলের মধ্যে দিয়ে। এর পরের সেকশনে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস থেকে এই রকম একটা ছোটো সামাজিক বদলের কথা বলব। যার মধ্যে দিয়ে

ভারতে পুঁজিব্যবস্থার উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু একটা জিনিষ মাথায় রাখতে হবে, গ্রেট ব্রিটেনে পুঁজির উদ্ভব এবং ভারতের পুঁজি ব্যবস্থার উদ্ভবের উপাখ্যান সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য। ভারতের পুঁজি ঔপনিবেশিক পুঁজি। অনেক পরে আমরা আসব সেই প্রসঙ্গে।

১১।। পুঁজি ও শ্রমশক্তির উদ্ভব

গণদেবতার প্রথম বাক্য — "কারণটা সামান্যই, তাহা লইয়া অনর্থক একটা কোলাহল বাধিয়া উঠিল।" এরপর গণদেবতার প্রথম পাতাগুলোয় যে অবস্থাটার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা হল একটা গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে পুঁজি-ব্যবস্থার বাজারের প্রথম মুখোমুখি হওয়ার ইতিহাস। অনি কামার আর গিরীশ ছুতোর তাদের কাজ, মানে যেসব লোহার আর কাঠের জিনিষপত্র গ্রামের লোকের দরকার পড়ত সেইসমস্ত, ধানের বিনিময়ে করে দিতে অস্বীকার করল। এতদিন পুরো মূল্যকাঠামোটা নির্দিষ্ট ছিল ধানের মাপে, এক এক পরিমাণ ধান এক একটা জিনিষের জন্যে, এখন তারা মুদ্রায়, টাকা-পয়সায় দাম চাইল। অর্থাৎ পুরোনো বার্টার বিনিময় (যেখানে টাকা-পয়সার কোনো ভূমিকা থাকে না, বস্তুর বদলে বস্তু বিনিময় হয়, ধরুন এক ভাণ্ড মধুর বদলে দুই ভাণ্ড দুধ) পরিত্যাগ করে তারা অর্থভিত্তিক বিনিময়ে আসতে চাইছে। এর কারণ যেটা ছিরু পাল নির্দিষ্ট করল সেটা আরো ইন্টারেস্টিং, ওদের এখন কঙ্কণার বাবুদের বাজার থেকে বৌদের জন্যে শাড়ি আর নিজেদের জন্যে সিগারেট কিনতে হবে না? দেখুন, বাজার এসে গেছে কাছেই, সেখানে এসে গেছে ভোগ্য পণ্য — ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থার অগ্রদূত। এবং তার অভিঘাতে পুরোনো সমাজ অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে পড়ছে।

গনদেবতার শুরুতে ওই কোলাহল পুরোনো সমাজ অর্থনীতির কাঠামোর সঙ্গে নতুন কাঠামোর সংঘর্ষের চিহ্ন। এবং এই উদাহরণটার মধ্যেই ভ্রূণ পুঁজিতন্ত্রের আরো কিছু চিহ্ন আছে বলেও যেন মনে হচ্ছে। কাছে এখন গনদেবতাটা নেই, নইলে শিওর হয়ে বলা যেত, গনদেবতার শেষে বোধহয় অনি কামার আর গিরীশ ছুতোর দুজনেই গ্রাম থেকে শহরে চলে গেছে, যেমন চাষবাস ছেড়ে পাটকলে কাজ করতে চলে গেছিল মহেশের গফুর, আখ্যানের শেষ বাক্যে। মার্ক্সবাদীরা এই সমাজ রূপান্তরের মোট পদ্ধতিটাকে এক কথায় ট্রানজিশন বলে ডাকে, সেই ট্রানজিশন প্রক্রিয়ায় এই গ্রাম থেকে শহরে উৎখাতটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ। পুরোনো গ্রামবাসী ছিল আর্টিজান, মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদক, তার নিজের ছোটখাটো একটা সম্পদ, একটা বাস্তু, একটা জোতজমি, একটা ছোট মাপের টেকনলজি নিয়ে সে নিজে উৎপাদন করত এবং বেচত, এবার সে শহরে যায়, তার পুরোনো সম্পদ এবং পুরোনো সমাজ দুটোই হারিয়ে — নতুন সমাজ বাস্তবতায় বসবাস করতে আসে, চটকলের বস্তিতে। এখানে শহর মানে অন্য কিছু না, যেখানে অনেক কলকারখানা আছে। নিজের সবকিছু হারিয়ে যেখানে এলে কাজ জোটে, খেতে পাওয়া যায়।

আগে সে নিজের উৎপাদন পদ্ধতির নিজেই মালিক ছিল, এখন সে কর্মচারী, নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে পণ্য উৎপাদন করে যা বাজারে বিক্রি হয়। আগে সে ছিল একজন সামাজিক ভাবে স্থাপিত একটা মানুষ, সে তার চারপাশের মানুষের জন্যে লোহার বা কাঠের জিনিষ তৈরি করত। এখন সে একজন কর্মী। কোনো না কোনো পণ্যের কর্মী। যারা তার জিনিষ কেনে তারা আর তাকে চেনে না। এমনকী সে আর আস্ত একটা জিনিষ আদ্যোপান্ত তৈরিই করে না আর। হয়ত সে শুধু রেঞ্চ ঘোরায়, শুধুই রেঞ্চ ঘোরায়, এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে রেঞ্চ ঘোরানোর যে চোখের সামনে কারোর পোঁদের বোতাম দেখলেও ঘুরিয়ে দেয়। আধুনিক সময়, মডার্ন টাইমস। আগে তার উৎপাদনে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মানুষের, এখন তার সঙ্গে সম্পর্ক কেবল পণ্যের। হয় শ্রমশক্তি বিক্রেতা হিশেবে শ্রম দাও পয়সা নাও, অথবা সেই পয়সা নিয়ে বাজারে গিয়ে পয়সা ফেকো তামাশা দেখো। মানুষের সঙ্গে মানুষের জ্যান্ত সম্পর্ক জায়গা ছেড়ে দিল মানুষের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্কে — এটাই পণ্য-প্রতিমার পুজো, কোমোডিটি ফেটিশিজম।

এই নিয়ে দিস্তা দিস্তা ঝুড়ি ঝুড়ি আলোচনা ও বিতর্ক আছে, পুঁজির উদ্ভবের বিভিন্ন খুঁটিনাটি এবং তার চুলচেরা বিচার। সেইসবে আমরা যাবনা এখানে। শুধু এইটুকু ভাবুন। একটা ব্যবসা বানিজ্য চলছিল মানুষের ভিতর অনেক হাজার বছর ধরে। বিনিময়। আমার যা নেই তা তুমি দেবে, তোমাকে আমি দেব তোমার যা নেই। সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে ব্যাবিলনের মানুষদের বাণিজ্যের চিহ্ন আছে। এই বাণিজ্যের মধ্যে সঞ্চিত মূলধন একসময় তার মাথা গলাতে শুরু করল উৎপাদনের ভিতর। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিচ্ছিল রাজদণ্ড রূপে। ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল উৎপাদনে আসতে শুরু করল, শুরু করল উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালু তৈরি করা (পরে আসছি আমরা এগুলোয়)। পরিণত হল উৎপাদক পুঁজি বা প্রোডাক্টিভ ক্যাপিটালে। (এই প্রোডাকিভ ক্যাপিটাল আর মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল পার্থক্যটা মনে রাখুন।) প্রোডাক্টিভ ক্যাপিটাল তার উৎপাদন বাড়িয়েই চলছিল মানবসভ্যতা

এবং তার জনসংখ্যা বেড়ে চলার সাথে সাথে। তাতে পুরোনো স্বাধীন উৎপাদকেরা, ওই অনি কামার, গিরীশ ছুতোর আর গফুর চাষীরা এসে যোগ দিচ্ছিল। বেড়ে উঠছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। যাকে তার আগেকার উৎপাদন ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে পৃথক করার সবচেয়ে বড় জায়গা শ্রমশক্তি। শ্রম এই ব্যবস্থায় দেখা দিল শক্তি রূপে। বিক্রয়যোগ্য একটা শক্তি। যাকে বিক্রি করা যায়। বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা যায়। তাকে আমরা ডাকি মজুরি বা মাইনে বলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যদি আমরা বুঝতে যাই, যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মাথায় আসে সেটা হল শ্রমশক্তি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিক পুঁজিব্যবস্থার শ্রমিক হল প্রথম যে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। দাস-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিতুলনায় ভাবলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। দাসব্যবস্থার কথা ভাবুন। একজন দাস, তার তো কাজ করার কোনো দায় নেই, কারণ, সে জানে খেতে সে পাবেই, দাসমালিকই তার মৃত্যু ঘটতে দিতে পারে না, কারণ সে তো মালিকের একটা সম্পত্তি, সে মারা যাওয়া মানে মালিকের নিজেরই ক্ষতি। তাই, কাজ করার কোনো দায় না থাকায়, তাকে অত্যাচার করে কাজ করাতে হত। অত্যাচার করার জন্যে ক্রমে মালিকদের আরো আরো ম্যানেজার রাখতে হচ্ছিল, যারা কাজ করত ওই অত্যাচারক উৎপীড়কের ভূমিকায়। তাদের পুষতে গিয়ে ক্রমে ব্যয় আরো বেড়ে যাচ্ছিল, আজকের ক্যাপিটালিজম-এর ভাষায় বললে 'ইনএফিশিয়েন্ট', শেষ পর্যন্ত একসময় দাসব্যবস্থা উঠেই গেল।

এর বিপরীতে পুঁজি-ব্যবস্থার আধুনিক শ্রমিককে ভাবুন। সে কারোর সম্পত্তি নয়, তাই কারুর তাকে পোষার দায় নেই, যদি কাজ না করে তো সে খেতে পাবে না। সে বিক্রি করছে তার শ্রমশক্তি। ক্রয়বিক্রয়ের ক্রিয়াটা ঘটে দুজন সমান মানুষের ভিতর, চুক্তির অধিকারের তলে তারা পরস্পরের সমান। যেমন আপনি যদি একটা বাচ্চাকে চকোলেট দিয়ে তার বাবার ব্রিফকেস নিয়ে কেটে পড়েন তো পুলিশ আপনাকেই ধরবে। কারণ, ক্রয় বিক্রয়ের একটা শর্তই হল এই যে দুই পক্ষই তাদের নিজেদের পণ্যের মালিক। একটি শিশু তো মালিক হতে পারে না। তাই ক্রয়বিক্রয়ের সমতা মোতাবেক শ্রমিক আর মালিক দুজনে দুজনের সমান। কিন্তু সেই সমানতার মানে কী? দু পক্ষেরই নিজেদের খুশিমতো চুক্তি নাকচ করার স্বাধীনতা। শ্রমিক চাইলেই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে, আবার মালিকও চাইলে তাকে ছাঁটাই করতে পারে। এই চুক্তির অধিকারের সমতার প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার আসব। হেগেল আর মার্ক্স-এর ফ্যান্টাসির বিষয়ে আলোচনায়। শ্রমশক্তির বিক্রয়ের ব্যাপারে আর একটা বিষয়ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেটা পরে মার্ক্সবাদের খামতিগুলোর আলোচনায় আসবে। শ্রমশক্তি হল মানব সভ্যতার ইতিহাসে একমাত্র পণ্য যা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই তার শ্রমশক্তি আটঘন্টার জন্যে কেনা মানে, পরোক্ষে, তার শরীরকে তথা মানুষটাকেই আট ঘন্টার জন্যে এক অর্থে কিনে নেওয়া।

১২।। পণ্য এবং সাম্য

একটু আগে, ৮ নম্বর সেকশনে আমরা লিখেছিলাম পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য হল সেই বর্গ যা এই পণ্য ওই পণ্য সমস্ত পণ্যকেই হাজির করে। আসলে আমরা লিখতেই পারতাম এই বস্তু ওই বস্তু সব বস্তুকেই হাজির করে, কারণ, পুঁজিসমাজ সেই সব বস্তুকেই আসলে ভুলে যায়, অবস্তু বলে মনে করে যা অপণ্য, সেই সব শ্রমকেই পণ্ডশ্রম মনে করে যা পণ্য উৎপাদন করেনা। বছর দুয়েক আগে নচিকেতা যখন তার গানে পাগল বাউন্ডুলে বা বেকার হতে চেয়েছিল — সেটা আসলে পুঁজি সমাজ এবং তার বাজারকেই অস্বীকার করতে চাওয়া। আমরা আসছি সেই কথায়।

মার্ক্স বস্তুবাদী, তিনি তাই তার যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন আমাদের সম্মুখবর্তী বস্তুজগত থেকে, পুঁজি সমাজের ক্ষেত্রে সেটা একটা বাজার। যা কিছু পাওয়া যায় তা বাজারে, যা বাজারে নেই তা আসলে পাওয়া যায় না। ধরুন একজন কবি — তিনি একের পর এক মাস্টারপিস লিখে চলেছেন, কিন্তু তার কবিতা, হয়ত মাস্টারপিস বলেই, ঠিক বাজারযোগ্য নয়। কী দাঁড়াবে তার অবস্থা? তাকে কর্মহীন বেকার বলেই মনে করবে তার চারপাশ। তার চেয়ে তিন বছরের ছোটো ভাইয়ের বিয়ের সম্মন্ধ দেখা হবে, এবং সেই বিয়ের আসরেও তাকে নিয়ে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে, সে স্বচ্ছ হয়ে যাবে, তাকে ফুঁড়ে লোকের দৃষ্টি বেরিয়ে যাবে, তাকে কারোর চোখেই পড়বে না। এটা পুঁজির সংস্কৃতির অন্তর্গত। তার কাছে মানুষের একমাত্র প্রয়োজন মজুরি-শ্রমিকের আকারে, অন্য সমস্ত রকম মানুষ তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। ভ্যান গখ মৃত্যুর আগে যেমন ছিলেন, বিস্মৃত পরিত্যক্ত, ঠিক তেমনই থাকতেন যদি না, তাকে বাজার গ্রহণ করতো। যদি না তার আঁকা ছবি গুলো তাদের মৃত ঠান্ডা ক্যানভাস ছেড়ে তাদের পণ্যতায় জীবন্ত হয়ে উঠত। পরে, ফুকোর কথা বলতে গিয়ে আমরা এই কথায় আবার আসব।

মার্ক্স পণ্যের দুটো মাত্রাকে খুঁজে দিলেন। একটা ব্যবহার মূল্য, ইউজ ভ্যালু। অন্যটা বিনিময় মূল্য, এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। মার্ক্স পণ্য থেকে শুরু করলেন কারণ আমাদের গোটা সমাজ অর্থনীতিটাই পণ্যের মধ্যে নিহিত। আমাদের সম্পদ

সাফল্য স্বাচ্ছন্দ্য সবই এক এক প্রকারের পণ্য সমাহার। আমি যেদিন বাসন রাখার তাক আর ফ্রিজ কিনে উঠতে পারব আমার বৌ আমাকে আর স্বামী হিশেবে অসাধ অসফলতার গর্তে ফেলে রাখবে না। এমনকী প্রেম অপত্য পিতামাতার প্রতি যত্নও এক এক ধরনের পণ্য সমাহার — ধরুন, স্বর্ণহৃদয় পেন্ডান্ট, চকোলেট বা চ্যবণপ্রাশ। রেগুলার টিভি দেখবেন, আপনি কোন পরিস্থিতিতে কাকে কী করতে হয় বেশ শিখে যাবেন। এই পুঁজি সমাজে মানুষ আর মানুষের ভিতর সম্পর্কও পণ্যের সাথে পণ্যের সম্পর্ক বলে বোধ হয়, এটাকে মার্ক্স ডেকেছিলেন পণ্য-প্রতিমা বা কোমোডিটি-ফেটিশ বলে। পণ্যকে বুঝতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স এই ইউজ ভ্যালু এবং এক্সচেঞ্জ ভ্যালু বর্গ দুটোকে ব্যবহার করলেন।

ইউজ ভ্যালু হল একটি পণ্যের ভৌত বাস্তবতা। একটা আম পচে গেলে আর খাওয়া যায় না, জুতো ছিঁড়ে গেলে আর পরা যায় না। ইউজ ভ্যালু হিশেবে প্রতিটি পণ্যই অন্য প্রতিটি পণ্যের থেকে আলাদা। সেই জন্যেই তাদের ভিতর বাজারে বিনিময় ঘটে। চকের সাথে চকের, কিম্বা আইসক্রিমের সাথে আইসক্রিমের বিনিময় ঘটে না। ঘটে চকের সাথে আইসক্রিমের। চক যে বানায় সে বাজারে চক বিক্রি করে পয়সা পায়, সেই পয়সা দিয়ে তার বায়নাবাজ বাচ্চাকে আইসক্রিম কিনে দেয়। চক থেকে টাকা, টাকা থেকে আইসক্রিম — এই পথে চক এবং আইসক্রিমের বিনিময় ঘটে। ইউজ ভ্যালুরা যেমন আলাদা, তেমনি আলাদা ইউজ ভ্যালু প্রস্তুতকারক শ্রমিকরাও। ডাক্তার কারা? যারা ডাক্তারি শ্রমশক্তি উৎপাদন করে, বিক্রি করে। (দেখুন, সে কিন্তু ডাক্তারি শ্রম না, বিক্রি করছে ডাক্তারি শ্রমশক্তি। যে হাসপাতালে সে কাজ করছে সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার আট বা দশ ঘন্টার ডাক্তারি শ্রম দেওয়ার ক্ষমতাটাকে কিনে নিচ্ছে। এটা আলাদা করে বললাম কারণ, পরে, ফুকোর প্রসঙ্গে এটায় আমরা ফিরে আসব।) শিক্ষক বিক্রি করে শিক্ষা নামক পণ্য উৎপাদনের শ্রমশক্তি। শিক্ষক বা ডাক্তার বা চক-উৎপাদক হিশেবে, ইউজ ভ্যালু উৎপাদক হিশেবে, তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা, কিন্তু অন্য আর একটা জায়গায় তারা সমান।

তারা সমান এক্সচেঞ্জ ভ্যালু উৎপাদক হিশেবে। তারা সবাই মুদ্রা-উৎপাদক। ডাক্তার তার শ্রম বিক্রি করে টাকা পায়, আবার চকশ্রমিকও তার শ্রম বিক্রি করে টাকা পায়। সমস্ত শ্রমিকই সমান হয় পণ্যের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু বা বিনিময় মূল্যের নিরিখে। যা পুঁজিবাদী সমাজে আমাদের সমতার ভিত্তি। বা, শুধু পুঁজিবাদী কেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সমতার একটা বস্তুগত ভিত্তি, অবজেকটিভ বেসিস খুঁজে পেলাম আমরা। ভাবুন তো, কেন আমরা পরস্পরের সমান? কেন? কী কারণে? পৃথিবীতে তো কোনো দুটো জিনিষই পরস্পরের সমান, মানে নিখুঁত ভাবে সমান না। কে যেন একটা লিখেছিল না, $১ + ১ = ২ \times ১ \neq ২$, কারণ, দুটো এক তো সমান না যে তাদের আমি যোগ করে দুই লিখতে পারব, তারা আসলে দুই গুণ এক। দুটো এক-ই যদি পরস্পরের সমান না হয় আমরা কী করে এ অন্যের সমান হই? কেউ বলতে পারে, আমরা আসলে ঈশ্বরের চোখে সমান। বেশ, কিন্তু যাদের কোনো ভগবান নেই, যারা ভগবান মানে না, তারা কী করে সমান হবে?

আসলে আমি আপনি ঋত্বিক (ঘটক বা রোশন দুইই) জ্যোতি বসু মমতা নিকোলাস কেজ — আমরা সবাই সমান কারণ বাজার আমাদের সমান করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মাল বেচি পয়সা পাই, শ্রমশক্তি বেচি পয়সা পাই। পয়সা হল সেই সর্বত্রগামী সর্বভূতবিরাজী সত্তা যা আমাদের সমান করে। আমার একটা ক্লাসের দাম মোটামুটি শদেড়েক টাকা যা দিয়ে মোটামুটি পঞ্চাশ ঠোঙা ঝালমুড়ি (এখন আর দু-টাকা করে কেউ বেচতেই চায় না) পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর নিরিখে একটা ইকনমিক্স ক্লাস আর পঞ্চাশ ঠোঙা ঝালমুড়ি সমান হল। একজন ঝালমুড়িওলার আর একজন অর্থনীতিওলার শ্রম দেওয়ার বা অন্যান্য ক্ষমতার সাপেক্ষে তাদের মোট উপার্জিত পয়সার পরিমাণের পার্থক্য হতে পারে, বাট পয়সা ইজ পয়সা, তা সব জায়গায় একই। এই মাত্র পাঁচ টাকার নোট দেওয়ার পরে ঝালমুড়িওলা আমায় যে দুটো এক টাকার কয়েন ফেরত দিল তার একটা এসেছে সোনাগাছি থেকে (বিডন রো আমাদের কলেজের খুব কাছেই), শয্যাসঙ্গ বিক্রি করার, অন্যটা সামনের দাঁতের ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে, সরকারী কর্মচারী রোগী ডাক্তারখানায় দিয়ে গেছিল। কত হাত বদলাবে বদলাচ্ছে বদলাল ওই মুদ্রারা, হাত থেকে হাতে, ঠাকুরের পায়ে, ভিখারির পাত্রে, শুধুই হাত বদলাচ্ছে আর তার সঞ্চারপথে, লোকাস-এ, প্রতিটি লোকের হাতকে অন্য প্রতিটি লোকের হাতের সমান করে দিয়ে যাচ্ছে। এটাই বাজারভিত্তিক পুঁজিসমাজের বস্তুভিত্তিক বাস্তব সাম্য। এই সাম্য এবং তার উপকথার গল্পে পরে আবার আসব আমরা।

পণ্যের মধ্যেই কিন্তু মার্ক্সের ডায়ালেকটিক্সটা আছে। হেগেলের পজিটিভ আর নেগেটিভ-এর ডায়ালেক্টিক্স এর মত এখানে ডায়ালেক্টিক্সটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিটের, বিমূর্ত আর মূর্তের। ইউজ ভ্যালু হিশেবে পণ্য মূর্ত, শারীরিক, ভৌত।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিশেবে পণ্য বিমূর্ত, এক, সমান। ধরুন গিরীশ নকুড়ের ক্ষীরের নাড়ু আর ক্যামেরনের টাইটানিক — এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিশেবে এদের দুটোকে একটা সমীকরণে আনা যায়। টাইটানিক-এর ভিসিডি সিম্ফনি থেকে বিক্রি হয়েছে পাঁচশো টাকায়, আর ক্ষীরের নাড়ু শেষ যখন কিনেছি তখন বোধহয় চারটাকা করে। তার মানে এটা লেখাই যায়

টাইটানিক = (১২৫) (ক্ষীরের নাড়ু)

কিন্তু একশো পঁচিশ কেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার নাড়ু আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি আপনি এদের ভিতর কোনো ভৌত সম্পর্ক বার করুন তো, একজায়গাতেও দেখান তো অভিজাত কেট বা শ্রমিক-শিল্পী লিওনার্ডো, বা কেটের ওই ভিলেন বাগদত্ত বা তার খচ্চর বাটলার — একজনও একবারও ক্ষীরের নাড়ু খাচ্ছে?

ইউজ ভ্যালু আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিশেবে এই দুই মাত্রার দুটো বৈপরীত্য মিলে গিয়েছে গোটা পণ্যব্যবস্থাটার মধ্যে, তাই এই ব্যবস্থাটাকে মার্ক্স বলবেন ডায়ালেক্টিকাল। এই ডায়ালেক্টিক্সটাই স্তরে স্তরে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। ঠিক হেগেলের মডেলের মতই। শুধু হেগেল তার স্টার্টিং পয়েন্ট আর তার আরব্ধ এই দুটো নিরিখেই ভাববাদী, মার্ক্স যা নন, আমরা আগেই বলেছি। মার্ক্স-এর ডায়ালেক্টিক্স-এর আর একটা জায়গা — শ্রেণী, সেটা নিয়ে তো আমরা আগেই কথা বলেছি।

শুধু আর একটা কথা বলা বাকি আছে এখানে, সেটা হল বিমূর্ত শ্রম বা অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার।

পণ্যরা তো ইউজ ভ্যালু হিশেবে, তাদের ভৌত মূর্ত রকমে। কিন্তু আবার এক, এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিশেবে, সেখানে তাদের প্রত্যেককেই বাজার থেকে টাকা দিয়ে কেনা যায়। তাদের ক্রয়যোগ্যতায় তারা এক। কিন্তু, এই একের ভিতরে তারা আবার পরস্পর আলাদা, কারণ তারা প্রত্যেকেই ক্রয়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্রয় করতে আলাদা আলাদা পরিমাণ টাকা লাগে, তাদের দাম আলাদা। দেখুন, পণ্যদের মধ্যে প্রথম যে পার্থক্য, যে মূর্ত পার্থক্য, তাকে কিন্তু এখন ভুলে গেছি আমরা। চক আইসক্রিম থেকে, আইসক্রিম টেবিলের থেকে আলাদা কিনা তা নিয়ে আর ভাবছি না, তারা সবাই এখন এক একটা টাকার অঙ্ক, অর্থাৎ, বিমূর্ত। কিন্তু, এই বিমূর্ত রকমেও তারা আবার পরস্পরের থেকে আলাদা, কারণ, তারা এক এক জন এক একটা আলাদা আলাদা টাকার অঙ্ক। টাকার অঙ্কের মাপে বড় ছোট। চকের থেকে আইসক্রিম বড়, আইসক্রিমের চেয়ে টেবিল বড়। অর্থাৎ, ক্রয়যোগ্যতা বলে যদি একটা মাপকাঠি সৃষ্টি করি, তার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিহিত আছে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে ক্রয়যোগ্যতা নামের এই মাপকাঠির ভিন্নতা? কেন চকের চেয়ে আইসক্রিমের দাম বেশি। এখানে মার্ক্সবাদের উত্তর হল — অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার বা বিমূর্ত শ্রম। বিমূর্ত শ্রম নামের এই বিমূর্ত সত্তা চকের চেয়ে বেশি পরিমাণে হাজির আছে আইসক্রিমে, তার চেয়েও বেশি পরিমাণে টেবিলে। এই বিমূর্ত শ্রম জিনিষটা ঠিক কী? আমরা যে শ্রম গুলো দিই তা তো প্রতিটাই মূর্ত এবং ভৌত। শারীরিক, মানসিক শক্তির ব্যয়। কেউ টেবিল বানাই, কেউ চক, কেউ আইসক্রিম। এই চক টেবিল আইসক্রিম অতিক্রম করে বাজার যখন তাদের বাজারযোগ্যতা দেখছে, অর্থাৎ, ক্রয়যোগ্যতা এবং বিক্রয়যোগ্যতা, তখন কিন্তু আমাদের শ্রমিক হিশেবে মূর্ত জায়গাটা আর নেই, আমরা শ্রমিক হিশেবেও বিমূর্ত হয়ে গেছি। আমরা কেউ এক টাকার পণ্য বানাই, কেউ দশ টাকার, কেউ হাজার টাকার। আমরা সবাই বিক্রয়যোগ্যতা উৎপাদন করি। কেউ আর চিকিৎসক, বা চকশ্রমিক বা শিল্পী নই, আমরা কেউ চিকিৎসা নামের বিক্রয়যোগ্যতা বানাই, কেউ চক নামের বিক্রয়যোগ্যতা, আর কেউ শিল্প নামের। তাই বিক্রয়যোগ্যতা না হওয়া অব্দি সেটা উৎপাদন বলেই গণ্য হয় না। বিমূর্ত শ্রম মানে এই বিক্রয়যোগ্যতা-উৎপাদনকারী শ্রম। দাম বেশি মানে এই বিমূর্ত শ্রম বা অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার সেখানে বেশি আছে অন্য আর একটা কম দামের পণ্যের চেয়ে।

(এখানে একটা ছোট দার্শনিক জটিলতা আছে, সেটার একটু উল্লেখ না করেও পারছি না। অনেকে এই বিমূর্ত শ্রমকে ঘড়ির সময় দিয়ে মাপতে চেয়েছেন, একটি পণ্যে কতটা বিমূর্ত শ্রম নিহিত রয়েছে সেটা বোঝার জন্যে। কিন্তু এটা ঠিক সেই রকমেরই আর একটা যান্ত্রিকতা, যেমন আমরা আলোচনা করেছি ব্যক্তি এবং শ্রেণী নিয়ে। ঠিক শ্রেণী যেমন তেমনি বিমূর্ত শ্রমও একটা দার্শনিক বর্গ। ধরুন ওই গিরীশ নকুড়ের নাড়ু ১২৫টা, আর টাইটানিকের ভিসিডি একটা। এই দুটো সমাহার পরস্পর সমান। তার মানে কিছু একটা প্রতিটি নাড়ুর মধ্যে আছে যার ১২৫ গুণ হল সেই জিনিষটার সেই পরিমাণ যা একটি ভিসিডির মধ্যে আছে। এই কিছু একটাই হল সেই বিমূর্ত শ্রম, যার একটা কোনো পরিমাণ আছে একটা ভিসিডিতে এবং তার ১/১২৫ আছে একটি নাড়ুতে। অর্থাৎ, আমাদের যুক্তির গতিপথটা খেয়াল করুন, আমরা বাজারে পণ্যের মধ্যে এই সমতা পাচ্ছি, তার কারণ খুঁজছি, সেইখান থেকে আমাদের যুক্তিনির্মাণের বর্গ হিশেবে

বিমূর্ত শ্রমে পৌঁছচ্ছি। বিমূর্ত শ্রম কোনো এম্পিরিকাল বর্গ নয়, বাস্তবতালব্ধ বর্গ নয়, একটা দার্শনিক বর্গ। বাস্তবতায় বিমূর্ত শ্রম পেলাম সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের বিনিময় সাম্যে পৌঁছলাম এরকমটা আদৌ নয়। এই প্যারাগ্রাফটা যারা খুব একটা বুঝতে পারলেন না, তাদের বলছি, মাথা ঘামাবেন না, এটা খুব একটা জরুরি জায়গা না, মার্ক্সবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা ভুলকে একটু চিহ্নিত করে দেওয়া মাত্র।)

১৩।। ইকনমিক্সের সঙ্গে দুটো প্রতিতুলনা

এবার একটু ছোট করে বাজার অর্থনীতি। যারা চালু ইকনমিক্সে একটুও ইন্টারেস্টেড না, তারা এটুকু বাদ দিয়ে আবার পরের সেকশন থেকে পড়তে পারেন। দুটো ছোট অতিসরলীকৃত উদাহরণ, যা থেকে চালু বাজার অর্থনীতির সঙ্গে মার্ক্সীয় অর্থনীতির প্রভেদের মাইল্ড একটা আন্দাজ হতে পারে। অনেকসময়ই দেখেছি যাদের বোঝাচ্ছি তাদের ভিতর এই প্রশ্নগুলো আসতে।

আমাদের চারপাশের চালু ভাষায় অর্থনীতি বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা আসলে বাজার অর্থনীতি। বাজারের বাইরে যা তা সেই অর্থনীতিরও বাইরে। ছেলেদের যে উদাহরণটা দিই সেটা রুটি তরকারির। বাড়ি ফেরার পর তোর মা তোকে যে রুটি-তরকারিটা খেতে দেন, সেটা এই অর্থনীতির বাইরে, তোর বইতে যে অর্থনীতি লেখা আছে তার বাইরে, কিন্তু ওই একই খাবার যদি তুই বাজারের দোকান থেকে কিনে খাস, সেন্ট্রাল অ্যাভেনুর গায়ে রুটি তরকারির দোকান থেকে, সেটা কিন্তু এই ইকনমিক্সের আওতায় পড়বে। তাকে নিয়ে তোকে পরীক্ষার খাতার উত্তর লিখতে হবে।

এবার, বাজার মানে কী? ক্রয় এবং বিক্রয়ের সম্পর্ক। তাই, একটা ভিখিরি খেতে না পেয়ে হেদিয়ে মরে গেলেও এই অর্থনীতি অনুযায়ী তার কোনো চাহিদা থাকবে না, কারণ, তার কোনো পয়সা নেই, অর্থাৎ, ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। বাজারে সে কোনো ক্রেতা নয়। এই বাজার অর্থনীতির সঙ্গে মার্ক্সীয় অর্থনীতির যোজন যোজন দূরত্ব। যেমন আগেই বলেছি আমরা, মার্ক্সবাদ একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থিয়োরি, একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী, তাই সমাজ বাস্তবতার প্রতিটি খুঁটিনাটিকেই নিজের একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখে সে। চাহিদা যোগান উৎপাদন ভোগ ইত্যাদি খুব প্রাথমিক ধারণাগুলোও সেখানে আমূল বদলে যায়। এটা খুব স্পষ্ট করা যায় মার্ক্স এর একটা যুক্তিশৃঙ্খল দিয়ে। যদ্দূর মনে পড়ছে এটা গ্রুন্ড্রিসেই ছিল, এবং ঠিক এই আকারেই ছিল কিনা সেটাও স্পষ্ট মনে নেই। আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াগুলো আসলে কী সেটা বোঝাতে ব্যবহার করা মার্ক্স-এর যুক্তিশৃঙ্খলটা এরকম —

উৎপাদন $\Rightarrow$ (পরিবহন) $\Rightarrow$ ভোগ

আমাদের যে কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকে ভাবুন, উৎপাদন থেকে শুরু হয়ে ভোগে গিয়ে শেষ হয় যে গতিপথ তারই কোনো না কোনো বিন্দুতে রয়েছে আপনার বা আমার বা যে কারোর যে কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়া। হয় আমরা কিছু বিক্রি করছি না হয় আমরা কিনছি। বিক্রয় বা ক্রয়। হয় উৎপাদন নয় পরিবহন নয় ভোগ। ছাত্রদের এই শৃঙ্খলটা বোঝানোর সময়ে আমি অনেকসময় নিচে একটা ডটেড লাইন দিয়ে, শূন্যস্থান পুরন করার সময় যেমন থাকে, ভোগ আর উৎপাদনটা যোগ করি, তার তীর চিহ্নটা থাকে উৎপাদনের দিকে। ধরুন অনেকটা এরকম —

উৎপাদন ... ($\Leftarrow$) ... ভোগ

এখানে তীর চিহ্নটা ব্রাকেটে এটা বোঝানোর জন্যে যে এটা বাস্তব নয়। আগের শৃঙ্খলের উৎপাদন বা ভোগ ছিল বাস্তব। আর এই গতিটা ঘটে আমাদের চিন্তায়, আমাদের বোধে। যখনি আমরা ভোগ করলাম অমনি আমাদের মধ্যে পুর্ননির্মিত হল আমাদের নতুন প্রয়োজনবোধ, নতুন চাহিদা। যোগান যেই চাহিদার বেদিতে নিজেকে আত্মবিসর্জন দিল, তখনি গড়ে উঠল নতুন চাহিদা। আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়ার কালচক্র ঘুরে চলল অন্তহীন।

এই কালচক্রর দুটো মূল বিন্দু — উৎপাদন এবং ভোগ — এদেরও আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করে চালু অর্থনীতি আর মার্ক্সবাদ। সেই ফারাকের দু একটা জায়গা উল্লেখ করা যাক। ধরুন ভোগ। চালু ইকনমিক্সে ভোগ বলতে ভাবা হয় ইউটিলিটি মানে উপযোগিতা বা তৃপ্তি পাওয়ার উপায়। এই ইউটিলিটিকে দেখেছি অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন ইউজ ভ্যালুর সঙ্গে। আসলে টেক্সট বই লিখিয়েদের অশিক্ষা তাদের মধ্যে চারিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। ইউটিলিটি আর ইউজ ভ্যালুর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এইখানে যে ইউটিলিটির একটা মূল সূত্র, 'ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা' (ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি) ইউজ ভ্যালুর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় না।

প্রান্তিক মানে এককথায়, "শেষ একক থেকে"। আপনি ভোগ করছেন। ধরুন একটা বিস্কুট, দুটো বিস্কুট, তিনটে ... ইত্যাদি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ভাবুন। কী ঘটবে আপনার ভোগ এবং পরিতৃপ্তিতে? নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আপনি প্রথম বিস্কুটে যতটা পরিতৃপ্তি পাবেন, দ্বিতীয়টায় পাবেন তার থেকে কম, তৃতীয়টায় আরো কম, ইত্যাদি। এই 'ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা'-র সূত্র ঠিক এই কথাই বলে, দ্বিতীয় একক ভোগের, এখানে দ্বিতীয় বিস্কুটের প্রান্তিক উপযোগিতা প্রথমটার থেকে কম হবে, তৃতীয়টার হবে দ্বিতীয়টার থেকে কম ... ইত্যাদি।

লক্ষ্য করুন, ভোগ এবং পরিতৃপ্তির সম্পর্কটা দাঁড়াল দুটো স্তরে। প্রথম স্তরে প্রান্তিক উপযোগিতা। ভোগ যত বাড়ে তত প্রান্তিক উপযোগিতা বা মার্জিনাল ইউটিলিটি কমে যেতে থাকে। কিন্তু, মোটের উপর, একক থেকে এককে মোট উপযোগিতা বা টোটাল ইউটিলিটি বেড়েই চলেছে। দ্বিতীয় বিস্কুটের নিজের, মানে দ্বিতীয় একক ভোগের, প্রান্তিক উপযোগিতা প্রথম বিস্কুটের থেকে কম। কিন্তু দ্বিতীয় বিস্কুট তো আপনি খেতেই পারবেন না প্রথম বিস্কুট না খেয়ে। তাই দ্বিতীয় বিস্কুটের প্রান্তিক উপযোগিতার কথা বলা মানেই মোট উপযোগিতায়, ইতিমধ্যেই, যোগ হয়ে বসে আছে প্রথম বিস্কুটের উপযোগিতাটুকু। এখানে যে রসিকতাটা করলে ছেলেরা বেশ মজা পায় সেটা লাগানো যাক। সেরকম যদি হত, তাহলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতাম, ভাই প্রথম পাঁচ টাকার স্টেপটা আপনি প্লিজ চালিয়ে নিন, আমি দ্বিতীয় মানে পঞ্চাশ পয়সার স্টেপ থেকে থেকে আপনার গাড়িতে উঠব। তাই মোট উপযোগিতা বাড়ার ভিতর দিয়েই একমাত্র প্রান্তিক উপযোগিতা কমতে পারে। নিওক্লাসিকাল চাহিদাতত্ত্বে এই উপাত্তটার গুরুত্ব এত বেশি যে তা আর বাড়িয়ে বলা সম্ভব না। কোনো স্বাভাবিক পণ্যই এর আওতার বাইরে নয়। এর উপর দাঁড়িয়ে আছে চালু অর্থনীতির ভোগতত্ত্ব। যে অর্থনীতিকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে মোট পুঁজিব্যবস্থার মতাদর্শগত কাঠামো।

এর বিপরীতে ইউজ ভ্যালুকে ভাবুন। যেহেতু আপনার একক ব্যক্তি ভোগের সঙ্গে ইউজ ভ্যালুর কোনো সম্পর্ক নেই, তাই প্রান্তিক উপযোগিতার এই তত্ত্ব ইউজ ভ্যালুর ক্ষেত্রে খাটবে না। আপনি বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি দ্রব্য বা সেবাটা নিয়ে কী করলেন, খেলেন না মাথায় দিলেন, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না মার্ক্সবাদী অর্থনীতি। প্রশ্নটা সেখানে সেই দ্রব্য বা সেবাটার সম্ভাবনা নিয়ে, তাকে নিয়ে কী করা যায় বা কী করা সম্ভব। আপনি বিষের বদলে বিষকূট মানে বিস্কুট খেয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করার আগে ও পরে ওই বিস্কুটের মধ্যে ভোগের সম্ভাবনা একই, নৈর্ব্যক্তিক রকমের এক।

এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক অনেক দার্শনিক জটিলতা আছে, সেগুলোর কথায় আর যাচ্ছি না। চারপাশে নিরন্তর মার্ক্সীয় তত্ত্ব নিয়ে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চলে, যার মূল দায় নেতা ও তাত্ত্বিকদের, যেখানে যেমন খুশি মার্ক্সীয় শব্দ ব্যবহার করে আসলে পুরোটাকেই গুলিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতিবাদে এই উদাহরণটা। তার চেয়ে প্লিজ আপনারা সাধারণ বুদ্ধি কমন সেন্স দিয়ে কথা বলুন, লিখুন। শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে বিপ্রদাস যেমন বন্দনাকে (বন্দনাই তো?) বকে দিয়েছিল, কোনো শাস্ত্রের দোহাই দেওয়ার আগে সেই শাস্ত্রটা জানো। এই শব্দপাতে (নাকি শব্দত্যাগ বলে ব্যাপারটা বেটার বোঝানো যায়?) আর একটা কেলোও ঘটে। আমাদের চারপাশে যে পুঁজির মূল্যবোধ তার সঙ্গে মার্ক্সীয় মূল্যবোধের পার্থক্যগুলোও কেমন এলিয়ে যায়। আমি এখানে কোনো বিশুদ্ধতাবাদী এলিটিজম-এর দোহাই পাড়ছি না। বরং গরীব এবং নিরক্ষর বহুল দেশে বড় বড় শব্দপ্রপাতের, অপপ্রয়োগের, কোলোনিয়াল রেলাবাজির বিপরীতে বলছি।

আর একটা খুব ক্রুশিয়াল পার্থক্যের উদাহরণ দেওয়া যাক। উৎপাদন। উৎপাদনের পরে আসে বণ্টন। মানে মাল বানিয়ে বাজারে বেচার পরে যে অর্থটা উঠল সেই রেভিনিউটা কী ভাবে ভাগ হবে। সেখানে চালু ইকনমিক্সে বন্টনের আঙ্কিক সূত্র আছে। এখানে আসে প্রান্তিক উৎপাদন বা মার্জিনাল প্রোডাক্টের প্রসঙ্গ। ধরুন একটা উৎপাদন চলছে, সেখানে শ্রম এবং যন্ত্র মিলে তাদের মাল বানিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় অন্য কোনো বদল না ঘটিয়ে শুধুমাত্র নতুন এক একক শ্রম যোগ করা হলে তাতে উৎপাদন যে পরিমাণে বেড়ে যায় সেটাকেই আমরা বলতে পারি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বা মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার। চালু নিওক্লাসিকাল ইকনমিক্সের বণ্টনের সূত্র আমাদের জানায় যে শ্রম তার প্রাপ্য পায় যে মজুরির নিরিখে সেটা স্থির হয় শ্রমের মার্জিনাল প্রোডাক্ট দিয়ে। আর উৎপাদনের যে অন্য উপাদান — পুঁজি বা ক্যাপিটাল, সেও তার প্রাপ্য মানে সুদ পায় পুঁজির মার্জিনাল প্রোডাক্টের হারে।

বণ্টনের এই লজিকটা এক বার ভাবুন, শ্রম বা পুঁজি দুজনেই দেখছে যে যতটুকু উৎপাদন তারা বাড়িয়ে তুলতে পারছে ঠিক সেই হারেই তারা তাদের প্রাপ্য পাচ্ছে। তাহলে? ন্যায় তো প্রতিষ্ঠিত, কোলাহলটা কী নিয়ে? এই যে সব শ্রেণীসংগ্রাম-টংগ্রাম? গন্ডগোলটা অন্য জায়গায়। পুঁজি কী? সচরাচর আমরা যে দুটো অর্থে পুঁজিকে ব্যবহার করি,

মানে একদিকে টাকাপয়সা বা ফিনান্স আর অন্যদিকে উৎপাদনে লাগে যেসব যন্ত্রপাতিটাতি — সেই দুটো অর্থেই ভাবুন — শ্রম তো আমরা দিই আমাদের পেশি ও স্নায়ুর শক্তি খরচ করে, কিন্তু পুঁজিটা আসে কোথা থেকে?

প্রথমে পুঁজি মানে যন্ত্র ভাবুন। আজকের যে যন্ত্রপাতি সেগুলো এল কী ভাবে? আগের কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে কাঁচামাল ব্যবহার করে মানুষের শ্রম তাকে বানিয়েছিল। তাহলে এই যন্ত্ররা এল আগের সেই যন্ত্র এবং শ্রম — এই দুটোর সংযোগে। কিন্তু আগেকার সেই যন্ত্ররা এল কোথা থেকে? অবভিয়াসলি তারও আগেকার যন্ত্রপাতি এবং মানব শ্রম। এই ভাবে পিছিয়ে যেতে যেতে আমরা পৌঁছে যাব মানব সভ্যতার একদম প্রারম্ভ বিন্দুতে। যেখানে আমরা দেখব আর কোনো যন্ত্র নেই, শুধু মানুষের শ্রম এবং প্রকৃতি।

অর্থাৎ, আজকে আমরা যে সব যন্ত্রপাতি দেখছি আমাদের সামনে, তাদের মধ্যেই রয়েছে এই অযুত বছরের গোটা মানবসভ্যতার ইতিহাস। আজকের সুপার-কম্পিউটারের সার্কিটে একদম পরিষ্কার কার্যকারণ সূত্রে খচিত আছে পাথরের গায়ে পাথর ঠুকে আদি মানুষের বানানো প্রথম ফ্লিন্টটার, পাথরের ফলাটার ধারালো চিহ্ন। ভাষা ছাড়া যন্ত্রের মত এমন সুস্পষ্ট ছেদহীন ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার আর কোথাও নেই। ভেবে দেখুন, যদি হঠাৎ করে কোনো কারণে, ধরুন উল্কাপাতে, গোটা মানবসভ্যতা ধবংস হয়ে যেত, তার সমস্ত যন্ত্র আর সমস্ত ভাষা সহ, আবার পৃথিবীতে নতুন মানুষ পয়দা হত, আবার তাকে গোড়া থেকে কেচে গণ্ডূষ করতে হত। কোনো স্টেপজাম্প নেই, কোনো এড়িয়ে যাওয়া নেই, মাঝের একটা স্টেপও যদি বাদ দেন আপনি আর পৌঁছতেই পারবেন না আজকের সুপার কম্পিউটারে।

ঠিক আমাদের শরীরের মত, আমার মা আছে, তারও মা ছিল, তারও, পিছিয়ে গিয়ে গিয়ে, একসময় আর মানুষ নেই, বনমানুষ, তারও অনেক আগে অ্যামিবা। ওই বনমানুষী বা অ্যামিবাও ঠিক একইরকম আমার বংশে আমার পূর্বজ, যেমন আমার মা। আজকের আমার ভাষার সঙ্গে লিপির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত পৃথিবীর আদিমতম উচ্চারণ এবং লিপি, একটানা নিরবচ্ছিন্ন এই উত্তরাধিকারে কোনো ছেদ নেই। আজকের যন্ত্রগুলোও তেমনি আর কিছুই নয় — এই গোটা মানব-ইতিহাস জুড়ে পুঞ্জীভূত মানবশ্রম। যদি আপনি পুঁজি মানে যন্ত্র না ধরে সম্পদ বা ফিনান্স ধরেন তাহলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় একই, আজকের ফিনান্সের মধ্যেই নিহিত আছে সেই আদিমতম যুগ থেকে শুরু করে আজ অব্দি প্রতিটি অর্থনৈতিক বিনিময়ের ইতিহাস।

তাহলে, পুঁজি কার? কমলাকান্ত বলেছিল, দুধ যে খায় তার। কিন্তু দুধ যে খায় না, সেই বাছুরের নয়? পুঁজির মালিকানা যদি কারো থাকার কথা, ঠিক ভাষার মতই, সেটা এই গোটা মানবসমাজের, কখনোই পুঁজিপতির নয়। তাহলে পুঁজির ওই প্রান্তিক উৎপাদন পুঁজি-মালিক পাবে কেন? এবার ধরুন, আপনি বললেন, যে ওই সব ইতিহাস টিতিহাস ছেড়ে দাও কাকা, পরিষ্কার দেখো ভাই এটা দক্ষতার যুগ, সবদিকে উড়ছে দক্ষতার জয়ধবজা, এ হল ওই পুঁজিমালিকের দক্ষতার ফসল, সে দক্ষতাকে তুমি শালা দগ্ধেন্দ্রিয় যে নামেই ডাকো না কেন। ঠিক হ্যায়, দক্ষতার জয়ধবজার আমরাও জয় দিলাম, ধরে নিলাম, যে দক্ষতাই পাবে পুঁজির প্রাপ্য। এবার বলুন তো, পুঁজির মালিক মারা গেলে তার ছেলে কেন পাবে সেই সম্পদ? কেন সেই কারখানার সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকটি পাবে না? দক্ষতার জয়ধবজার এই ধবজভঙ্গের মানে কী? দক্ষতা-সংক্রান্ত পুরো কার্বাইডে পাকানো লজিকটা এখানে এসে পুরো ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে।

আমাদের সামনে যখন বলা হয়, ভাই এটা দক্ষতার প্রশ্ন, বীমা বিজাতীয় হোক, ব্যাংক হোক, তখন আমাদের বলা উচিত, খোকা, ওই দক্ষতার গল্প তুমি অন্য জাগায় গিয়ে বলো, যেখানে গোটা দেশের জনসংখ্যা, ভারতবর্ষে দুপুরে যারা হাগতে যায়, মানে যাদের ডাই-হার্ড কোষ্টকাঠিন্য বা একদম ছ্যার‍্যার‍্যার‍্যা চলছে রেকারিং ডেসিমালের মত, তাদের চেয়েও কম। যেখানে মানুষ অন্তত রোটি-কাপড়া-মকান টুকু পায় সেখানে গিয়ে বলো। আমরা সেই সান-লাইফ দিয়ে কী করব, সে কি মালদার প্রত্যন্ত গ্রাম চাঁচলে গিয়ে পরিবারের একমাত্র সম্পদ একমেবাদ্বিতীয়ম রাম-পাঁঠার বীমা করাবে, সেইসব নোটের বিনিময়ে যাদের গায়ে ছাতলা পড়ে গেছে বছরের পর বছর মাটির নিচে পুতে রাখায়, কোনো মেটাফরে না, একদম বাস্তবে মাটিতে পুঁতে রাখা, মহাজন ইত্যাদিদের হাত থেকে বাঁচানোর আর কোনো নিরাপদতর পন্থা তার জানা নেই বলে। পুরুলিয়ার ঝাড়বাগদায় বাসের মেঝেতে বসা যে বৃদ্ধাটিকে কন্ডাক্টর এসে হাঁটু দিয়ে ঠেলে ভাড়ার পয়সা চেয়েছিল, কোনো অসভ্যতায় নয়, ওটাই প্রথা, যার নাতির ঘায়ে মুখ বাড়ানো পোকা আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে এনি-টাইম-ব্যাঙ্কিং দিয়ে কী করবে? তাই উন্নতি আধুনিকীকরণ দক্ষতা ওইসব রেখে তোমার বেড়াল বার করো তোমার ঝুলি থেকে। আমরা জেনে ধন্য হই আসলে সেই কোলোনি আজো চলিতেছে, তার

কোনো ছেদ পড়েনি। মানবসভ্যতার অগ্রগতি ফতি রেখে একটু ঝেড়ে কাশো কাকা, কারা জানি বলেছিল না, অগ্রগতি বলে কিছু হয়না, মানবসভ্যতা এগিয়েছে বীভৎসতা থেকে বীভৎসতরতায়?

১৪।। মুনাফা এবং সারপ্লাস ভ্যালু

পণ্যব্যবস্থা কী ভাবে আমাদের সামাজিক সাম্য নির্মাণ করে সেই কথা আমরা আগেই বলেছি। এবার সেই পুঁজিবাদী সাম্যের পিছনে অসাম্যটাকে একটু ভাবা যাক। তার জন্যে প্রথমে আমরা পুঁজিবাদী মুনাফাকে বুঝি আসুন। একটা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কী কী ঢোকে এবং কী কী বেরোয়, মানে ইনপুট আর আউটপুট গুলো কী কী? একদম সোজাসাপ্টা হিশেবের জায়গা থেকে ভাবুন। যা বেরোলো তার থেকে যদি যা ঢুকছে তাকে বাদ দিই তাহলে আমরা মুনাফাকে পাব। এটাকে আমরা পুঁজির মুনাফা বলে ডাকব, কারণ পুঁজিই এই উৎপাদন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই মালিক। উৎপাদন শুরু করে কারখানা বসায় পুঁজি।

একটা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের উপাদান হল পুঁজি আর শ্রম। এই পুঁজি আর শ্রম মিলে উৎপাদন প্রক্রিয়াটা চালায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল পণ্যে রূপান্তরিত হয়। এই পণ্য বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আমরা ডাকি রেভিনিউ। এই রেভিনিউ বা শ্রমের ফসল আসলে খরচের মোট পরিমাণের চেয়ে বেশি। সেই জন্যেই মুনাফাটা হয়। উৎপাদন শুরু হয়েছিল কী নিয়ে? পুঁজি আর শ্রম আর কাঁচামাল নিয়ে। (পুঁজি মানে আমরা ফিনান্স আর মেশিন দুটোকেই ধরেছি)। এর মধ্যে কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির জন্যে কতটা ব্যয় হয়েছে সেটা সহজেই মাপা যায় কারণ এদের বাজার থেকে কিনতে হয়েছে। এরপর থাকে শ্রমের প্রাপ্য। সেটা আমরা বুঝব কী করে? শ্রমের মোট পরিমান বলতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বোঝে — শ্রম দিতে গেলে শ্রমিক হিশেবে বেঁচে থাকতে গেলে শ্রমিককে যে পরিমাণ ন্যূনতম ভোগ করতেই হয় তার পরিমাণ। সেই ন্যূনতম ভোগের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ (মানে সাবসিস্টেন্স ওয়েজ বা টিকে থাকার মজুরি) আমরা যদি রেভিনিউ থেকে বাদ দিই, কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির খরচ তো আগেই বাদ দিয়েছি, যে অংশটা পড়ে সেটাই পুঁজিবাদীর মুনাফা বা প্রফিট। (আমরা ইচ্ছে করেই মার্ক্স এর ব্যবহৃত বর্গ ফিক্সড ক্যাপিটাল আর ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল ব্যবহার করলাম না, তার তুলনায় এগুলো বেশি পরিচিত বলে।)

মুনাফা = রেভিনিউ – কাঁচামাল আর যন্ত্রের খরচ – সাবসিস্টেন্স ওয়েজ

এবার মার্ক্সবাদী তত্ত্বের একটা গোড়ার অভেদকে ভাবুন। (যারা অভেদ কাকে বলে জানেন না, তাদের জন্যে বলে নিই, অভেদ মানে যাদের আর সমান করার দরকার পড়ে না, যারা সংজ্ঞাগত ভাবেই এক বা সমান। ধরুন আপনি লিখলেন "চাল = rice" — এ টা কিন্তু অভেদ, সমীকরণ নয়, কারণ ইংরিজিতে আর বাংলাতে আপনি একই ধারণাকে রাখছেন, যে ভাষাতেই বলুন না কেন চাল তো একই হবে। উল্টোদিকে, সমীকরণ হল তাই যা এমন দুটো জিনিষকে পরস্পরের সমান করে যাদের এমনিতে সমান হওয়ার কোনো দায় নেই। বাজারের বিবরণ দিতে গিয়ে আপনি লিখলেন, চালের দাম = ২০টাকা। এটা সমীকরণ, কারণ চালের দাম আর ২০টাকা সংজ্ঞাগত ভাবে সমান না, তাদের কোনো দায় নেই সমান হওয়ার অন্য আর এক দিন চালের দাম ১০ বা ৩০টাকা হতেই পারে।) এই অভেদ আমাদের জানায় মোট মুনাফা আর মোট উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালু সবসময়ই সমান হবে। এই অভেদের তাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা এখানে যাবনা। যদিও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এই অভেদটাকে বোঝার চেষ্টা আমরা একটু বাদেই করেছি। এই অভেদ আমাদের জানায়, গোটা অর্থনীতি জুড়ে ভাবলে,

মোট মুনাফা = মোট সারপ্লাস ভ্যালু

এই অভেদের দ্বিতীয় উপাদানটায় যাওয়া যাক এবার। উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালু। সারপ্লাস ভ্যালু জিনিষটা কী? সারপ্লাস ভ্যালু হল শ্রমের নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার, নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা। আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি কী ভাবে যুগের পর যুগ ধরে শ্রম পুঞ্জীভূত হয়ে আজকে আমাদের সামনে মোট পুঁজির এই পাহাড় রচনা করেছে। এটা সম্ভব হল এই উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালুর কারণেই। যার এক এবং একমাত্র উৎস মানুষের শ্রম।

এইমাত্র যে উৎপাদন পদ্ধতিকে আমরা আলোচনা করলাম তাকে আর একবার ভাবুন। আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমে পুঁজির দৃষ্টিতে উৎপাদনকে দেখে আমরা যেখানে মুনাফা দেখছি, শ্রমের দৃষ্টিতে সেটাকে দেখলেই আমরা পাব উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালু। (নাম না করে এখানে আসলে আমরা শ্রেণীকে ভাবছি, মালিক শ্রেণী যেখানে মুনাফা দেখে, সেখানে শ্রমিক শ্রেণী দেখে সারপ্লাস ভ্যালু।) মোট যতটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালু উৎপাদনের মধ্যে নিহিত আছে তার নিরিখেই আমাদের ভাবতে হবে সারপ্লাস ভ্যালুর পরিমাণকে। মোট কতটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালু ঢুকেছে উৎপাদনে? যন্ত্র

এবং কাঁচামালের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু এবং শ্রমের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। শ্রমের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু মাপছি আমরা শ্রমিকের নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে দ্রব্যসামগ্রী লাগে তার এক্সচেঞ্জ ভ্যালু দিয়ে। এর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি — সাবসিস্টেন্স ওয়েজ বা টিকে থাকার মজুরি। এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর নিরিখে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এটাই হল মোট ব্যয়। উৎপাদিত দ্রব্যের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু কিন্তু এই মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি। এবং এই পার্থক্যকেই মার্ক্স ডাকলেন উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস ভ্যালু বলে।

সারপ্লাস ভ্যালু = উৎপাদিত পণ্যের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু – (যন্ত্র, কাঁচামাল এবং শ্রমের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু)

এখানে দেখুন, তিনটে এক্সচেঞ্জ ভ্যালু (যন্ত্র, কাঁচামাল, শ্রম) একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে পণ্য। পণ্য মানে আর একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালু — যে ভ্যালুটা ওই আগের তিনটের একত্রিত ভ্যালুর চেয়ে বেশি। এই তিনটের মধ্যে শ্রমই হল সেই জীবন্ত উপাদান যার মধ্যে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সেই যাদু নিহিত আছে, নিজের ভ্যালুকে অতিক্রম করে নতুন ভ্যালু সৃষ্টির — যার নাম সারপ্লাস ভ্যালু। যুগে যুগে এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়ে এসেছে, এবং সঞ্চিত হয়ে এসেছে — নির্মিত হয়েছে পৃথিবীর সম্পদের ভাণ্ডার — পুঁজি।

আমাদের শেষ দুটো আঙ্কিক সংজ্ঞাকে ভাবুন, একটা মুনাফা আর একটা সারপ্লাস ভ্যালু — এই দুটোই ঠিক, দুটোই সত্যি — এবং এরা দুজন দুটো আলাদা দৃষ্টিকোণকে হাজির করে। পুঁজিপতি মালিকের দৃষ্টিতে দেখলে এখানে পুরো ক্রিয়াটার ঘটক মনে হবে পুঁজিকে। পুঁজি বাড়া মানে উৎপাদন বাড়া মানে মোট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি বাড়া মানে মোট মুনাফা বাড়া, কারণ, মোটের উপর স্কেলটাই বেড়ে চলেছে, পুঁজি বাড়ানো মানে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ম্যাজিকটাকে আরো আরো জায়গায় চারিয়ে দেওয়া। আর যদি আপনি ওই ম্যাজিশিয়ানের দৃষ্টিতে তাকান, মানে শ্রমের, তাহলে দেখবেন পুঁজিটা আর ঘটক নয়, অনুঘটক। যাদুকরের জাস্ট একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। এবং সে অ্যাসিস্টান্টকেও পাকিয়ে তুলেছে আগের সমস্ত যুগের যাদুকরদের মোট যাদু। তাই শ্রমের দৃষ্টিতে পুঁজি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, আরোপিত, অন্যায় রকমে তার যাদুর ফসল ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকেই। এই দুই দৃষ্টিকোণই সত্যি। দু রকমের সত্যি। অতিনিয়ন্ত্রণের উদাহরণের ওই ছাত্রের সামনের বহুমুখী সত্যের মত। এবং এই দুই দৃষ্টিকোণের মধ্যে লড়াই-ই শ্রেণী-সংগ্রাম।

এমনকী অস্ত্র কারখানার শ্রমিক বা একজন বুদ্ধিজীবীও সেই শ্রেণী-সংগ্রামের শরিক হয় যখন সে শ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। আবার উল্টোটাও ঘটে। যারা বাবরি মসজিদের গায়ে গাঁইতি মেরেছিল তারা সবাই তো মনোহর শ্যাম জোশী বা উমা ভারতী না, ওই ঘাতক বাহিনীর অনেকেই ছিল শ্রমিক, তারা তখন শ্রমের দৃষ্টিকোণের, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির বিরুদ্ধে তাই শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। মোট সমাজ বাস্তবতাটাকে যখন আমি শ্রমের দৃষ্টিতে দেখছি ক্রিয়া করছি সেটা শ্রমিক শ্রেণী, আর যখন পুঁজির দৃষ্টিতে দেখে পুঁজির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছি তখন পুঁজিপতি শ্রেনী।

(এর মধ্যে আরো নানা বিবিধ ধরনের জটিলতা আসতে পারে। কিছুদিন আগেকার বীমা বিজাতীয়করণ বিরোধী আন্দোলনকে ভাবুন। তারা মেট্রো স্টেশনে স্টেশনে সই সংগ্রহ করেছিলেন, একআধদিন মিছিল টিছিলও করেছিলেন। কিন্তু তারপর? ইশুটা তো একটা আধটা রাজ্যসরকার দু এক পিস করপোরেশনের চেয়ে অনেক বড় ছিল, গরীব খেটে খাওয়া মানুষের পেটে এত বড় লাথি তো সেই খাদ্য আন্দোলন আর জরুরি অবস্থার পরে আর পরেনি। সবটা ওরকম দরকচা মেরে গেল কেন? কারণ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির নেতৃত্ব দেবেন যারা তারাই আর শ্রমের দৃষ্টিকোণে দেখছেন না, তারা তাদের চিন্তায় চেতনায় ক্রিয়ায় মালিক শ্রেণীর হয়ে গেছেন। আজকে বড় বড় শ্রমিক ইউনিয়ন গুলোর নেতৃত্বের একটা বড় অংশ আসে বীমা ইত্যাদি টারশিয়ারি সেক্টর থেকে, যেখানকার শ্রমিকরাও সে অর্থে, মানে মার্ক্স-চিহ্নিত অর্থে উৎপাদনশীল শ্রমিক নন, কারণ, তারা কোনো সারপ্লাস ভ্যালু তৈরি করেন না, যেমন করেন কারখানার মজুরেরা, জমির চাষীরা। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স জগতের বণিক পুঁজির অধীন শ্রমিকরা তাই আসছেন অনুৎপাদনশীল শ্রমক্ষেত্র থেকে, এরাই আজ মোট শ্রমিক আন্দোলনের অনেকটা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতি ওই লোকদেখানো আন্দোলন। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে আমার দুই বন্ধু শোভন আর ব্যানার্জি এই নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল, টারশিয়ারি ক্ষেত্র থেকে শ্রমিক নেতৃত্ব আসার বিপদ নিয়ে। সেটা তারা সিপিআইএম এর পত্রিকা গণশক্তিতে পাঠিয়েও ছিল, কোনোদিনই ছাপা হয়নি, বরং এইসব নিয়ে অত লাফালাফি করায় শেষ অব্দি তাদের পার্টি থেকেই বেরিয়ে যেতে হয়। আজকে বীমা আন্দোলনের হাল দেখে আমার শোভনের কথা খুব মনে হয়। আমাদের আগে ও বিপদটা বুঝেছিল। কিন্তু এটা বোঝেনি যে নেতাদের এটা বোঝানো যাবেনা এটাও ওই বিপদের অংশ, শ্রেণী রাজনীতির অংশ।)

১৫।। সাম্য/অসাম্য

আমরা দেখলাম পুঁজি কী ভাবে উদ্বৃত্ত বানায় তার শ্রমকে দিয়ে, সেটাকে ছিনিয়ে নেয় শ্রমিকের কাছ থেকে, এবং পুঁজিপতি মালিক হিশেবে ভোগ করে। এই পদ্ধতিটা পুঁজির যুগের নিজস্ব। সামন্ত যুগে পদ্ধতিটা আর একরকম ছিল। দাস ব্যবস্থায় আর একরকম। যুগ থেকে যুগে বদলেছে এই উদ্বৃত্ত বানিয়ে তোলার, ছিনিয়ে নেওয়ার এবং ভোগ করার পদ্ধতি — যার পুরোটাকে এক কথায় বলা যায় শ্রেণী-পদ্ধতি। এর সঙ্গে একটা যুগের সম্পত্তি সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক আর উৎপাদনী শক্তি মিলে গড়ে ওঠে একটা যুগের মোড অফ প্রোডাকশন। দাস-ব্যবস্থায় দাস-মালিক ছিল সেই প্রভু যে নিষ্কাশন করত ওই উদ্বৃত্ত। সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা এবং সামন্ত প্রভুরা। এবং পুঁজি-ব্যবস্থায় এই অধিকার পুঁজিপতি মালিকের। উদ্বৃত্ত বানিয়ে তোলার, নিষ্কাশন করার এবং ভোগ করার এই মোট পুঁজি-ভিত্তিক পদ্ধতি, যা আমরা এতক্ষণ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, তারই নাম পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম। উৎপাদন এর একটা অংশ, সম্পত্তি সম্পর্ক আর একটা, এবং সামাজিক সম্পর্ক আর একটা।

পুঁজিবাদ তাই একই সঙ্গে সাম্য এবং অসাম্য। তার নাগরিকেরা পরস্পরের সঙ্গে সমান এবং অসমান। এক্সচেঞ্জ ভ্যালু উৎপাদনকারী শ্রমিক হিশেবে সমস্ত শ্রমিক সমান। তার পরের সমানতা চুক্তির স্তরে। সেখানে সমস্ত নাগরিক সমান, মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে। এবং আমরা আগেই তো বলেছি মালিক এবং শ্রমিক এই ভাগাভাগিটাই করা যায় না, দুটো অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায় মাত্র। যে কোনো জ্যান্ত লোক আলাদা আলাদা সময়ে এবং একই সময়ে একাধিক অবস্থানে অবস্থিতি করতে পারে। যে কেউ যে কারুর সঙ্গে যে কোনো চুক্তিতে আসতে পারে, যে কোনো ক্রয় বিক্রয় করতে পারে, এটাই চুক্তির অধিকারের সাম্য। এই সাম্য গুলোর মধ্যেই নিহিত আছে উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের এবং ভোগের অসাম্য — যাকে দেখিয়েছিলেন মার্ক্স এবং পৃথিবীর সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসটা বদলে দিয়েছিলেন।

মনে করুন, হেগেল কী করেছিলেন? তার কাছে এটাই ছিল চরম — এই যে চুক্তির অধিকারের স্তরের সমানতা। আইনের চোখে সমানতা। এইজন্যে হেগেল ক্যাপিটালিজমকেই তার টার্মিনাস ভেবেছিলেন — ইতিহাসের সমাপ্তি। ঈশ্বর যেখানে মাটির পৃথিবীতে হাঁটছে। এর আগের কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই কিন্তু এই সমানতা ছিলনা। হেগেলের এই উচ্ছ্বাসের আর একটা কারণও থাকতে পারে। তৎকালীন জার্মানির ইতিহাস। তার আগে অব্দি প্রতিটা জার্মান রাষ্ট্রই ছিল পীড়নমূলক, অর্থাৎ, ওই সমানতা যেখানে নেই। রাষ্ট্র সেখানে ব্যক্তির উপর আরোপিত, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, কিন্তু ক্যাপিটালিজম হল সেই অবস্থা যখন ব্যক্তি তার নিজের নৈতিকতার মধ্যেই রাষ্ট্রকে বহন করছে, যেমন আমরা দেখিয়েছি, অ্যাবস্ট্রাক্ট মরালিটি প্রিন্সিপল-এর শরীরে। তাই রাষ্ট্র এখানে নাগরিকের আভ্যন্তরীন, প্রতিটি নাগরিক তার ভিতর, তার নৈতিকতা এবং ধর্মবোধের ভিতর রাষ্ট্রকে বহন করছে (অধিকারের তত্ত্ব দেখুন)। পুরোনো দমবন্ধ অবস্থা থেকে কাইজার রাষ্ট্রের এই গনতান্ত্রিক অবস্থায় আসার একটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বা সেলিব্রেশনও থাকতে পারে হেগেলের এই ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্বে।

মার্ক্স হেগেলের সমতার ছদ্মবেশ খুলে নিলেন, হেগেলের ভগবান ল্যাংটো হয়ে গেল। কিন্তু নতুন ভগবান পুরোনো ভগবানের জায়গা নিল। ক্যাপিটালিজমের জায়গায় কমিউনিজম। সব পেয়েছির দেশ। স্বর্গরাজ্য। এলডোরাডো। লীলা মজুমদারের অনবদ্য গদ্যে একটা অনবদ্য লেখা আছে, নামটা ভুলে গেছি, যেটা নিয়ে পরে বাদল সরকার বোধহয় নাটক করেছিলেন। ভারি মজার করে সেটায় কমিউনিজমের পরিবর্তিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা আনা হয়েছিল। বোধহয়, সন্দেশে যখন বেরিয়েছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন লীলা মজুমদারের সহলেখক। দুটো চোর সেখানে গেছে, সেই দেশে, গিয়ে আর চুরি করতে পারছে না, কারণ যা তাদের প্রয়োজন সবই তো তারা নিয়ে নিতে পারছে। সে দেশে চুরি ব্যাপারটাই আর করা যায় না। যাই হোক, যা বলছিলাম, আর একটা আর একধরণের সমতার কথা এলো। কিন্তু কী ভাবে?

একটা চালু কথা আছে, অনেকেই ব্যবহার করেছেন, সোশালিজমে, মানে সমাজবাদে, সকলেই পাবে তার শ্রম অনুযায়ী, আর কমিউনিজমে, মানে সাম্যবাদে, পাবে প্রয়োজন অনুযায়ী। প্রথমটায় মানে সমাজবাদে নিরিখটা হল শ্রম, আমাদের পরিচিত, এক ধরনের একটা বস্তুভিত্তি থাকছে সেখানে, কিন্তু দ্বিতীয় মানে কমিউনিজমের অংশটায় দেখুন, কোনো শ্রম বা বস্তু-নির্ভরতার প্রশ্নই নেই, পুরোটাই সাবজেক্টিভ, বা বিষয়ী-নির্ভর এবং বিমূর্ত, একজন থেকে আর একজনে যা পৃথক হতেই পারে। তাহলে সাম্যটা সেখানে আসছে কী করে? অথচ কমিউনিজমের আর এক নাম সাম্যবাদ। এর মানে কী?

আসলে এর মধ্যে একটা জটিল সত্যি লুকিয়ে আছে। পৃথিবীতে মানুষের পারস্পরিক সমতার কোনো বস্তুভিত্তি বা বাস্তবিক ক্ষেত্র এখনো পর্যন্ত একটাই সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা ওই ক্যাপিটালিজমের বা পুঁজিবাদের, বাজার সৃষ্ট সমতা। চুক্তির অধিকারের, ক্রয় বিক্রয়ের অধিকারের, সম্পত্তির উপর অধিকারের সমতা। এর বাইরে আর কোনো অবজেক্টিভ বা বস্তুভিত্তিক সমতা মানবসভ্যতা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের চিন্তায় আমাদের সংস্কৃতিতে যে সমতার ধারণা তা এই বাস্তবিক সমতারই সৃষ্টি বলে মার্ক্সবাদ মনে করে। (এখানেও দেখুন, বাজার-সমতা — বেস, চিন্তনের সমতা, সাংস্কৃতিক সমতা — সুপারস্ট্রাকচার, বেস কারণ, সুপারস্ট্রাকচার কার্য।) মার্ক্সবাদ মনে করে বাজারের এই সমতা থেকে যখন পুঁজিবাদী শোষণকে আমরা বাদ দিতে পারব, তখন আমরা সমাজবাদে পৌঁছব। তার মানে সমাজবাদ হল পুঁজিমালিক-হীন পুঁজিবাদ। পুঁজিমালিককে বাদ দিলে পুঁজিব্যবস্থার আর কী থাকে? থাকে পণ্যব্যবস্থা, থাকে বাজার। অর্থাৎ, সমাজবাদে বাজার থাকবে পণ্যব্যবস্থা থাকবে। বাজার থাকা পণ্য থাকা মানে সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনও থাকা, কিন্তু এখানে সেই উদ্বৃত্ত ভ্যালু ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে কোনো পুঁজিপতি মালিক নেই। সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজ ভোগ করবে সেই উদ্বৃত্ত।

এবার প্রশ্নটা এখানেই, সামগ্রিক ভাবে সমাজ ভোগ করবে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সমাজ — এতো একটা বিমূর্ত প্রস্তাব, তার হাত নেই পা নেই, তাহলে তার হয়ে সিদ্ধান্তগুলো নেবে কে? এখানেই আসছে ইতিহাসের সচেতন কর্তা, কনশাস সাবজেক্ট-এর প্রশ্ন। যে দায়িত্বটা আসছে কমিউনিস্ট পার্টির উপর। ওই শোষণকর্তাহীন শোষণহীন সমাজে কমিউনিস্ট পার্টিই মানুষের হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেবে। বিষয়ী বা কর্তা বা সাবজেক্ট এখানে কমিউনিস্ট পার্টি। তারপর, কমিউনিজম অনেক দূরের পথ, সেখানে আর কোনো অবজেক্টিভ বেসিস, বা সমতার কোনো বস্তুভিত্তির প্রয়োজনই পড়বে না, কারণ মানুষের চৈতন্য তখন সেই শোষণহীন রকমে চিন্তনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তার চেতনাই ধারণ করবে সমতাকে। ওই কনশাস সাবজেক্ট বা সচেতন কর্তা মানে কমিউনিস্ট পার্টি পুরো সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে পৌঁছে দেবে সেই মোক্ষে। আর ওই সচেতন কর্তার সচেতনতায় ধরা থাকবে সমতার ধারণা। সেখানে আর কোনো বস্তুভিত্তিক সমতার প্রয়োজনই পড়বে না।

এবং সেখানে কি সমস্যা দাঁড়াবে না প্রয়োজনের সমতার উপলব্ধি নিয়ে? মহাভারতের কথা মনে করুন। পাঁচ ভাই তাদের আহরণ নিয়ে ফিরত, কুন্তী তাদের বলতেন ভাগ করে নিতে। মা কুন্তীর কাছে সব ছেলেই সমান। ভাগটা কী ভাবে করা হত? ভীম পেতেন অর্দ্ধেক এবং অন্যরা ভাগ করে নিতেন অন্য অর্দ্ধেক। বিশালদেহী মল্লযোদ্ধা ভীমের ভোগ তো কখনো ইন্টেলেকচুয়াল যুধিষ্ঠিরের সমান হতে পারে না। তাহলে সাম্যই কিন্তু অসম। যদি আমরা তাদের ভোগের ভিত্তিতে সমান করতাম তারা তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অসমান হত। পশ্চিমের দর্শনের সমাজনীতির অর্থনীতির একজন জনক, অ্যাডাম স্মিথ, ফাদার অফ ইকনমিক্স বলে তাকে ডাকা হয়, তার ওয়েলথ অফ নেশনস-এ আদিম সমতা মানে ভেবেছিলেন ভোগের সমতা। এবং আমাদের প্রতিটি সমতা ধারণার মধ্যে রয়েছে একটা যান্ত্রিকতা, যা আমাদের বাস্তবতাবোধের সঙ্গে একদমই যায় না। আমরা আবার এই প্রসঙ্গে পরে আসব।

১৬।। সমাজবাদের অভিজ্ঞতা

অথচ আমরা আমাদের চোখের সামনে কী দেখলাম, কী ভাবে মানুষের সামনে দেখা দিল সেই সমাজবাদ? সবচেয়ে যে সংবেদনশীল অংশ মানুষের — শিল্পী লেখক এরা, তাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই কী ভাবে পেশ এল সেই সমাজবাদী বাস্তবতা? একদম সেই ইলিয়া এরেনবুর্গ, আনা আখতামোভা, ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, সের্গেই আইজেনস্টাইন থেকে শুরু করে আন্দ্রেই তারকোভস্কি অব্দি? (আমি আর একবার এখানে মনে করিয়ে দিই, এটা কোনো দায়িত্বশীল অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ নয়, আমার কোনো দায় নেই কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার। ঠিক যেভাবে এগুলো আমার কাছে এই রাজনীতির অসুখ হিশেবে এসেছিলো, সেভাবেই লিখে যাচ্ছি, অপরের সুদীপ-তাপস-সোমনাথ পড়তে চেয়েছে বলে, অন্য কেউ পড়লে ভালোই তো। সে অর্থে এটা সম্পূর্ণ দায়হীন, দায়িত্বহীন প্রবন্ধ, এমনকী কোনো প্রবন্ধই না, একটা অতিদীর্ঘ মনোলগ।)

আমার কাছে প্রায় একই সময়ে এসেছিল হাওয়ার্ড ফাস্টের ল্যাংটো ভগবান, নেকেড গড, আর সলঝেনিৎসিন এর গুলাগ এবং অন্য একটা উপন্যাস, স্ট্যালিন আমলের লেবার ক্যাম্প নিয়েই, বোধহয় ফার্স্ট সার্কল। আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে। আজো প্রায় হুবহু মনে আছে নেকেড গড-এর ভূমিকা, প্রায় হুবহু, প্রতিটি প্রসঙ্গই। আসলে কেঁপে গেছিলাম আমরা, নেকেড গড-এর আঘাতে। যারা রাজনীতি করেননি কখনো তাদের এটা বোঝানো যাবেনা, ধরুন উৎপল বসুর 'এবার বসন্ত আসছে পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে/প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দুজন

মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে' — এই কবিতাটা প্রথমবার পড়ার মত। সবকিছু শূন্য মনে হয়, প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়। কী হল — কী করলাম তাহলে আমরা — কী করছি — ওই প্রতিশ্রুতিহীন নদীর মত? এরকম মনে হতে থাকে। (ভালো করে ভাবলে বোঝা যায়, এত গভীরে যখন নড়িয়ে দিচ্ছে তখন নিশ্চয়ই মৃত্যুভয়ের মেটোনিম, পরিণামহীন মৃত্যুর সঙ্গে 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড' তো দূরের কথা, আসলে কোনো যুদ্ধই করে উঠতে পারছি না? এত অর্থহীন এত কারণহীন আমাদের সবকিছু?) ওই হাওয়ার্ড ফাস্ট আর সলঝেনিৎসিন আমরা পড়েছিলাম দুজনে মিলে। আমার এক বন্ধু টাবু আর আমি, তারপর দুজনে মিলেই পড়তে শুরু করেছিলাম স্টালিন আমলের ইতিহাস, যেখান থেকে যতটা পারি। পুরো তথ্য গুলো ওর ঠোঁটস্থ থাকত, অনেক বেশি নিঁখুত স্মৃতি ছিল ওর, একদিন থার্টি বাসে বসে আমাদের শোনাচ্ছিল উনিশশো তিরিশ এর পুরো সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির শ তিনেক সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বারের কথা, যাদের উনিশশো পঁয়ত্রিশ-এর মধ্যে স্ট্যালিন হজম করে দিয়েছিলেন। এবং তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে নিজেদের স্বীকারোক্তি গুলো যদি পড়েন, সেই শিশুদের মত সব বাক্য, আপনার গা গোলাতে থাকবে, সত্য কথনের নামে এত বড় প্রহসন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো হয়েছে কিনা কে জানে। আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার মানে গুপ্তচরবাহিনীর প্রধান বেরিয়া আর স্তালিনের সন্ত্রাসের ওর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কিছু হয়না।

এর ভিতর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেই তর্কে যাওয়ারই কোনো মানে হয়না। জাঁ ফ্রাসোয়া লিওতার, একজন উত্তর-আধুনিক ফরাসি দার্শনিক, এই রকম অবস্থাকেই বলেছেন নন-লিটিগেশন, যে প্রশ্নের কোনো নিষ্পত্তি হয়না। যদি কেউ বলে স্টালিন আমলে লেবার ক্যাম্পে অত্যাচার হয়েছিল, তাহলে অন্যরা বলবে সে কমিউনিস্ট-বিরোধী, আর যদি কেউ বলে হয়নি, তখন অন্যরা বলবে সে কমিউনিস্ট। কিন্তু অন্য এক জায়গা থেকে প্রশ্ন করুন, পূর্ব-ইউরোপের পতনের পর যে ফিল্ম গুলো বানিয়েছিলেন পূর্ব ইউরোপের অনেক চিত্র পরিচালক, সেই ফিল্মগুলোয় যা আছে তা সত্যি না মিথ্যে সে প্রশ্নেই যাচ্ছি না, কিন্তু ওই ফিল্ম যে তাদের বানাতে ইচ্ছে হয়েছিল সে কথা তো সত্যি। সে কী বীভৎস ক্রোধ এবং ঘেন্না। লেনিনের প্রতি, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি। কী সেই জীবন বাস্তবতা যা এতটা বিতৃষ্ণা বার করে আনতে পারে মানুষের বুক নিংড়ে? এতটা অসহায় ঘৃণা?

আর এর উল্টোদিকটা ভাবুন, এই উদাহরণটা প্রথম লক্ষ্য করেছিল টাবুই, নিকোলাই অস্ত্রভস্কির হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড বলে একটা উপন্যাসে। শুধু একটা উপন্যাস এটুকু বললেই বোঝানো যায় না আমাদের কৈশোর প্রথম যৌবনের উপর এর প্রভাব ছিল এত অপরিসীম। এখনো আড়ে সাদা কালো ডুরে কোনো জামা বা টি-শার্ট দেখলেই, এখনো, এই এত বছর পরও, নাবিক জাখারভকে মনে না পড়ে যায় না (জাখারভই তো নামটা?)। মনে আছে পাভেল করচাগিনকে, সেই উপন্যাসের নায়ক, তার এককালীন এলিট প্রিয়তমার কাছে অপমানিত হওয়ার আখ্যান দিয়ে আমাদের অনেক ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই নিকোলাই অস্ত্রভস্কি ছিলেন অফিসিয়াল লাইন দ্বারা রেকমেন্ডেড লেখক। মানে পার্টির নেতারা যার লেখা পড়ছে দেখলে ছেলেটির ভবিষ্যত নিয়ে কোনো বাড়তি দুশ্চিন্তায় ভুগতেন না, বরং সে ঠিক পথেই আছে এরকম ভেবে নেওয়া যেত অনায়াসে। আজকের পরিভাষায় বললে 'পলিটিকালি কারেক্ট'। সেই উপন্যাসের একটা চরিত্র, প্রথমে যে ছিল অন্যান্য লড়াকু সহযোদ্ধাদেরই একজন, একই রকমের বীর এবং সত, একসময় ট্রটস্কাইট বা ট্রটস্কিপন্থী হয়ে গেছিল, এবং মজার কথা যে তারপরেই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে তার মাতাল এবং নারীসঙ্গপরায়ণ হয়ে যাওয়ার গল্প। দেখুন সত্যিকারের কোনো ট্রটস্কাইট আসলে এমন হয়ে যেতেই পারে, কিন্তু উপন্যাসে তার তো একটা আলাদা অর্থ। বাস্তবতায় যে কোনো মানুষের যে কোনো মুহূর্তে একটা নাকঝাড়া আসতেই পারে, কিন্তু, ভাবুন তো, দুর্গা মারা যাওয়ার পরে, হরিহর আসছে, দাওয়ায় ঢুকলো, সে জানেনা এখনো, শূন্য সর্বজয়া বসে আছে। এখানে আসলে যা আছে, ওই বিষণ্ণ নাটকীয়তা হিশেবে, সেটা হল সর্বজয়ার হাতের চুড়িটা নড়লো, এবং খুব উঁচু পর্দায় একটা করুণ বাজনা বেজে উঠলো। ধরুন এ অব্দি ঠিকই আছে, তারপরেই সর্বজয়া নাক ঝাড়লেন, এবং দাওয়ার পাশে মাটিতে তার সিকনি মুছে হাত ধোওয়ার জন্যে গেলেন, তাতে কী সত্যের কোনো অপলাপ হয়? কিন্তু সেটা কি আসতে পারে সিনেমায়?

ঠিক সেই রকম পুরো কমিউনিস্ট যুগ জুড়ে যে সাহিত্য গুলো ছাপা হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে, তাতে অসামান্য সব 'আসতে পারা' লক্ষ্য করতে পারবেন প্রায়ই। এর চূড়ান্ত উদাহরণ একটা আছে আমার কাছে, উনিশশো বাহান্ন বা চুয়ান্নতে সোভিয়েত রাশিয়ার উচ্চতম পুরষ্কার অর্ডার অফ স্ট্যালিন পাওয়া উপন্যাস 'হারভেস্ট'। লেখকের নাম নিষ্প্রয়োজন। উপন্যাসটা নিয়ে একটা খেলাই হতে পারে এরকম, এর এত নম্বর পাতার কোন কোন লাইনে

স্ট্যালিনের নাম একবারও নেই বলোতো? এবং এই উপন্যাসটার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হয়না সামগ্রিক সামাজিক সত্যধর্ষণের, বাবরি মসজিদ সত্যি না রামজন্মভূমি সত্যি এই নিয়ে ইতিহাসবিদদের রামজন্মভূমির পক্ষে মত দেওয়ার, বা টিভিতে তপন শিকদারের তার অভ্যস্ত বোকা ভাঁড়ামো নিয়ে 'আমরা তো গান্ধীর মতাদর্শেই চলছি' — এর চেয়েও এটা বোধহয় ভয়ঙ্কর। কারণ, তপন শিকদারদের তাদের বাড়ির লোকেরাও সিরিয়াসলি নেয় কিনা সে আমি জানিনা, কিন্তু সোভিয়েত এই সত্যধর্ষণ সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অনেক মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, তাদের ভগবানকে ল্যাংটো করে দিয়েছিল।

১৯৯২ এর সাতই জানুয়ারি আমার জীবনে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা তারিখ, এবং একটা বেদনা একটা অস্বস্তি আমার ভিতর খেলা করে ওই তারিখটা ভাবলেই, ওইদিন সকালের কাগজেই ছিল, ক্রেমলিনের মাথা থেকে খুলে ফেলা হল লাল পতাকা। আর আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, লাল কিল্লা পর লাল নিশান মাং রহে হ্যায় হিন্দুস্তান? প্রতিদিন আমরা ক্যাপিটালিজমের ফলিং রেট অফ প্রফিট থেকে গজিয়ে ওঠা গোলযোগ নিয়ে ভাবতাম, বাণিজ্য চক্র বা ট্রেড সাইকেলের প্রতিটি ওঠানামা দেখলেই উত্তেজিত হয়ে ভাবতাম, এই বোধহয় শেষের শুরু, সেই সব কিছু এক নিমেষে গুলিয়ে গেল। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো রয়ে গেল, একইরকম, ভোগে চলে গেল সমাজবাদ। শম্ভু মিত্র তার অবিস্মরণীয় স্বরে অয়দিপাউস নাটকে বলেছিলেন, কেন এমন হয় দেব আপোললন, কেন এমন হয়?

এই প্রশ্নের সামনে না দাঁড়িয়ে আর কোনো উপায় ছিল না, কোথাও একটা গোড়াতেই গলদ আছে, রাজনীতিতে, দর্শনে, ক্রিয়ায়, সাম্যবাদী আন্দোলনের অবয়বে। সমাজবাদী রাষ্ট্রে মানুষের শোষণহীন সাম্যে — তার ক্রিয়ায় এবং চেতনায় — খুব বড় বড় গর্ত আছে, অন্তত এ নিয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ ছিল না। আসলে একভাবে দেখলে নিজের পার্টি রাজনীতিকে ঘিরে নিজের বোধের মধ্যেই এই গর্ত গুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম, সোভিয়েত ব্লকের পতন তার প্রমাণ হাজির করল মাত্র। অন্যভাবে খোঁজাটা আরো বেড়ে উঠল। খুঁজতে গেলে নিজের একটা তাত্ত্বিক অবস্থান লাগে। প্রথমে শুরু হল সেটা খোঁজা।

১৭।। সাদা কালো ও ধূসর

দুই বিপরীত ধারণার, দুই বিপরীত মেরুর নিরিখে বাস্তবতাকে বুঝতে চাওয়ার প্রবণতা মানবসমাজের এক দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাইনারি বলতে দ্বিত্ব। যেমন বাইনারি নাম্বার সিস্টেম হল ০ আর ১ এই দুটো মাত্র অঙ্ক দিয়ে সব সংখ্যাকে প্রকাশ করা, যেখানে আমরা আমাদের দশমিক বা ডেসিমাল পদ্ধতিতে ০, ১, ২ ..., ৯ এই দশটা অঙ্ক দিয়ে সংখ্যাদের লিখি। যেমন দশমিক পদ্ধতির দুশো চৌত্রিশ বা ২৩৪ মানে বাইনারি পদ্ধতির ১১১০১০১০ — শুধু ০ আর ১ এর বিপরীত দুই মেরুতে প্রকাশিত হল আমাদের চেনা ২৩৪। এই দুই বিপরীত মেরুর মডেল ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব জায়গাতেই, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, চিনদেশের ইং আর ইয়ান, খ্রীস্টিয় গড এবং ডেভিল, ভগবান আর শয়তান, ভালো আর মন্দ, শুভ আর অশুভ, সাদা আর কালো।

কিন্তু, এই সাদা আর কালোকে ভাবুন, এই দুই বিপরীত মেরু দিয়ে কতটুকু বোঝা যায়, চারপাশে যা আমরা দেখি তা সবই তো প্রায় এদের মাঝামাঝি — মানে ধূসর। সাদা থেকে হালকা ধূসর থেকে ঘন ধূসর থেকে কালো — স্কেলটা এইরকম। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা ফোটোর কথা ভাবুন। সেখানে কিছুটা বিশুদ্ধ সাদা, কিছুটা বিশুদ্ধ কালো, আর বেশির ভাগ জায়গাটা জুড়ে তাদের বিভিন্ন হারের মিশ্রণ, মানে বিভিন্ন ঘনত্বের ধূসর। এভাবে যখন আমরা ভাবছি তখনও ফোটোকে কিন্তু আমরা সাদা আর কালোর নিরিখেই ভাবছি। কিন্তু এই পুরোটাকে আর একটা রকমেও ভাবা যায়, শুধু ধূসর দিয়ে। যখন সাদা আর কালো দিয়ে কিছু ভাবছি না, ভাবছি ধূসর দিয়ে। কিছুটা জায়গায় খুবই হালকা ধূসর, যাকে আগে সাদা বলতাম, অন্য কিছুটা জায়গায় খুবই ঘন ধূসর, মানে কালো, অবশিষ্টটা জুড়ে বিভিন্ন ঘনত্বের ধূসরতা।

এবার এই চিন্তাটা দিয়ে সেকশন ৮ এর হেগেলের নামকরণ প্রক্রিয়াকে ভাবুন, বা যে কোনো দার্শনিক বর্গকে। (বা, শুধু দার্শনিক বর্গ কেন, আমাদের চিন্তা চেতনার নৈতিকতার মূল্যবোধের যে কোনো বর্গকে।) আমরা কিছু কিছু জিনিষকে কালো নয়, হলুদ নয়, বেগুনি নয়, এরকম করতে করতে নাম দিলাম লাল। কিন্তু লাল মানেই কি এক? তার ভিতরেও কি কোনো ভেদ নেই, তারতম্য নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা তাদের সেই পার্থক্যকে অবরুদ্ধ করলাম। একটা বড় বর্গের ছত্রছায়ায় নিয়ে এলাম কিছু অস্তিত্বকে, অন্য কিছু অস্তিত্বকে বাদ দিলাম, যেমন লাল বলে ডাকলাম, বাদ দিলাম হলুদ নীল বেগুনিদের। এবার 'লাল' নামক বর্গের শাসনে বিবিধ লালের পার্থক্যদের মুছে দিলাম।

অর্থাৎ, ‘লাল’ নামের এই বর্গটা একটা জায়গায় বোকা হয়ে গেল। বাস্তবতা সবসময়েই তার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত হবে। লাল দিয়ে বোঝানো যাবেনা এমন নানা লীলা বাস্তবতা দেখাতেই থাকবে।

এই প্রক্রিয়টাকেই অন্য আর এক ভাবে বর্ণনা করেছিলেন দেরিদা তার ‘দিফেরঁস’ নামক পদ্ধতিতে। সেখানে অন্টলজিকাল স্লিপেজ-এর, অস্তিত্বতাত্ত্বিক ভাবে পিছলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একটা বর্গকে আমি আমার চালু বিদ্যা ও চেতনা দিয়ে, আমার এপিস্টেমলজির বা জ্ঞানতত্ত্বের নিরিখে স্থির করলাম। যেমন ‘লাল’। কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, তার অস্তিত্বতত্ত্বগত জায়গায় বারবার পিছলে যাবে ওই বর্গ থেকে। পুরো মানেটা আসবে না, কিছুটা মানে থেমে থাকবে, স্থগিত হয়ে থাকবে। কিছুটা পার্থক্য এসে যাবে।

যে শাড়ি পরে প্রেয়সী এসেছিল চৌরঙ্গী রোড ধরে হাঁটতে, কবিতায় তাকে লাল বললাম, কিন্তু পুরোটা কি এল, রাণীও তো লাল, শকিং পিঙ্কও লাল, পাকা সুপুরিও লাল, মোড়ের মাথায় বাধা ফেস্টুনও লাল, কোন লালের প্রবাহ বয়েছিল সেইদিন চৌরঙ্গীর রাস্তায়? (অভিজিত এই লেখাটা পার্টে পার্টে পড়ছে, এবং পরিমার্জণ করছে, রোজ রাতে মেল করি, ও ওর ফিডব্যাক দেয়, ও জানাল, এই উদাহরণগুলোর মধ্যে একটা সমস্যা আছে, হতেই পারে একটা লোক রাণী রং কী জানেনা, তাই লাল বলে ডাকছে, কিন্তু এখানে পরিষ্কার কিছু আবেগগত তফাতও ঘটতে পারে। ও যে উদাহরণটা দিয়েছে এর বদলে সেটা হল, সব লালই কি এক — ব্রেবোর্ন রোডে দুপুর দুটোর ফিরিওলার গামছার লাল, বা, রাত দুটোয় মোগলসরাই স্টেশনে কুলির উর্দির লাল, বা, ডিসকভারি চ্যানেলের অনলাইন অপারেশনে তখনো জ্যান্ত ধকধক করা হৃদপিণ্ডের লাল?) কিছুটা মানে থমকে ছিল ‘লাল’ শব্দটার শরীরে। তার মধ্যে এসে গেছিল বিবিধ লালের এই পার্থক্য। এই স্থগিত করা এবং পার্থক্য আসা, ডেফার করা এবং ডিফারেন্স — এদের দুটোকে মিলিয়েই দেরিদা তার দিফেরঁস পেয়েছিলেন।

যাকগে, যে কথা বলছিলাম, এটা বোঝা গেল যে আমাদের দার্শনিক বর্গগুলো দিয়ে কখনোই পুরোটা বোঝা বা বোঝানো যাবে না। বর্গগুলোকে দুই বিপরীত মেরুতে ভেঙে ফেললে বোঝানো যাবে আরো কম। ডেসিমাল ২৩৪ বাইনারিতে এসেছিল কারণ তাদের কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ নেই, কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে অর্থ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটাই চলে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে।

সংখ্যার ক্ষেত্রেও সমগ্র অর্থ আসার চিন্তাটা ভুল, সমগ্র বলে কিছু এমনকী অঙ্কশাস্ত্রেও নেই, ক্যান্টরের ইনফাইনাইট সেট বা অসীম সেটের তত্ত্ব, রাসেলের প্যারাডক্স, গেডেলের অসম্পূর্ণতা উপপাদ্য ইনকমপ্লিটনেস থিওরেম এবং হিলবার্টের প্রথাবদ্ধতার, ফর্মালাইজেশনের চেষ্টাকে মিলিয়ে, তাকে টুরিং-এর কাজ এবং লিস্প বলে একটা কম্পিউটার ভাষার নিরিখে গ্রেগরি শাইতিন আমাদের দেখিয়েছেন। সে ভারি ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। কিন্তু সোমনাথের রক্তচক্ষু উদ্যত আছে, ৭ জানুয়ারির মধ্যে লেখা দিতেই হবে, আজ ৬, এবং লেখার সাইজ ইতিমধ্যেই ষোল হাজার চারশো শব্দ ছাড়িয়েছে, তাই আপাতত থাক। (শাইতিন এর পুরো বইটা আমার কাছে এইচটিএম-এ আছে, কেউ চাইলে যোগাযোগ করুন, ddipankardas@hotmail.com)

উদ্বৃত্ত অর্থ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি কোনো তত্ত্বের বা লেখার বা বাক্যের বা শব্দের লেখক-কাঙ্খিত অর্থ এবং পাঠক-কাঙ্খিত অর্থের ভিতর পার্থক্য ঘটা। ধরুন ভগবৎগীতা — তার কত না অজস্র ভাষ্য, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই এমনকী তার একটা মার্জিন অফ মার্জিন ভাষ্যও পাকিয়ে তোলার প্ল্যান করছি। কোশাম্বি তার মার্ক্সবাদী অবস্থান থেকে একটু তেরছা রকমে সে বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, “গীতা টেনে এনেছে এত বিবিধ ধরনের মনকে, যারা একে অন্যের থেকে পৃথক তো বটেই এমনকী গীতার শ্রোতা অর্জুনের থেকেও পৃথক। তথাকথিত দৈব ওই বাণীকে তারা পরস্পরের থেকে এত পৃথক রকমে ব্যাখ্যা করেছেন যে মূলটা কোনো মানসিক দ্বিধাকে দূর করা তো দূরের কথা ব্যক্তিত্বকে আরো খণ্ড করার (স্প্লিট পার্সোনালিটি) পক্ষেই বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়”।

প্রশ্নটা এখানেই যে, গীতার এত ভাষ্য, এত বিবিধ ধরনের অর্থ হয়ে উঠছে কী করে। কেউ দ্বৈতবাদ দেখছেন, কেউ অদ্বৈতবাদ, কেউ বা বিশিষ্টাদ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেউ বেদবিরোধিতা, কেউ বেদবাদ। সংগ্রামের হাতিয়ার হিশেবে গীতাকে পড়ছেন বালগঙ্গাধর তিলক, অহিংসার বাণী হিশেবে পড়ছেন মোহনদাস গান্ধী। আমার চোখে এখনো পড়েনি, কিন্তু কোনো বিজেপি ভাষ্য, ‘গান্ধী-হত্যার মুসলিম-হত্যার প্রকৃষ্ট পন্থা’ বা এ জাতীয় কিছু, থাকতেই পারে। এতগুলো পরস্পর-বিরোধী অর্থ তো একইজায়গায় রচনাটির রচনাকারের ইচ্ছিত অর্থ হিশেবে থাকতে পারে না। তাহলে তাকে সত্যিই স্প্লিট পার্সোনালিটির মনোরোগী হতে হবে, এবং সেক্ষেত্রেও সেই টুকরো টুকরো ব্যক্তিত্বরা আলাদা আলাদা রচনা সৃষ্টি করবে, একই রচনা হিশেবে থাকা অসম্ভব। তার মানে মূল ওই রচনার ভিতরেই এত এত ভিন্ন অর্থের

সম্ভাবনাটা ছিল। এটাকেই আমরা ডাকছি উদ্বৃত্ত অর্থ বলে। আমাদের প্রতিটি লেখার প্রতিটি তত্ত্বের প্রতিটি ক্রিয়ার ভিতরেই এই অন্য কারুর দ্বারা অন্য অর্থ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাটা রয়ে যায়, উদ্বৃত্ত অর্থরা রয়ে যায়। (এক ভাবে দেখলে এই প্যারাগ্রাফে আমরা দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন তত্ত্বের একটা ইঙ্গিত রাখলাম। আলাদা আলাদা মূল্যবোধ আরোপ করে একই জিনিষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পৌঁছনো — দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের এটা একটা মূল জায়গা)।

আমরা আবার ফেরত যাই বাইনারি চিন্তাপ্রক্রিয়ার বিষয়ে। অর্থ এবং উদ্বৃত্ত অর্থের নিরিখে বলাই যায়, যে দার্শনিক বর্গই আমরা তৈরি করি না কেন, তাতে কখনো পুরো অর্থটা আসবে না, এবং বাইনারি রকমে ভাবলে অর্থটা আসবে আরো অতিসরলীকৃত হয়ে, নাটকীয় হয়ে, আরো বেশি ভুল হয়ে। কারণ, বাইনারির মধ্যেই একটা গোপন মূল্যবোধ রয়ে যায়। কম্পিউটার সার্কিটে যখন বিদ্যুত আছে তখন মেশিন সেটাকে ভাবে ১, আর যখন নেই মেশিন সেটাকে ভাবে ০। ১ মানে উপস্থিতি, বিদ্যুতের উপস্থিতি, ০ মানে অনুপস্থিতি। সাদা কালোর নাটকীয় বৈপরীত্যটাই তো থাকে না, যদি আমরা তাদের খুব হালকা ধূসর আর খুব ঘন ধূসর বলে ভাবি।

আমরা সত আর অসত দেখি। উপেন বিশ্বাস আর হনু নিয়োগী (ইচ্ছে করেই নামটা বদলাতে হল নইলে বাড়ি এসে কেলিয়ে যাবে আমায় — হনু আর নেই কিন্তু তার আত্মীয়রা তো সরকার জুড়ে আছে)। কিন্তু উপেন বিশ্বাস যদি তার কেরিয়ারের গোড়া থেকে প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও প্রতিবাদ করতে যেতেন তাহলে কি তিনি আদৌ তার কাজে টিকে থাকতে পারতেন? ধরুন তার কোনো সহকর্মী অফিস থেকে নিজের কোনো টেলিফোন করলেই যদি তিনি তার কলার চেপে ধরতেন? আর উল্টোদিকে হনু কেন পৃথিবীর যে কোনো বীভৎসতম ভিলেনকেও ভাবুন, তার নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহে সে কী ভীষণ সত। তাহলে? সত আর অসত এই কথাগুলোর মধ্যে যে গোপন মূল্যবোধ আছে, সত মানে ভালো, অসত মানে খারাপ, তাকে কি আর আপনি চাউর রাখতে পারছেন? তাহলে সত অসত এই দিয়ে এই বাইনারি মেরুকরণ দিয়ে বাস্তবতাকে বোঝার মধ্যেই কিছু গ্যাঁড়াকল রয়ে গেল। ঠিক এই জায়গাটা মাথায় রাখুন। এবার চলুন আমরা বেস-সুপারস্ট্রাকচার আন্তসম্পর্ককে আলোচনা করি।

১৮।। আলথুসের

যারা তাদের তত্ত্বের খোঁজটা একটু অন্যভাবে করতে শুরু করেছিলেন তার মধ্যে একজন লুই আলথুসের। আলথুসেরের কাজ পরবর্তী উত্তরআধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের অবস্থান গুলোর প্রত্যেকটিকেই কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির দর্শনে অতিনিয়ন্ত্রণের ধারণা (সেকশন ২) তার জায়গা পেয়েছিল আলথুসেরের কাজ থেকে।

আমরা এর আগে বেস-সুপারস্ট্রাকচার সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি। সেই জায়গা থেকেই আলথুসেরকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। আসুন, এই বাইনারি সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের আলোচনা দিয়ে এবার বেস-সুপাস্ট্রাকচারকে আলোচনা করি আমরা। আমরা আগেই দেখেছি মার্ক্সবাদ অনুযায়ী অর্থনীতি বা বেস হল কারণ, সংস্কৃতি বা চেতনা বা সুপারস্ট্রাকচার হল তার কার্য। বেস নামক ভ্যারিয়েবলের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় তার ফাংশন সুপারস্ট্রাকচার। অর্থনীতিই সেই ভিত্তি যার উপর সংস্কৃতি চেতনা মতাদর্শ এইসব নির্ভর করে।

সুপারস্ট্রাকচার $= f(\text{বেস})$

এবার পুঁজিবাদী সাম্যকে একটু বোঝার চেষ্টা করি আসুন, বেস এবং সুপারস্ট্রাকচারের নিরিখে। বাজারে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বসবাস করে এই সাম্য — আমরা আগেই বলেছি। অর্থাৎ, অর্থনীতির সাম্য। বেস। পুঁজিবাদী বাজার কিন্তু পুরো দাঁড়িয়ে আছে এই সাম্যের ধারণার উপর। নিজের সম্পত্তির উপর নিজের অধিকারের এবং নিজের সম্পত্তি নিজের ক্রয় বিক্রয়ের অধিকারের সাম্য। কিন্তু এই সাম্য নিশ্চিত হয় কী করে? কী ভাবে এটা গ্যারান্টি করা হয় যে পুঁজি সমাজে কেউ এই চুক্তি ভাঙবে না?

এই নিশ্চয়তাটা আসে আইনব্যবস্থা থেকে। আদালত তার আইন দিয়ে বিচার করে, এবং পুলিশ তথা প্রশাসন দিয়ে সেই বিচারবিধানকে কার্যকর করা হয়। এই আইন, আইনব্যবস্থা, সংবিধান, সমাজনীতি, এথিকস — এই পুরোটাই কিন্তু, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সুপারস্ট্রাকচারের এলাকা, সংস্কৃতির। তেলেভাজাওয়ালা এবং সম্রাট অশোকের কিসসাটা মনে করুন। বেস সুপারস্ট্রাকচারকে নিয়ন্ত্রণ করে, বেসই কারণ। অথচ আমরা দেখছি সেই বেসকে, বেসের পুরো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নিশ্চিত করে সুপারস্ট্রাকচার। অর্থাৎ? অর্থাৎ, বেস দ্বারা সুপারস্ট্রাকচারের একমুখী নিয়ন্ত্রণের গল্পে জল ছিল। কী হে সাক্ষী, মুরগীটা কত বড়? সাক্ষী তার হাত টানটান করে

উপরে তোলে, মাথার উপর, হাতের তালু দিয়ে উচ্চতাটা চিহ্নিত করে। বিস্মিত হন জজ, সাত ফুট দীঘল মুরগী? সত্যি কথা বলো। প্রফেশনাল সাক্ষী তার আগের মামলার দরজার উচ্চতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল। এবার নিজেকে সামলে, মাথা চুলকে বলে, নিচের হাতটা তো এখনো দেখাইনি ধর্মাবতার। মার্ক্সবাদেরও ক্রমে নিচের হাত দেখানোর দিন আসছিল। তার আন্ডারহ্যান্ড গোঁজামিল গুলো।

আলথুসের এলেন তার দর্শন নিয়ে। নিয়ে বেস আর সুপারস্ট্রাকচারের এই পারস্পরিক দ্বিমুখী বাইনারি সম্পর্কের জায়গায় আনলেন তার 'জটের জট' — কমপ্লেক্স অফ কমপ্লেক্স-এর তত্ত্ব। তিনি বেস-সুপারস্ট্রাকচার ডায়ালেক্টিক্স এর জায়গায় আনলেন ওভারডিটারমিনেশন, অতিনিয়ন্ত্রণ। সমাজ বাস্তবতাকে তিনি ধরতে চাইলেন তিনটে জট এর নিরিখে। এক, দি ইকনমিক, অর্থনৈতিক (খেয়াল করুন, 'ইকনমিক' বা 'অর্থনৈতিক' এখানে বিশেষণ নয় বিশেষ্য) মানে সারপ্লাস ভ্যালুর উৎপাদন, বণ্টন এবং আত্মীকরণ-এর গোটা পদ্ধতিটা (প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ সারপ্লাস ভ্যালু)। দুই, দি পলিটিকাল, রাজনৈতিক — ক্ষমতার উৎপাদন, বণ্টন এবং আত্মীকরণ। এবং তিন, দি কালচারাল, সাংস্কৃতিক — মিনিং বা অর্থের উৎপাদন, বণ্টন এবং আত্মীকরণ। (এটা কিন্তু হুবহু আলথুসেরের ছকটা না, বরং সেই ছককে রেজনিক-উল্ফ যেভাবে আলোচনা করেছিলেন সেইটা। পথিকৃৎদের কাজে সচরাচর খুব ভালো ফরমুলেশন বা ছক থাকেনা, যেমন প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা আজকের দিনের সবচেয়ে খারাপ ক্যালকুলাসের বই বলে গণ্য হবে।)

এবার, এই তিনটি জট ইকনমিক পলিটিকাল এবং কালচারাল — এদের জট হল সমাজবাস্তবতা। একটা অতিনির্ণীত সমগ্র। অতিনির্ণীত মানে এই তিনটি জটের প্রত্যেকটিই অন্য প্রত্যেকটির দ্বারা নির্ণীত এবং নির্মিত। এবার লক্ষ্য করুন, বেস এবং সুপারস্ট্রাকচারের সাম্য সংক্রান্ত ওই ঘাপলাটা কিন্তু হাওয়া হয়ে গেল। এখন তো আমরা জানি, ইকনমিকের মধ্যেই পলিটিকাল আছে, পলিটিকালের মধ্যেই কালচারাল, এবং কালচারালের মধ্যেই ইকনমিক। তাই বেস এর মধ্যেই সুপারস্ট্রাকচার থাকবে। সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যেই বেস। কোনো একটা দিয়ে অন্যটাকে নিয়ন্ত্রণের ধারণাটাই একটা বোকামি।কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানেও রয়ে যাচ্ছে, এই তিনটে জটের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কেন, দেবদেবী তো আসলে তেত্রিশ কোটি? এইবার আসে সেই ক্লোজার বা সমাপ্তির প্রশ্ন, কতদূর অব্দি আমি নিয়ে যাব আমার জেরা করার, ইন্টারোগেশনের মেলট্রেনকে, কতদূর নিয়ে যাওয়া আমার প্রয়োজন (এন্ট্রি-পয়েন্ট-এর আলোচনা মনে করুন)। আসলে এই একমুখী নিয়ন্ত্রণের বোকামিটা বড্ড বেশি দিন ধরে মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে তথা বিপ্লবী রাজনীতিকে শাসন করে আসছিল। শাসন করে আসছিল শিল্পের সঙ্গে চিন্তার সঙ্গে তত্ত্বের সঙ্গে মননের সঙ্গে মার্ক্সবাদী বিপ্লবের সম্পর্কটাকে। তথা যেকোনো সাংস্কৃতিক ক্রিয়া বিষয়ে বিপ্লবীদের মতামতটাকে। মার্ক্সবাদের ইতিহাসেই নিহিত ছিল এই প্রশ্নটা, অর্থনৈতিকের শাসন কতদূর মেনে নেবে সাংস্কৃতিক? এবং সেই জায়গা থেকেই এসেছিল এই ভাঙার প্রয়োজনটা। সমগ্র-ধারণার প্রসঙ্গে এবং উত্তরআধুনিকতার প্রসঙ্গে আমরা আবার এই প্রশ্নে ফেরত আসব।

আমরা এখানে সরাসরি আলথুসেরের কাঠামোটা হাজির না করে করলাম রেজনিক-উল্ফের মত করে। রেজনিক-উল্ফের রাজনৈতিক তত্ত্বকে ছোট একটা অভিধা দিতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম 'দে পোস্ট-আলথুসেরিয়ানাইজড গ্রামশি', অর্থাৎ, আলথুসেরের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের শরীরে কিছু বদল ঘটেছে, সেই বদল গুলো দিয়ে তারা গ্রামশির কিছু তাত্ত্বিক জায়গাকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, এবং উপনীত হয়েছিলেন তাদের নিজেদের তাত্ত্বিক অবস্থানে। যার মধ্যে মূলত আছে ওভারডিটারমিনেশন, ওপ্‌নিং অ্যান্ড ক্লোজার, এন্ট্রি পয়েন্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম। আলথুসের তার প্রাথমিক কতকগুলো যন্ত্রপাতি, যেমন ওভারডিটারমিনেশন, কন্ডেনসেশন, ডিসপ্লেসমেন্ট — এগুলো পেয়েছিলেন ফ্রয়েডের অ্যানালিসিস অফ ড্রিমস থেকে।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে বুঝতে গিয়ে কন্ডেনসেশন ডিসপ্লেসমেন্ট ওভারডিটারমিনেশনের কথা বলেছিলেন। ধরুন, স্বপ্নে আমি পরপর অনেকগুলো ছবি দেখলাম, কোনো বাড়ি, সেই বাড়ির কার্নিশে গাছ উঠেছে, একটা রাস্তা, রাস্তার উপর পড়ে আছে কমলালেবুর খোসা, ইত্যাদি। মনে করুন, এই সব গুলো ছবি মিলে আমার ফেলে আসা শৈশব নিয়ে বেদনাকে হাজির করছে। তাহলে, আমার ফেলে আসা শৈশবের বেদনাকে হাজির করার প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে এই সমস্ত ছবি, তাদের কনডেনসেশন ঘটেছে। আমার শৈশবের বেদনা স্থানান্তরিত রকমে হাজির রয়েছে এই ছবিগুলোয়, ওই মনোভঙ্গীটার ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে। আর এই ছবিগুলোর প্রক্রিয়া ভাবুন। যেই বাড়ি দেখলাম, তার সঙ্গে মিলিয়ে এল বাড়ির কার্নিশের গাছ, আবার মূল জায়গাটার থেকেই গজালো একটা রাস্তা, যা আবার হয়তো ছোটবেলায় দেখা কোনো বাড়ির পাশেই ছিল, আবার বেদনা হাজির করলো নিজেকে ফটফটে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা

কমলালেবুর খোসা। আবার কমলালেবুর খোসা তার তাজা গন্ধ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শৈশব। সবটা মিলিয়ে প্রতিটা ছবিই অন্য প্রতিটি ছবির দ্বারা নির্ণীত। এটাই ওভারডিটারমিনেশন।

আর ইন্টারপিলেশন সাবলিমেশন অফহেবুং এগুলো এনেছিলেন ইপোলিত এবং তার পরবর্তী দর্শন এবং মনোসমীক্ষণ চর্চার জগত থেকে। তাকে আবার নিজেদের মত করে বদলে নিয়েছিলেন রেজনিক এবং উল্ফ। এই তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি গুলো আমরা অনেকটাই এনেছি আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন-এ। এখানে আর সেগুলো আনছি না।

১৯।। সমগ্র এবং গ্রামশি

সেকশন ৭-এ পূর্ণতার রূপকথা নিয়ে আলোচনা করার পরে সেকশন ৮-এ হেগেল আলোচনার সময়েই আমার এই বিষয়ে দুচারটে কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ভয়ানক শীত, তার উপর এমন রেস উইথ টাইম করে লেখাটা লিখতে হচ্ছে, এই জন্যেই অর্ডারি লেখা লিখতে নেই। যাকগে, হেগেলের 'সমগ্র' নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

দিস এবং দ্যাট-এর, ইউনিটি এবং ডিফারেন্স-এর, পজিটিভ এবং নেগেটিভ-এর ডায়ালেক্টিক্স-এর ভিতর দিয়ে নড়তে নড়তে আমরা যখন চূড়ান্ত অবস্থা এসেন্স এবং অ্যাপিয়ারেন্স-এ পৌঁছচ্ছি তখন এসেন্স-অ্যাপিয়ারেন্স-এর এই মোট বাস্তবতাটাকে আমরা ডাকছি ইউনিভার্সাল বা সমগ্র বলে। এসেন্স সেই সমগ্রের প্রতিনিধি, এবং অ্যাপিয়ারেন্স বা থিং-রা হল সেই সমগ্রের অংশ। এখানে এই পূর্ণ এবং অংশের, হোল এবং পার্ট-এর সম্পর্ক নিয়ে একটা কথা বলার আছে। এই সম্পর্ক হতে পারে দু রকমের। এক, আপতিক বা কন্টিনজেন্ট। এবং দুই, জরুরি বা নেসেসারি। যেমন একটা ক্লাব, সেই ক্লাব একটা পূর্ণ, আপনি তার সভ্য, অর্থাৎ অংশ। কিন্তু এখানে পূর্ণ-অংশ সম্পর্কটা আপতিক। আপনি মেম্বার আর নাও থাকতে পারেন সেই ক্লাবে। তখন আপনি আর ওই পূর্ণের অংশ নন। কিন্তু অন্য আর একটা পূর্ণ ভাবুন, সমাজ-বাস্তবতা, সেখানে পূর্ণ এবং অংশের সম্পর্কটা জরুরি, নেসেসারি। এটা রদ হওয়া সম্ভব না।

তাহলে, হেগেলের মডেলটা খুব মোদ্দা কথায় (কল্যাণীর জয়ন্তদা আমায় বলেছিল, ওসব কচকচি রেখে মোদ্দা কথায় বলো তো!) দাঁড়াল এরকম — ইতিহাস জুড়ে সমাজ বাস্তবতা নড়তে নড়তে একটা শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছলো, সেটা চূড়ান্ত, আর কোনো বদল ঘটার না, সাম্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই পুঁজি সমাজে। এই সমাজে একটা সমগ্র বা ইউনিভার্সাল বিরাজ করছে, যাকে আমরা বুঝব তার এসেন্স দিয়ে। এই এসেন্সই প্রকাশিত সেই সমগ্রের বিভিন্ন অংশে, অ্যাপিয়ারেন্সে। অ্যাপিয়ারেন্স তাই এসেন্সের অ্যাপিয়ারেন্স হওয়ায় আমরা এসেন্স বোঝা মাত্রই অ্যাপিয়ারেন্সকে বুঝে ফেলব। গোটা বাস্তবতাকে। এবং যেহেতু ইউনিভার্সাল মানে সমগ্র বিরাজ করছে, সবকিছুই তার ভিতরে আছে। তার বাইরে আর কিছু নেই, তাই আমাদের এই এসেন্স-অ্যাপিয়ারেন্সকে বোঝার পর বোঝার আর কিছু বাকি থাকবে না। সব রহস্য শেষ, খেল খতম, পয়সা হজম। (এর চেয়ে খারাপ হেগেলের সামারি আর করা যায় না, এটা একদম যার-পর-নাই খারাপ।)

আসুন, এই একই বিকট পদ্ধতিতে একটু মার্ক্স-এর মডেলটাও বলে নেওয়া যাক। এখানে ডায়ালেক্টিক্সটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিটের, মূর্ত আর বিমূর্তের, পণ্যের ইউজ ভ্যালু আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর। পণ্যেরা হল অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার তাদের এসেন্স। সেই এসেন্স মূর্ত হয়ে উঠছে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ ভ্যালুতে, বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন দামে, কারণ আলাদা আলাদা পণ্যে সেটা আলাদা আলাদা পরিমাণে উপস্থিত। তাই অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার নামক এসেন্সের মূর্ত রূপ বা অ্যাপিয়ারেন্স হল ওই পণ্যেরা। ইউজ ভ্যালু আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর ডায়ালেকটিক্স টা তার উপরের স্তরে আর একটা ডায়ালেকটিক্স-এর জায়গা করে দিল, পণ্য আর অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার হল সেই এসেন্স যা অ্যাপিয়ার করে অ্যাপিয়ারেন্স-এ, থিং-দের মানে পণ্যদের ভিতর, পণ্য রূপে। অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার আর পণ্যেরা মিলে তৈরি হল সেই সমগ্র, ইউনিভার্সাল। যেখানে মিশেছে নানা স্তরের ডায়ালেক্টিক্স। একটা হল পণ্যের স্তরে — মূর্ত আর বিমূর্ত, কংক্রিট আর অ্যাবস্ট্রাক্ট, ইউজ ভ্যালু আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। অন্য আর একটা স্তরে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্তরে (সেকশন ১০) ইতিহাসের গতি বরাবর পুরোনো আর নতুনের লড়াই। থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের ডায়ালেক্টিক্স, যেমন পুঁজি সমাজের ক্ষেত্রে প্রাক-পুঁজি মানে সামন্ততন্ত্র হল থিসিস, তাকে আক্রমণ করছে অ্যান্টিথিসিস মানে ভ্রূণ পুঁজিতন্ত্র, তৈরি হচ্ছে পূর্ণ পুঁজিতন্ত্র। ইউনিভার্সাল মানে সমগ্র আকারে দেখা দিচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। আর একটা ডায়ালেক্টিক্স হল শ্রেণীর। শ্রমিক শ্রেণী আর মালিক শ্রেণীর ডায়ালেক্টিক্স। এই স্তরে স্তরে পরতে পরতে ডায়ালেক্টিকাল সমগ্রের ডায়ালেক্টিকাল বস্তুবাদ মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

মার্ক্সবাদকে নিয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুললেন গ্রামশি। সেটা এই সমগ্র বা ইউনিভার্সালের বিবর্তনের বিষয়ে। রাজনৈতিক পৃথিবীতে তার অভিজ্ঞতায় দাঁড়িয়ে গ্রামশি দেখলেন, এই সমগ্র যে বাধ্যতামূলক ভাবে ঘটবেই এর কোনো মানে নেই। পুঁজি সমাজে ক্রমগজায়মান ভ্রূণ পুঁজিতন্ত্রের থিসিস যদি দেখে যে তার অ্যান্টিথিসিস যথেষ্ট শক্তিশালী বা পরিস্থিতি আমূল রূপান্তরের পক্ষে খুব একটা সহজ নয়, তখন সে তার অ্যান্টিথিসিসকে পরিপূর্ণভাবে নাকচ করার আর কোনো চেষ্টাই করবে না। সে বরং মাঝামাঝি একটা সমাধান নেবে। আদত বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী ইউনিভার্সালে পৌঁছনোর চেষ্টা না করে সে একটা কাজ-চালানো সমগ্র, সারোগেট ইউনিভার্সাল বানিয়ে তুলবে। সেখানে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস তাদের পুরোনো চেহারায় না থেকে একটু একটু বদলে গেছে। বদলে গেছে মানে কী? মানে এই যে পুরোনো রকমে দেখলে, থিসিস বা ভ্রূণ পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে অ্যান্টিথিসিস বা সামন্ততন্ত্রের সম্পর্ক শত্রুতার। সেই চিরাচরিত শত্রুতার থেকে বেরিয়ে এসে কোনো কোনো জায়গায় তারা কাজ চালানো বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে নেবে।

এক্ষেত্রে একটা বেশ ভালো উদাহরণ মাথায় আসছে আমার — সিপিআইএম-এর পার্টি কর্মসূচী। সেখানে বলা হল, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের মূল শাসককুল মানে ব্যবসায়ী পুঁজিপতি শ্রেণী তারা দেখল যে যদি সামন্তব্যবস্থা পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে যায় দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে তো সেই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় যে রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হবে তা পুরোপুরি আর নিয়ন্ত্রণ করা নাও যেতে পারে, এবং সেই রাজনৈতিক উত্তাপে এমনকি শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি ব্যবস্থারও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। তাই সে একটা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করল, গ্রামাঞ্চলে সামন্ত জমিদার প্রভুদের সে তাদের পুরোনো আকারেই রয়ে যেতে দিল, এবং শহরের শিল্পাঞ্চলে সে নিজের রাজত্ব কায়েম রাখল।

সিপিআইএম কর্মসূচীতে যেভাবে ভারতের চালু রাজনৈতিক ইতিহাসটাকে দেখা হল এটা সে অর্থে গ্রামশির তত্ত্বের একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে। এবং একটা মজা দেখুন, আমি নিশ্চিত যে যে ভাবে যে পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচী এসেছিল তাতে গ্রামশির তত্ত্বের সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচয়টা অসম্ভব। আসলে তাদের কোনো তত্ত্বশিক্ষার প্রয়োজন পড়েনি। এটা বাস্তব রাজনৈতিক ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে এসেছিল, তখনো রাজনৈতিক কর্মীদের চিন্তার সঙ্গে কর্মসূচীর সম্পর্কটা বেঁচে ছিল। সুন্দরাইয়ার লেখা 'হোয়াই আই রিজাইনড ফ্রম দি জেনেরাল সেক্রেটারিশিপ অ্যান্ড পলিটব্যুরো অফ দি সিপিআইএম' বলে আমি একটা লেখা পড়েছিলাম, পুস্তিকা আকারে। তার মধ্যে এমনকী, যতদূর মনে পড়ছে, গ্রামশি-পরবর্তী রাজনৈতিক তত্ত্বেরও কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, গ্রামশির তত্ত্বে এই ইঙ্গিতটা এলো যে ইউনিভার্সাল তার চিরাচরিত রকমে নাও ঘটতে পারে। এমন ইউনিভার্সাল তৈরি হতে পারে যেখানে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস দুজনেই বদলে গেছে, দুজনেই অন্যের কিছু কিছু জায়গা গ্রহণ করেছে, ফলত, থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এর মধ্যে এখন অনেক জায়গাতেই মৈত্রীর সম্পর্ক সম্ভব। পুরোনো ইউনিভার্সালের জায়গা নিচ্ছে এখন সারোগেট ইউনিভার্সাল বা ক্ষেত্রজ ইউনিভার্সাল (মহাভারতে ক্ষেত্রজ পুত্র হলেন পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র এরা, যাদের বৈধ মাতাপিতার বৈধ সঙ্গমে বাচ্চা না আসায় অন্য পুরুষের ঔরসে গর্ভে আনা হয়েছিল)।

গ্রামশির তাত্ত্বিক অবস্থানকে আর এক ভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়, চিরাচরিত ট্রাডিশনাল মার্ক্সবাদ শুধু সরল ভূমি বা সিম্পল স্পেসকেই চিনত। যেখানে স্বাভাবিক থিসিস স্বাভাবিক অ্যান্টিথিসিসকে নাকচ করে, তৈরি করে সিন্থেসিস। চিরাচরিত রূপান্তর বা ট্র্যানজিশনের মডেল, যেখানে নয়া পুঁজিতন্ত্র সামন্ততন্ত্র সহ অন্যান্য সব প্রাকপুঁজি ব্যবস্থাকে নাকচ করে — তৈরি হয় নিখুঁত পুঁজিতন্ত্র। নিখুঁত ইউনিভার্সাল।

এবার, গ্রামশি পরবর্তী চিন্তা খুঁতকেও ভেবে নিতে শিখল। এটাকে আমরা বলছি জটিল ভূমি বা কমপ্লেক্স স্পেস। যেখানে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস তাদের পুরোনো চেহারায় আর থাকছে না, দুজনেই অন্যের কিছু কিছু জায়গাকে মেনে নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে কমপ্লেক্স স্পেস। যেখানে ইউনিভার্সালটা সারোগেট।

এরপর, আমাদের তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে আমরা আর একরকমের ভূমিকে বলব। সেটা কৃত্রিম ভূমি বা সিন্থেটিক স্পেস। তার আগে একটু হেজেমনি নিয়ে বলে নেওয়া যাক। গ্রামশির মূল হেজেমনি বা নিয়ন্ত্রণের ধারণাকে অন্য অনেকে অন্য অনেক ভাবে বুঝতে চেয়েছেন। যার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকার লাকলাউ-মুফের। তারা গ্রামশির হেজেমনির ধারণাকে উত্তরআধুনিক তত্ত্বের জগতে নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে যাব না আমরা।

ক্ষমতা বা পাওয়ার থাকা মানেই তার একটা নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনিও থাকা। নইলে পাওয়ার কী ভাবে পাওয়ার হয়ে ওঠে? গ্রামশি 'হেজেমনি' এই শব্দটা দিয়ে একটা পদ্ধতিকে ধরতে চেয়েছিলেন। গ্রামশি এই হেজেমনিকে আলোচনা করেছেন পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই। এই সত্যটুকু বারবার নানাজনেই আলোচনা করেছেন যে একটা যুগের শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীই শাসিতশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে পড়ে। মালিকের চিন্তা দিয়ে তৈরি হয় শ্রমিকের চিন্তার অবয়ব। সমাজের ক্ষমতাসীন অংশের চিন্তাধারাই সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকেই শাসন করে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে পুঁজি সমাজের ক্ষমতাসীন অংশের চিন্তাধারা সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকে, তার মনকে মননকে শাসন করে, সেই পদ্ধতিটাকেই গ্রামশি নাম দিলেন 'হেজেমনি'। ধরুন, আমরা তো এইমাত্র একটা ইউনিভার্সালের কথা বললাম। যে ইউনিভার্সাল বা সমগ্র সর্বব্যাপী। সর্বত্রগামী তার শাসন। কিন্তু কী দিয়ে কোন সূত্রে এই সর্বব্যাপী শাসনটা গজিয়ে ওঠে? কী করে একটা ভাতের মধ্যেই হাঁড়ির সম্পূর্ণ গতিধারাটা হাজির থাকে? সেটা এই হেজেমনিকে দিয়ে। হেজেমনি মানে আমাদের মন মনন চিন্তাপ্রক্রিয়ার উপর শাসন। শাসকশ্রেণীর শাসন। যে মন বা চিন্তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে তাকে আমাদের মাথার ভিতরে গজিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া। হেজেমনির শিকল আমাদের মনগুলোকে এক জায়গায় বেঁধে রাখে। সেই অর্থে একটা হেজেমনির কথা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি। হেগেলের নাগরিক তার রাষ্ট্রকে বহন করে তার নৈতিকতায়, তার অ্যাবস্ট্রাক্ট মরালিটি প্রিন্সিপল-এ, এটাই সেই হেগেলীয় সমগ্রের হেজেমনি। এই হেজেমনি ধারণাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে, পরে, ঔপনিবেশিক শাসনের চূড়ান্ত হয়ে ওঠার সাফল্য বা বিফলতার আলোচনায়। (একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন, হেজেমনি ধারণার মধ্যেই কিন্তু রয়ে গেছে একটা সমগ্র বা ইউনিভার্সালের ধারণা। তাই, ওই সমগ্র বা ইউনিভার্সালের ধারণাই পরে যখন নাকচ করা হল, তখন এই হেজেমনি ধারণাকেও এসেনশিয়ালিজম-আক্রান্ত বলে আখ্যা দেওয়া হল। আমরা পরে আসছি এখানে।)

২০।। মার্ক্সবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়া

এবার দেখা যাক, আলথুসের আর গ্রামশির তত্ত্ব কী ভাবে পুরোনো মার্ক্সবাদী চিন্তাপদ্ধতিকেও বদলে দিচ্ছিল। প্রথমে দেখা যাক, মার্ক্সবাদী চিন্তাপদ্ধতি কীভাবে সমগ্র-ধারণার উপর নির্ভর করে। মার্জিন অফ মার্জিন বিষয়েই অন্য একটা প্রবন্ধে জিজেকের একটা লেখা থেকে কোট করেছিলাম, বাংলা অনুবাদে। তার প্রথম প্যারাগ্রাফটা আর একবার এখানে কোট করছি ।

"আমরা যদি এই ভাসমান দ্যোতকগুলোকে 'কমিউনিজম'-এর 'লেপ' দিয়ে ঢাকি, উদাহরণ হিশেবে বলা যায়, এই 'শ্রেনী সংগ্রাম'-ই তখন অন্য প্রতিটি দ্যোতক-কে, সিগনিফায়ার-কে, অভিষিক্ত করে এক একটা সুনির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত অর্থে — 'গনতন্ত্র'-কে (তথাকথিত 'যথার্থ গনতন্ত্র' বলে একটা নয়া অর্থকে দাঁড় করানো হয় 'বুর্জোয়া প্রাতিষ্ঠানিক গনতন্ত্র'-র বিপরীতে, যা শ্রেনী-শোষণেরই আর একটা আইনসম্মত উপায়) 'নারীবাদ'-কে (নারীর শোষণ যা শ্রেনীবিভক্ত সমাজের শ্রমবিভাজন থেকে উপজাত) 'পরিবেশবাদ'-কে (মুনাফালোভী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফলশ্রুতি প্রাকৃতিক সম্পদের এই ংসসাধন) 'শান্তি-আন্দোলন'-কে (শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ) ইত্যাদি।"

অর্থাৎ, মার্ক্সবাদী বিপ্লববাদ বা কমিউনিজম শ্রেণী-সংগ্রাম (মানে শ্রমিক শ্রেণী আর মালিক শ্রেণীর ভিতরকার সংগ্রাম, আমরা আগেই বলেছি, খেয়াল রাখবেন, এর মানে দুই গুচ্ছ লোকের মধ্যে ফাইট না, দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংগ্রাম) দিয়েই অন্য সবকিছুকে বোঝে। তখন সে তার চারপাশে যে গনতন্ত্রকে দেখে তাকে ভুয়ো বলে মনে করে, যেখানে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো হয় আসলে শ্রেণী-শাসনকেই চালু রাখতে। যেমন সে মনে করে এই পার্লিয়ামেন্টারি ডেমক্র্যাসি বা সাংসদীয় গনতন্ত্র কখনোই সঠিক গনতন্ত্র নয়, কিন্তু সেটাকে সে কাজে লাগায় মানুষের কাজে লাগাতে, মানুষের কাছে ন্যূনতম কিছু রিলিফ পৌঁছে দিতে।

(কী রকম পাঁঠা ছিলাম আমরা তার একটা উদাহরণ বলি আপনাদের। এই জনগনকে রিলিফ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টা পার্টি কর্মসূচীতে একটা ধারা হিশেবে উল্লেখিত ছিল, যদ্দূর মনে পড়ছে ১১২ ধারা, সেটার যথার্থতা অযথার্থতা নিয়ে আমরা কত তর্কাতর্কি করেছি, সংসদীয় গনতন্ত্রে আমাদের অংশ নেওয়া উচিত হচ্ছে না অনুচিত হচ্ছে। এখন আমার এক বাচ্চা বন্ধু আছে, রেখা বলে, সিপিআইএম করে, যথেষ্ট ভালো এবং সত পার্টিকর্মী, ওকে একদিন জিগেশ করেছিলাম এই ধারাটা নিয়ে, ও জানেইনা, এবং তা নিয়ে ওর কিছু এসেই যায় না, আমাদের চেয়ে ও অনেক ম্যাচিওরড, ওই প্রশ্নগুলোই এখন নিরর্থক হয়ে গেছে। রাজনীতি মানে যে এই ভোট এমএলএ এমপি আর ভূরি ভূরি মন্ত্রী উৎপাদন এর বাইরেও কিছু হয়, এই কদিন আগেও ছিল, আজ ভাবলে বিশ্বাসও হতে চায়না। আমরা বি টি

রনদিভে পার্টিতে ফেরত আসার পর, এই তো বিপ্লবের ডাক দিলেন বলে এরকমও ভাবতাম, কী গাধাই না ছিলাম আমরা।)

এবং সংসদীয় গনতন্ত্রকে ব্যবহার করে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে সেই রিলিফ সে এই কারণেই দিতে চায় যে এর মধ্যে দিয়ে সে শ্রেণী লড়াইকেই বাড়িয়ে তুলবে। অর্থাৎ গনতন্ত্রটা এখানে শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা হাতিয়ার। নারীর শোষণকে সে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রমবিভাজন থেকে উপজাত একটা সমস্যা বলে মনে করে। তাই শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণীমুক্তি ঘটলে, অর্থাৎ শোষণহীন সমাজবাদী সমাজ গঠিত হলে এটা অটোমেটিকালি উবে যাবে বলে মনে করে, শ্রেণী-সংগ্রামের বাইরে নারীবাদ তার কাছে আলাদা কোনো গুরুত্ব পায়না। ঠিক একই রকম ভাবে ভেবে নিন পরিবেশবাদী আন্দোলন বা শান্তি আন্দোলন বা সমকামীদের আন্দোলনকেও।

এরকম সে ভাবে কারণ সে কেন্দ্রিকতার মডেলেই ভাবতে অভ্যস্ত। আমাদের ধর্ম সম্মন্ধে বা ভাববাদ বস্তুবাদ সম্মন্ধে আলোচনাগুলো মনে করুন। এক ভগবান সব কিছুর উৎস। তাই যা ভগবানের পক্ষে তা সবই ভালো। হেগেলের ভগবান হল এসেন্স। সেই বিরাজ করছে সব অ্যাপিয়ারেন্স জুড়ে। অ্যাপিয়ারেন্স-এর পুরো বাস্তবতাটা হল এসেন্সেরই নানা স্তরের লীলা খেলা। এবং সব মিলিয়ে একটা সমগ্র ভুবন। একটা ইউনিভার্সাল। যেমন, ঈশ্বরবাদীর কাছে কোনো কিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টির ও ক্ষমতার বাইরে নয়। পূর্ণমদং পূর্ণমিদং ইত্যাদি। মার্ক্সবাদের ঈশ্বর অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার। যারই মর্ত মানে মূর্ত রূপ শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীই শাসন করবে। কিন্তু দেবতা তো সবাই তাই বলে সবাই তো আর বিষ্ণু-নারায়ণ নন, এখানেও কেন্দ্রিকতা। কমিউনিস্ট পার্টিই সেখানে কেন্দ্রীয় এবং মূল, ইতিহাসের সচেতন কর্তা। আর সবাই হয় কর্ম, নয় অচেতন।

এই অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারকে যেই আমি বুঝে ফেলব, তার সমস্যার সমাধান করে ফেলব, আর সবকিছু আপনা থেকে ঘটে যাবে, তিনিই ঘটাবেন। ধর্ম শাস্ত্রে যেমন তেমনি হেগেল আর মার্ক্স-এও মৃত্যুভয়ের মেটোনিম আর তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার শেষ মোক্ষে পৌঁছে যাওয়ার বাসনার মেটাফর। হেগেল কেন এত উৎসুক ইতিহাসের চূড়ান্ত দেখে ফেলার আকাঙ্খায়, মাতৃগর্ভের আদিম আরামে পৌঁছনোর উচ্ছ্বাস? কেন এই ফ্যান্টাসি নির্মাণ? চূড়ান্ত সাম্যের? গীতার শ্লোকে শ্লোকে যেমন অর্জুনকে বারম্বার বোঝাচ্ছেন কৃষ্ণ কী করলে সে চির হবে, নিত্য হবে। কেন এত চির হওয়ার বিষয়ে নিত্য হওয়ার বিষয়ে উৎসুক কৃষ্ণ? তার মৃত্যুভয়ের পরিবর্তিত আকার? মার্ক্সও কেন এত কল্পনার গরু গাছে তুলতে চাইছেন কমিউনিজমের ফ্যান্টাসিতে? তুলছেন মানে কী, কোন ডালে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তার ক্ষুর থাকবে, কোন দিকে কতটা ঔদাসীন্যে ডাগর নয়ন মেলে সে হাম্বা বলবে, সেই হাম্বায় কী কী নোট লাগবে তারও স্বরলিপি করে দিতে চাইছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে গাছের মুখে জাস্ট কয়েক পা হাঁটার পরেই গরুর পেটে বায়ু হচ্ছে, বায়ু উর্দ্ধমুখী হয়ে যাচ্ছেতাই সব কেলেঙ্কারি ঘটাতে শুরু করছে। সমাজবাদের এঁড়ে (নারীবাদীরা বকনাও বলতে পারেন) যেখানে সেখানে পা ছেদড়ে পড়ছে মুখ থুবড়ে।

হেগেল মার্ক্স-এর এসেন্সের লেভেলে কন্টিনুয়িটি বা ধারাবাহিকতার জায়গায় খুব চালু পপুলার হিন্দু পজিশনগুলোও বরং অনেক বেশি রকমে পরিবর্তনের গতিধারা বা ডিনামিক্সকে ধারণ করতে পারে। ধরুন, গীতার অবতারবাদের সেই খুব চালু শ্লোকটা — পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম/ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। দেখুন, লক্ষ্য করুন — নারায়ণ সেই এসেন্স যে অ্যাপিয়ার করে জীবে বস্তুতে। বস্তুর রূপান্তর ঘটে। জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। শুধু এই অ্যাপিয়ারেন্সই রিঅ্যাপিয়ার করে তাই নয়, এসেন্সও রিঅ্যাপিয়ার করে, অবতারে। সসীম বা ফাইনাইট সেই অবতারদের সুস্পষ্ট জন্ম এবং মৃত্যু আছে। অবতারদের নানা বর্গভেদ আছে, অংশ-অবতার, গুণ-অবতার, শক্তি-আবেশ অবতার, অবতারদের এই প্রকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে আছে বিবিধ ধরনের বিভিন্ন রীতিবিধি, মানে সীমা বা লিমিট। পশ্চিমী এসেন্সদের মত সীমাহীন বা লিমিটলেস নয় তাদের ক্ষমতা। (লিখতে লিখতেই মনে হচ্ছে, এমন নয় তো যে পশ্চিমের বারংবার অ্যাবসলিউট মনার্কির অভিজ্ঞতা এবং উল্টে আমাদের ইতিহাসে কখনো কোনো সাম্রাজ্যে এমনকি আমাদের দেশের ভূগোলটাও পরিমিত না হয়ে ওঠা, এর কোনো প্রভাব আছে এসেন্স-ধারণাগুলোয়?) এবং কোথাও কোথাও অবতাররা কৃত্রিম বা মিশ্র সত্তার জয়েন্ট ফ্রন্টের ধারণাকেও হাজির করে, যেমন বৈষ্ণবমতের অন্তত গৌড়ীয় ধারায় চৈতন্যকে দেখা হয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল অবতার হিশেবে। ডুয়াল সেল্ফ, যৌথ সত্তা, ভারি ইনটারেস্টিং সেটা — চৈতন্যচরিতামৃতকার লেখক দার্শনিক কৃষ্ণদাসের সেই আলোচনা। এবং হিন্দু দর্শনের এই এসেন্সের রিঅ্যাপিয়ার করার ক্ষমতার তথা যে কোনো ক্ষমতারই কিছু লিমিটও আছে, সত্য

ত্রেতা দ্বাপর কলি এগুলো খুব সুনির্দিষ্ট কিছু ব্রেক, ছেদ। হেগেলের মার্ক্সের এসেন্সের আকার এ তুলনায় অনেক আড়ষ্ট।

এবং, এই আড়ষ্ট আর কেন্দ্রিকতা আক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে সমাজ বদলের অটুট রূপরেখা খোঁজা অনেকটা জোর করে মানানোর মত, কহোনা ইয়ে বিপ্লবী মডেল হ্যায়, সেখানেও তো সেই একই ফ্যান্টাসি। ঢেউয়ের ঘনঘটা পেরিয়ে, গর্জনরত পবন পেরিয়ে, উন্মাদগতিতে 'গগন সে দূর' সেই এলডোরাডো দ্বীপের দিকে যেতে যেতে আমিশা জিগেশ করেছিল, ওঁহা কেয়া পেয়ার মিলেগা? চমন কেয়া ফুল খিলেগা? যিসে দিল ঢুন্ড রহা হ্যায়, কেয়া ও দিলদার মিলেগা? গানের তালেই উত্তর দিয়েছিল সেই ক্রান্তিযাত্রার ঋত্বিক, 'ওঁহা সাচ হোঙ্গে সপনে/ বনেঙ্গে গয়ের ভি অপনে/ দিলকি বারাত সাজেগি/ মিলেঙ্গে সাজন আপনে ... যানা বহোত হ্যায় দূর' তখনো পুরো সন্দেহ না মেটায় আমিশা আবার জিগেশ করেছিল সেদেশে কী ঘটবে তাই নিয়ে, আবার তাকে আশ্বস্ত করে উত্তর এসেছিল, এ হল সেই দেশ যেখানে 'পেয়ার হি পেয়ার হ্যায়'। একে আপনি এবার মেলান কতকগুলো আর্কিটাইপের সঙ্গে, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...', বা, 'কমরেড লেনিনের আহ্বান/ চলে মুক্তি সেনাদল ... ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান ...', বা জন লেননের ইমাজিন? এবং শেষ অব্দি কোথায় পৌঁছবে? সেই দেশ, যেখানে কোনো দ্বেষ হিংসা কিছু নেই, প্রত্যেকেই মেনে নেবে এটা যে যার প্রয়োজন বেশি সে বেশিই পাবে, এবং সেই প্রয়োজনের ধারণা নিয়ে কোনো ক্যাঁচালও হবেনা, যেখানে পেয়ার হি পেয়ার হ্যায়।

সব শুনে একটা কথাই বলার থাকে, একই ফ্যান্টাসির কুমীর ছানা আমাদের কতবার দেখাবে প্রভু? আমরাও 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' বা 'চিরসখা ছেড়ো না মোরে' গাইতে গাইতে প্যারেড করতে করতে চলে যাব? তার চেয়ে এসো, অ্যাজ এ চেঞ্জ, আমরা একটু বড় হয়ে দেখি। দুর্গম অন্ধকারে কোনো পিতামাতা আমাদের সেখানে রক্ষা করার নেই। এমন কী, সে অর্থে আমাদের কোনো পরিকল্পিত আরব্ধও নেই, সমগ্র নেহ। সেই সমগ্রে পৌঁছনোর হোয়াইট পেপার আর প্ল্যান অ্যাপ্রেইজাল নেই। কোনো চূড়ান্ত সাম্য নেই, কোনো চূড়ান্ত সত্য নেই, শুধু তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে। এর পরের লাইনে যে ঘোষণার অ্যাসারশন, তবু প্রাণ নিত্য ধারা, আছে সূর্য চন্দ্র তারা — এই ধ্রুবটুকুও জানিনা আর। হতেই পারে ধুমকিতে আছি, এর পরে অন্য কিছু মনে হবে, কিন্তু এখন তো এরকমই মনে হচ্ছে, অতো নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানিনা ভাই। এই পৃথিবীতে কোনো নিশ্চয়তা নাই — এরকমটাও বলতে পারিনা, কারণ, হতেই তো পারে যে অন্য কারো কাছে নিশ্চয়তা আছে। অত জানব কী করে? শীতে আমার পা ঠান্ডা লাগলে শরীরের দিকে গুটিয়ে আনি, আর গরম লাগলে চাদর সরিয়ে দিই। যদি দেখি কেউ চাদর সরাতে দিচ্ছে না, তার সঙ্গে ক্যালাকেলি করি। এসো ভাই এখান থেকে শুরু করা যাক। আমি জানি যে আমার কোনো চূড়ান্ত সত্য নেই, এবং তোমার কাছে কোনো চূড়ান্ত সত্য আছে বলে যদি তুমি ঘোষণা করো, তাও আমি মানি না, কারণ আমি তো সেটা জানিনা।

ধর্মের থিয়োরির ক্ষেত্রে আমরা কী বলেছিলাম সেটা মনে করুন — মৃত্যুভয় এবং অমর হতে চাওয়া। অমরতার অনড়তার আরামে ফিরে যেতে চাওয়া। একটা স্তরে পৌঁছেই হেগেল থেমে যাওয়ার কথা বলছেন, সেটাই মানুষের চূড়ান্ত পাওয়া, এই বলে। মার্ক্স দেখালেন সেটা গুলবাজি। মার্ক্স বললেন আর একটা স্তরের কথা, সেখানেই মানুষের চূড়ান্ত পাওয়া, মানে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত। কাব্য করে বললেন সেখানেই মানবসমাজের প্রাগ-ইতিহাসের শেষ। কেন এই কোনো একটা স্তরে পৌঁছে থেমে যেতে চাওয়া? যেখানে আর কোনো বদলের নেই, মানে অনড়তার আরাম? কেন? অমর হতে চাওয়া? আর কেন এই ফ্যাসিজম যে সবকিছুই আমি আমার মডেলে বুঝে ফেলব, তার পর আর কিছু বোঝার থাকবে না? নিজেকে নিশ্চিত বলে এই ঘোষণা করতে চাওয়া? মৃত্যুভয় আর অমরতা?

তার চেয়ে এই জায়গা থেকেই শুরু করা যাক না, কোনো স্থিরতা কোনো নিশ্চয়তা নেই, কোনো চূড়ান্ত সাম্যই কখনো হতে পারে না, কেবল হয় আর একটু বেশি সাম্য, বা আর একটু কম সাম্য? বা, এমনও তো হতে পারে, যে সাম্যের এই মাপকাঠিটাও পূর্ণতার ওই ধারণার মতো আর একটা ছেলেভোলানো রূপকথা। মানা যাকনা যে আমরা আর ছেলেমানুষ নই, অন্ধকারে পথ হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার মত আর কোনো পিতামাতা দরকার নেই আমাদের? মানা যাক না, কোনো ঈশ্বরই নেই?কোনো ঈশ্বর, তার নাম যাই হোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বর, বা এসেন্স, বা অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার। বা ইকুয়ালিটি। দেখা যাক এই রূপকথা তাড়ানোর প্রক্রিয়াটা কতদূর টেনে নেওয়া যায়।

২১।। আওয়ার গডস, দেয়ার গডস

বদলি ভাবনাচিন্তার মডেল ভাবতে শুরু করার গোড়ার ধাক্কাটা আমার ক্ষেত্রে এসেছিল অজিতদার থেকে। উননববইয়ের গোড়ায় সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর একটা সেমিনারে অজিতদা আওয়ার গডস দেয়ার গডস লিখেছিল। তার কদিন আগে পরে লিখেছিল অন ইনইকুয়ালিটি, কোথায় সেটা ভুলে গেছি। সেই সেমিনারে আমি গেছিলাম, আমার হাতে যেকটা আঙুল সারাজীবনে সেমিনারে গেছি তার চেয়েও কম। কিন্তু মনে হয়না আমার আকাশছোঁয়া মূর্খতা তাতে আর একটুও বেড়েছে — অ্যাকাডেমিকতা মানে যে কী ওই সেমিনার ছিল তার একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। কিছু প্রশ্ন এমন এসেছিল। অজিতদা তার কবছর আগে থেকেই এই কথাগুলো বলে আসছিল, শারদীয়া অনুষ্টুপে, পঁচাশি ছিয়াশি থেকেই এসব লিখছিল, এতগুলো বছরে এমন অনেকের সাথেই আলাপ হয়েছে যারা ওই লেখাগুলো থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের কাউকে কখনো দেখিনি ওই রকম পতপত করা শূন্যতার প্রশ্ন করতে। এই 'পতপত করা শূন্যতা' বোঝার জন্যে আপনাদের একটা গল্প বলি। আমরা তখন আখাম্বা বিপ্লবী ধর্মপ্রচারক। সন্তানদলের সমাগমই বা বাদ থাকে কেন আমাদের বিপ্লবী মতাদর্শের হাত থেকে — টাবু আর আমি একবার তাদের একটা ছোট্ট অফিসে গিয়ে হানা দিলাম। আলোচনার শুরুতেই একজন সন্তান আমাদের বললেন, আপনারা তো ভগবান মানেন না, বলুন তো আকাশের শূন্যতায় ওই যে পাখি পতপত করে উড়ছে, কেমন করে উড়ছে। উঃ, টাবু আর আমি, কখনো ফিজিক্স, কখনো ইকনমিক্স, কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে র‍্যাশনাল এক্সপেক্টেশন অব্দি যখন একদম গুলে খাইয়ে দিয়েছি, সেই সন্তানটি ছিলেন অসম্ভব ধৈর্যবান শ্রোতা একটানা দু ঘন্টার উপর শুনে গেছেন, আমি প্রায় পকেট থেকে পার্টি এজি মেম্বারশিপের ফর্ম বার করে ফেলেছি, আজকেই মেম্বার করে দেব, আর কী, উনি তো পুরো বিপ্লবীই হয়ে গেছেন এতক্ষণে, সেই সন্তান, হুবহু একই গলায়, ভাবুন একবার, হুবহু একই গলায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু বলুন তো আকাশের শূন্যতায় ওই যে পাখি পতপত করে উড়ছে, কেমন করে উড়ছে। জানেন, বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় আমরা কেউ আর এমনকী চাও খাইনি।

সেই সেমিনারে অজিতদা বলেছিল, ইকুয়ালিটি বলে কিছু হয়না, নেই। এর পর আলোচনার সূত্রে একজন জিগেশ করেছিলেন, আচ্ছা এর ফেভারে আপনি কোনো ডেটা কোনো স্টাডি দেখাতে পারবেন? প্রশ্নটা শুনে আমার দেবুর কথা মনে পড়েছিল। আমার এক বন্ধু দেবু কোনো বিয়ে শাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে হলে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি গাঁজা খেয়ে যেত। যন্ত্রণা পাওয়ার ক্ষমতাটাকেই কমিয়ে দিতে বোধহয়। সেদিন আমার মনে হয়েছিল সামাজিক অনুষ্ঠানের লিস্টিতে সেমিনারদেরও ধরা উচিত। পরে অজিতদাকে গাল দিয়েছিলাম, এসবে গিয়ে কী ছাই হয়, যে গাল পরেও বহুবার দিয়েছি। সত্যিই আমি বুঝি না। তবে কোথাও কোথাও কাজেও লাগে। অজিতদা একসময় বহুবার বলেছিল পিএইচডি করে নিতে। দুবার শুরুও করেছিলাম। দুবারেরই অসমাপ্ত চেষ্টার কিছু না কিছু ছাপ মার্জিন অফ মার্জিন-এ আছে, প্রথম বারের থেকে ভাভার সমালোচনা, আর দ্বিতীয় বারের থেকে বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টার। এখন এই বুড়ো বয়সে, মাঝেমাঝে মন খারাপ লাগে, কত মাইনে বেড়ে যেত একটা পিএইচডি থাকলে।

যাইহোক, যা বলছিলাম, আমার ক্ষেত্রে এই অন্য ভাবনার শুরুটা হয়েছিল অজিতদার লেখা পড়ে। এবং মূল ঝাঁকুনিটা এসেছিল — ইকুয়ালিটি বলে কিছু হয়না, নেই। এর পর, ধীরে ধীরে, উননববই নববইয়ের মধ্যে অজিতদার সঙ্গে কাজে যুক্ত হয়ে পড়ি। প্রণবদাও। তখন ভাস্করও ছিল। কিছুটা কিছুটা কল্যাণদা অরূপদাও। এরপর অঞ্জন আসে। আরো অনেকে কম বেশি যুক্ত ছিল সেখানে। আমাদের এই কাজের সঙ্গে। অপরের ছেলেরা ছিল, বিশেষত তাপস আর দেবতোষ। ওরা কাঁটাকলে ইকনমিক্স অফ মার্ক্স-এর ক্লাস করতেও গেছিল। ছিল মার্জিন-এর অনির্বাণ অনুপ স্বাতীরাও। ছিল এবং আছে কমবেশি আরো অনেকে। এমন কী, পরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গেছিল ক্রিস্টোফার, অভিজিত, নেরাড বা এরসেলরা। যেমন হয়, এদের সবার সঙ্গে সবার যে সব জায়গায় চিন্তার মিল আছে তা কখনোই নয়, চিন্তার খুব বড় বড় জায়গাতেও তফাৎ আছে। কিন্তু আবার একটা আত্মীয়তাও আছে। পার্টি ছাড়ার পর আমি আমার কমিউনিটি হারিয়েছিলাম। কোনো একটা জায়গায় এটা আবার আমাকে একরকম একটা আত্মীয় বন্ধুর কমিউনিটিও দিয়েছিল। লেখক হিশেবে আমাদের তিনজনের নাম আছে, কিন্তু, বোধহয়, লেখকের সংখ্যা তার চেয়ে কিঞ্চিত বেশি। এবং, আমাদের তিনজনের ব্যক্তিগত ঠিকানার বাইরে আর যদি কোনো ঠিকানা বইটার থাকে সেটা কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনের ঘরানা।

অজিতদার কাছ থেকে পাওয়া আমার ব্রেকটা শুরু এই ইকুয়ালিটি নেই এইখান থেকেই, কিন্তু এখন লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে আরো অনেক ভালোভাবে ব্যাপারটা বোঝানো যায় সমগ্র নেই এইখান থেকে শুরু করলে। ধরুন প্রথমেই

বললাম, আমি সমগ্র মানিনা। তুমি যত চমৎকার একটা সমগ্রের গাজরই আমার সামনে ঝোলাও না কেন, আমি সে পথে হাঁটব না। কারণ তোমার নিজের সমগ্র-ধারণা তো তোমার নিজের প্রতিরক্ষাই করতে পারল না। ক্যাপিটালিজম তার নিজের জায়গাতেই রইল, তুমি মাঝখান থেকে হেজে গেলে। তুমি যদি বলো অপপ্রচার, আমি বলব, এর চেয়েও অনেক বেশি অপপ্রচার ঘাড়ে বয়ে তো তুমি বিপ্লব করেছিলে, তখন কমিউনিস্ট নেতা লেনিনকে ডাকা হত ডাকাতদলের সর্দার বলে। তুমি যদি বলো সিআইএ করেছে, আমি বলব তোমার কেজিবির জন্যে তো তুমিও খরচ কম করোনি, তাদের তো তুমি ল্যাবেঞ্চুষ খাওয়ার জন্যে পুষতে না, তাহলে তারা আমেরিকায় তাই ঘটাতে পারলো না কেন, যা তুমি দাবি করছ তোমার দেশে সিআইএ করেছে।

আসলে তোমার গন্ডগোলটা এখানেই, তুমি ভেবে নিয়েছিলে একটা জায়গা দিয়ে তুমি সবটাকে বুঝে নেবে। এতে সবার বোঝার উপরে তুমি তোমার নিজের বোঝা চাপিয়ে দিতে গেলে। তোমার নিজের জায়গাটাই গ্যাঁড়াকল হয়ে গেল। তুমি বলেছিলে তোমার শ্রেণী দিয়ে তুমি নারীর বক্তব্যকে পুরো বুঝে ফেলবে, এই করতে গিয়ে নারী পজিশনই তোমার শ্রেণী-ধারণার উনোনে জল ঢেলে দিল। নারী, তৃতীয় বিশ্ব, ডেভিয়ান্ট, সমকামী, এই সব বর্গুলো মার্ক্সবাদ যাদের বহিষ্কার করে দিয়েছিল তার ব্যাখ্যার আলোচনার চিন্তার জগত থেকে তারা ফেরত আসতে শুরু করল। এবং তেরোটা বাজিয়ে দিতে থাকল মার্ক্সবাদী তত্ত্বকাঠামোর। মার্ক্সবাদী সমীকরণমালার।

২২।। বহিষ্কৃতের পুনরাগমন

মার্ক্স এর ভ্যালু সমীকরণ ব্যবহার করে মার্ক্স পুঁজিবাদী কাঠামোয় পুঁজিবাদী সাম্যের রহস্য ভেদ করেছিলেন মার্ক্স। তার তত্ত্ব আর ওই সমীকরণ মালা অঙ্গাঙ্গী। সেই সমীকরণ মালা ভাবুন, বা, তার সাম্যতত্ত্ব, সেখানে মার্ক্স পুরো আলোচনাটা এনেছিলেন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমের ভিত্তিতে। যে আলোচনা, বিমূর্ত শ্রম নিয়ে, আমরা আগেই করেছি। সেই শ্রম কার? পুঁজিবাদী পদ্ধতির শ্রমিকের। কারখানার, অফিসের, স্কুল-কলেজের, হাসপাতালের।

কিন্তু সমাজে তো শুধু এই পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার শ্রমই নেই, আরো নানা ধরনের শ্রম আছে। তাদের তুমি বাদ দিলে কেন? আমি কাজে যাব বলে নটায় বেরোব, তাই, ছটায় উঠে আমার বৌকে তরকারি কুটতে হয়, রাত জেগে সিনেমাও দেখতে পারে না, আমি যখন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী দেখি ও ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো সকালে উঠতে পারবে না। তার মানে আমার শ্রম আমার শ্রম হয়ে উঠছে আমার বৌয়ের শ্রমকে অর্ন্তগত করে। তার মধ্যেই মিশে আছে ঘর গেরস্থালির শ্রম। সেই শ্রমকে তুমি তোমার কাঠামোয় না এনে ওপর ওপর আমার অফিসের কারখানার শ্রমকে ব্যাখ্যা করছো মানেই তার মধ্যে গোঁজামিল থাকতে বাধ্য। ঠিক সেটাই আছে মার্ক্স-এর তত্ত্বে। আমরা দেখিয়েছি মার্ক্স-এর ওই সমীকরণ মালা সমাধানই করা যায় না। সমাধান করা সম্ভব না, কারণ মার্ক্স যাদের বহিষ্কার করেছিলেন তার অঙ্ক থেকে, সেই শ্রম ফিরে আসে অন্ধকার থেকে আর চালু সমীকরণগুলোর মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেয়। আমার বৌয়ের শ্রম, মায়ের শ্রম। মা ছোটোবেলায় লালন করেছিল, ভাষা শিখিয়েছিল, সহবত শিখিয়েছিল, আমাকে কি আদৌ ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আমার মাকে ব্যাখ্যা না করে?

আরো আছে। ধরুন পুঁজির শ্রমের সাম্য ব্যাখ্যা করা হল একটা পুঁজিবাদী কাঠামোকে নিয়ে। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব জগতে ওই পুঁজিবাদী কাঠামো তো ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে একা একলা দাঁড়িয়ে নেই। তার চারপাশে আরো অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে, আরো অনেক সমাজকাঠামো। যারা পুঁজিবাদী নয়। ধরুন, তৃতীয় বিশ্বের এক বিরাট জগত। যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো কখনোই বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী নয়। সেই অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে ওই পুঁজিবাদী কাঠামোর। অর্থাৎ, ভোগ এবং উৎপাদনের নিরিখেই পুঁজির মধ্যে প্রাকপুঁজি কাঠামোর অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো মিশে আছে। তুমি পুঁজির শ্রমের সাম্যকে নির্মাণ করছ তাদেরকে না ধরেই। কিন্তু আসলে তারা তো আছে।

এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তির ধারণার মধ্যেই এই গোঁজামিলটা আছে। কোনো কিছুকে আলোকিত করা যায় তো কেবলমাত্র তার চারপাশের আর সব কিছুকে অন্ধকার করেই। নারীকে, তৃতীয় বিশ্বকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েই মার্ক্সবাদী সাম্যধারণা গড়ে ওঠে। (তাই মার্ক্সবাদও এই জায়গায় এনলাইটেনমেন্টিস্ট বা মডার্নিস্ট, আধুনিকতাবাদী। পরে এই আলোচনায় আসছি আমরা)। আর তাই সেই সমীকরণ মালা অসমাধেয় হতে বাধ্য।

তাহলে, কী পেলাম আমরা, মার্ক্সবাদী সমগ্রের সাজানো বাগান আসলে বড্ড বেশি সাজানো। সেখানে বড় বড় গোঁজামিল আছে, রূপকথা আছে। যদি কেউ এই কথা বলে যে ব্যাখ্যার রথ একটা জায়গায় থামাতে হয় বলেই এই গোঁজামিলটা আসে, ঠিক কথা, তাহলে স্বীকার করো যে কোনো মডেলই চূড়ান্ত না, কখনোই তোমার কথা শেষ কথা এটা বলার অধিকারই নেই তোমার। তুমি একটা জিনিষকে একটা ভাবে একটা দূর অব্দি দেখো, আর এক জন আর

একটা জিনিষকে আর একটা দূর অব্দি দেখে। তোমার তত্ত্বের ফ্যাসিস্ট হওয়ার কোনো অধিকারই নেই। তোমার বোঝার বাইরে সবসময়ই অনেক কিছু রয়ে যাবে, সেখানে চুপ করে থাকো, বলো, এখানে আমার আর কিছু বলার নেই। বলো, যে তোমার সমগ্রটাও আসলে অন্য যে কোনো সমগ্রের মতই একটা রূপকথা। মাইথলজি। আসলে সমগ্র বলে কিছু হয়না।

সেকশন ১ এর শেষ প্যারাগ্রাফে ব্যক্তির ইতিহাসকে সমষ্টির ইতিহাস দিয়ে, সমগ্রের ইতিহাস দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম। এই প্রবণতাটা খুব সুন্দর করে দেখিয়েছিলেন ফ্রেডরিক জেমসন, তাঁর লেখা লাকাঁর একটা ভাষ্যে। ভাষ্যটা যে খুব ভালো তা না, এখন এই ভাবনাচিন্তা গুলো অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে বোঝানো ছিল। মনোবিদ্যা বা সাইকলজি নিয়ে বলতে গিয়ে জেমসন লিখেছিলেন মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্কটা অনেকটা ভাশুর-ভাদ্দরবৌ-এর। মনোবিদ্যা দেখলেই মার্ক্সবাদের কেমন সঙ্কোচ হয়, মাইল্ড ঘোমটা টেনে নেয়। কারণ, তার বেস দিয়ে অর্থনীতি দিয়ে সমগ্র সমগ্রকে বোঝার কুসংস্কার থেকে তার মধ্যে একটা নার্ভাসনেস কাজ করে, এই শালা এখন কী যাতা বলবে, আমার পুরো কাঠামোটাই মাঝখান থেকে গুলিয়ে যাবে। আমি তো সমষ্টির অর্থনীতি দিয়ে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করছি, এ যদি এখন মন দিয়ে পুরোটাকে ব্যাখ্যা করে তো কী হবে, আমি কোথায় যাব?

এই আড়ষ্টতার কোনো মানেই নেই, নিজেকে যদি নিজের তত্ত্বের ফ্যাসিবাদ থেকে বার করে আনতে পারত মার্ক্সবাদ, তাহলে সে জোর গলায় জানাতে পারত, কুছ পরোয়া নেই, দুটোই সত্যি, দু জায়গায়, এমনকী তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও আছে। রেডিও নাটক আন্তেগোনেতে অজিতেশ ক্রেয়ন তৃপ্তি মিত্র আন্তেগোনেকে জানিয়েছিল, রাজা আরো বেশি করে বন্দী তার খাঁচায়। প্রজার চেয়েও। মার্ক্সবাদ যদি সবাইকে শাসন করার শাসক কুসংস্কারে না ভুগতো, তাহলে তার এই সমস্যাটাই হত না।

এই কুসংস্কারটা ভয়ংকর সর্বব্যাপিতায় ছড়িয়ে পড়েছিল মার্ক্সবাদী পার্টি অফিসে অফিসে। সেখানে সাজানো হত, রেগুলার ফুলবেলপাতা চড়ানো হত মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-হোচিমিন-এর ফটোর শালগ্রামশিলায়। শুধু এই প্রতিমা নয়। ইন্টারন্যাশনাল গানের মন্ত্রোচ্চারণ। কনফারেন্স শেষে শুরুতে তার তালে তালে হাত পা ছোঁড়া। যৌনতার জগতে শুরু হয়েছিল মারাত্মক ভালো-মন্দের বিচার। এখনকার কূলকার্নি মমতাকে তো ছেড়েই দিন তখনকার মমতাজকে দেখে গতিশীল হয়ে উঠতে চাইলেও মনে করা হত মার্ক্সবাদের শরীরে রক্তপাত হয়ে গেল। যৌনতা-বিরোধিতার এই জায়গাটা মনোবিদ্যা অনুযায়ী অনেকগুলো ফ্যাসিস্ট প্রবণতার সঙ্গে মেলানো যায়, যে কারণে দেখবেন প্রতিটি ফ্যাসিস্ট সংগঠনই একটা জায়গায় অযৌন, যৌনতাবিরোধী, সে শিবসেনা বলুন, আরএসএস বলুন, বা মার্ক্সবাদী পার্টি বলুন। পুজোআর্চা-ধর্মীয় আচারের প্রতি বিরোধিতার কুসংস্কারটাও মারাত্মক। আমার এক মার্ক্সবাদী বোন আমায় কোনোদিন ভাইফোঁটা বা রাখী দিলনা। তাতে তার মার্ক্সবাদ কেঁপে যাচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক এবং বিপজ্জনক অশ্লীলতা। লেনিনের সঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবে বহু খ্রিস্টান সংগঠন লড়াই করেছিল, তাতে লেনিনের খুব একটা খিদমত হয়েছে বলে তো মনে হয়না। এই মার্ক্সবাদীদের তুলনায় অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিও কত কনফিডেন্ট, কত আত্মবিশ্বাসী। ছুঁৎমার্গ কুসংস্কার এগুলো তো আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই। যখন মানুষ নিজে খুব স্পষ্ট ভাবে জানেনা সে ঠিক কী, তখন সে নানা অ্যান্টনি গেয়েছিল, খৃষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নেই রে ভাই/ শুধু নামের ফেরে জগত ফেরে/ একথা তো শুনি নাই, কিম্বা, ... ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন/ অন্তরে সব একাঙ্গী। মার্ক্সবাদ কেন একথা বলতে পারেনা, তোমার যন্ত্রণা তোমার, আমারটা আমার, দুজনেই যন্ত্রণার ভাগীদার, এসো আমরা একসাথে লড়ি? কারণ, বোধহয়, সেই শাসক সমগ্রের ফের। (সাবধান, 'ঐহিক' মানে কংক্রিট আর 'অন্তর' মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাববেন না, তাহলে তো ফের সেই এসেন্স বা অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার, ভাবুন 'ঐহিক' মানে কংক্রিট আর 'অন্তর' মানে 'অন্তরের ব্যথা', 'একাঙ্গী' মানে জয়েন্ট ফ্রন্ট।)

সেকশন ২ এর শেষ জায়গাটা লক্ষ্য করুন। কোনো ক্ষুদ্র জিনিষকেও আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে বুঝতে চাই, তাহলে সমগ্রটাকে জানতে হবে। এবং এই খুঁটিনাটি জানা-টা চলতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। ফলত হয়ে দাঁড়াবে একটা অনন্ত রকমের বড় সমগ্র। অর্থাৎ, ঠিক ভাবে জানাটা যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমগ্রে পৌঁছব অনন্তকাল পরে, মানে কোনো দিনই পৌঁছব না। অর্থাৎ, সঠিক ভাবে বিবৃত কোনো সমগ্র সংজ্ঞাগত ভাবেই থাকতে পারে না। কিন্তু সমগ্রই যদি না থাকে তাহলে আমরা খুব ভালো করে কোনো কিছুই বুঝতে বা বলতে পারব না। সব কিছুই হবে কাজ-চালানো গোছের জানা, কাজ-চালানো গোছের বোঝা। অর্থাৎ কোনো কিছুই আমি খুব

নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না। বলব একটা অনিশ্চিত অবস্থান থেকে। কেউ বলতে পারেন, এই অনিশ্চিত অবস্থান থেকে কোনো কিছুই করা সম্ভব না। তাদের বলার, এই মোট অনিশ্চয়তা মিলিয়েই তো সিআইএ বা আমেরিকা বেশ অনেককিছু নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের শাসন করে, তাহলে আমরা তার প্রতিরোধই বা করতে পারব না কেন, এই অনিশ্চয়তাকে মিলিয়েই?

২৩।। ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা

তাই, সমগ্র নেই, আমরা তাকে বুঝি না, অর্থাৎ, যে যাই বলি না কেন, সেটা তার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা। নিজের মত করে ভাবা, নিজের মত করে বোঝা।

সাহিত্য আকাদেমির একটা তিনদিনব্যাপী সেমিনারে অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও একটা পেপার পড়েছিলাম, মাল্যবান: একটি না-উপন্যাস। তাতে জীবনানন্দের উপন্যাস মাল্যবানে আমি পোস্টমডার্ন সব খুঁটিনাটি খুঁজে পাওয়ায় অনেকেই সেটাকে উইশফুল থিংকিং ভেবেছিলেন। আমি যা খুঁজে পেতে চাইছি তাই পাচ্ছি। একজায়গায় সেটা ঠিক। মহান লেখকেরা একসঙ্গে অনেকগুলো লেখক। আমার এক পিস ব্যক্তিগত জীবনানন্দ আছে, আপনার আর এক পিস। আর ওই লেখাটায় (এবং আমার আরো অনেক লেখাতেই) আমি যা কোট করি, বোরহেসের উকবার তলন অ্যান্ড অরবিস টারশিয়াস গল্পের সেই থিম তো আছেই, যা আমরা চাই তাই আমরা খুঁজে পাই, তা নির্মিত হয়ে যায়। এই থিম আরো অনেক ভয়ঙ্করতায় আছে তারকোভস্কির সোলারিস-এও। বা খুব সাম্প্রতিক কালের আর একটা ভালো সায়েন্স ফিকশন দি স্ফিয়ার-এও। কিন্তু এর বাইরে আর একটা জায়গাও সত্যি।

সেই সেমিনারে একরাম আলি একটা অবিশ্বাস্য রকমের ছোটো পেপার পড়েছিলেন, তার মধ্যে একরাম বিবরণ দিয়েছিলেন সেই প্রাথমিক বিস্ময়ের, জীবনানন্দ পড়তে গিয়ে তার যেটা ঘটেছিল। আমি সরাসরি সেই বাক্যাংশটা কোট করছি একরাম থেকে। "ব্যক্তিমানুষের এই অক্ষমতা ও উদাসীনতা, অক্ষমতার ও উদাসীনতার এই স্বীকারোক্তি ..."। একরাম একদম ঠিক সেই জায়গাটাতেই আঙুল দিয়েছেন, যে অভিজ্ঞতা আমারও।

অক্ষমতা, আবার ক্ষমতা-অক্ষমতা মিলিয়ে উদাসীনতা, তারপর সেই পুরোটার বিষয়ে স্বীকারোক্তি। এই পুরো সেকশন জুড়ে যে কথা গুলো লিখে চলেছি তার সঙ্গে মেলান। আমি জানি আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, খুব সামান্য কিছুই আমি জানতে বা বুঝতে বা করতে পারি, আবার আমার তা নিয়ে খুব একটা কিছু এসেও যায় না, কারণ আমি জানি এরকমই হওয়ার কথা, আর এই পুরোটা নিয়েই আমি খুব রিল্যাক্সড রকমের ওপ্ন, নির্দ্বিধা রকমের উন্মুক্ত। এটা একটা মনোভঙ্গি। আর কোনো বেটার নামের অভাবে আমি এটাকে ডাকব পোস্টমডার্ন মনোভঙ্গি বলে। একরাম সেটাকে খুব চমৎকার ভাবে ফরমুলেট করেছেন, কিন্তু শুধু একরাম না, আমরা অনেকেই জীবনানন্দর লেখায় ঠিক এইভাবে নিজেদের মধ্যে ক্রমশ আবিষ্কার করতে থাকা এই মনোভঙ্গিটাকেই খুঁজে পাই। যা তার আগেকার আর কারো মধ্যে পাই না।

জীবনানন্দর সাতটি তারার তিমির বা মাল্যবান, বিনয় মজুমদারের ফিরে এসো চাকা, উৎপল বসুর পুরী সিরিজ বা জয় গোস্বামীর ভুতুম ভগবান, সতীনাথ ভাদুড়ির ঢোঁড়াই, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এখন আমার কোনো অসুখ নেই, দেবেশ রায়ের মানুষ খুন করে কেন, রাঘব বন্দোপাধ্যায়ের তিন বুড়ি — এই সমস্ত এবং এইরকম অন্য অনেক প্রচুর লেখায় ছড়িয়ে আছে ওই অক্ষমতা, ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা-ঔদাসীন্যের স্বীকারোক্তি।

বিশেষ করে বাংলা কবিতায়, বাংলা কবিতা যে উচ্চতায় বিচরণ করে তাতে খুব অবাক লাগে, তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের একটা প্রদেশ, একটা ভেঙে পড়া অর্থনীতি, সেখানে এরকম ঘটে কী করে। বাংলার ভালো কবিদের চেয়ে সিলভিয়া প্লথ টেড হিউজ বা থমাস ডিলানের নাম পৃথিবীর লোকে বেশি জানে এর ন্যায়সঙ্গত কারণ এই একটাই যে এরা বাংলায় লেখেন। যাইহোক যে কথা বলছিলাম, একটা অক্ষমতা-ঔদাসীন্যের অনিশ্চয়তা, এবং এই অনিশ্চয়তার স্বীকারোক্তি — এটাকেই আমি শুধু ভালো লেখার না, ভালো থিয়োরিরও প্যারামিটার করে তুলতে চাইছি। জাস্ট এটুকুই বলুন, ভাই সব কিছুর একটা সীমা আছে। তাহলেই হবে। কারণ "সব কিছুর একটা সীমা আছে" — এই বাক্যটারও একটা সীমা থাকবে। তার মানে এর পরেই আসবে, অন্য কোথাও সীমা না থাকতেই পারে, আমি জানিনা ভাই। তার মানে আমার যে কোনো তাত্ত্বিক অবস্থানের মধ্যেই একটা অন্তর্খচিত অনিশ্চয়তা থাকবে।

সংবেদনশীল বড় লেখকেরা তাদের লেখায়, তত্ত্ব থেকে যোজন যোজন দূরবর্তী লেখায় নিজেদের মত করে মননের সীমাগুলো খুঁজে পেতে থাকেন। মননের সীমা জীবনের বাইরে কিছু না, মননের, অস্তিত্বের, বিদ্যার, সমগ্রের সবগুলো

সীমাই এ অন্যের দ্বারা অতিনির্ণীত। যখন আমরা জীবনকে মেনে নিচ্ছি তখন সেই জীবনের মধ্যে উপ্ত ক্ষমতাকে মেনে নিচ্ছি। বেঁচে থাকা, জাস্ট সব রকম রাজনীতি থেকে দূরে, নিজেকে রাজনীতিহীন করে বাঁচিয়ে রাখার ক্রিয়াটাই তাই সেই অর্থে একটা দক্ষিণপন্থী রাজনীতি। কারণ, অন্য আরো কোটি কোটি নাটবল্টুর মত আমিও এই কাঠামোয় আর একটা নাটবল্টু। একটা বিপুল যন্ত্রের কুচো একপিস নাটবল্টুর মত গুরুত্ব আমার এই মোট কাঠামোয়, কিন্তু সেটাও তো একটা গুরুত্ব। আমি এই মেশিনের মধ্যে। সেই ভাবেই আমায় বাঁচতে হবে। কিন্তু এটা তো গেল আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারের ইতিহাস। আমার বিমূর্ত শ্রমের। আমার ইতিহাস যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তাহলে তো, খেয়াল করুন কেলোটা, মার্ক্সবাদী রাজনীতি নিজেই ঘটে উঠতে পারত না, কারণ, মনন যদি সেখানেই শেষ হয় যেখানে বিমূর্ত শ্রম হয়, তাহলে এর পরে তো আর কিছু নেই। অন্য কোনো রকমে ভেবে ওঠাও নেই, ঠিক যে ভাবে ক্ষমতা আমাকে ভাবিয়ে তুলতে চাইছে তার বাইরে।

কিন্তু আমি শুধু এখানেই শেষ হইনা। বিমূর্ত শ্রমের ইতিহাস, অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারের ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাস। যে ইতিহাস পুঁজি কাঠামোয় এক্সচেঞ্জ ভ্যালু বানানোর ইতিহাস। এর বাইরে পড়ে থাকে আমার মূর্ত শ্রম, কংক্রিট লেবার, যা দিয়ে আমি ইউজ ভ্যালু বানাই। সেখানে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা, যেমন ভাবে আলাদা হাতির সঙ্গে ক্রিমরোল, প্লাগের সঙ্গে ছবি, সবকিছুর সঙ্গে অন্য প্রতিটি কিছু। এমনকি তুলনার ক্রিয়াটাই যেখানে সম্ভব না। ছোটবেলায় অনুপাত বা প্রোপোরশনের অঙ্কে শেখাত না, কোনো কিছুর সঙ্গে অন্যরকম কোনো কিছুর তুলনাটাই করা যায় না। সেই পাটীগণিতটুকু মনে রাখুন। আমাদের বিমূর্ত শ্রমের ইতিহাসের বাইরে পড়ে থাকে মূর্ত শ্রমের ইতিহাস। সেখান থেকে গজায় ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস। তার ব্যক্তি-মননের প্রশ্ন। বাস্তবতাকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা। ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা।

নাটবল্টু আমার ইতিহাসকে ছাপিয়ে পড়ে ব্যক্তি আমার ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে লেখেন সংবেদনশীল শিল্পীরা। তারা অস্তিত্বের বোধের সীমাগুলোকে ধরেন। সেখানে ধরা পড়ে সমগ্রের সময়ের সাম্যের সীমা। তার জন্যে তাদের আলাদা করে মার্ক্সবাদী বা উত্তরআধুনিক হতে হয়না। জীবনানন্দকে হয়নি। কোনো সংবেদনশীল শিল্পীকেই হয়না। তারা জীবনের সীমা তাই চিন্তার সীমাকে খুঁজে দিয়েছেন। সেখানেই তাদের সময়ের আলোচনাগুলো রয়ে গিয়েছে। যারা পড়ে উঠতে পারে তাদের জন্যে। এই সীমাগুলো ক্ষমতার হাতে বানানো, ক্ষমতার হেজেমনির চিহ্ন, তাই সীমাগুলোকে চিহ্নিত করে দেওয়ার মধ্যেই রয়ে যায় ক্ষমতার একটা সমালোচনা, একটা ক্রিটিক, যা বিপ্লবী রাজনীতির চেয়ে কোনো কম অংশে বিপ্লবী নয়। (মনন এবং ক্ষমতার সম্পর্কটাকে আলোচনা করব আমরা আরো, ফুকোর নিরিখে।)

২৪।। বলো ময়না 'রাধেকৃষ্ণ', বলো 'সমগ্র সময় সাম্য'

সমগ্রের না-থাকার কেলোগুলো মোটামুটি এক ভাবে ধরা গেল। এবার যাওয়া যাক সময়ের গতিমুখের বিষয়ে আলোচনায়। হেগেলে একটা পরিষ্কার ক্লিন-শেভড ফিটফাট জেন্টলম্যানলি (দেখেছেন কী, জেন্টলম্যানলি শব্দটা নিজেই একটা কন্ট্রাডিকশন, একটা লোক একই সঙ্গে জেন্টল এবং ম্যানলি কী করে হয়?) ক্রোনোলজি মানে সময়ের গতিমুখ ছিল। পুরোনো/ আগের/ লোয়ার মোমেন্ট — তাকে অতিক্রম করে যায় ইউনিভার্সালের বা সমগ্রের নতুন/ পরের/ হায়ার মোমেন্ট। সমগ্র এবং গ্রামশি নিয়ে আমরা যা বলেছি সেটা মনে করুন।

একই সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করছে একাধিক সমাজব্যবস্থার সম্পত্তি সম্পর্ক এবং সামাজিক সম্পর্ক। ধরুন একটা পরিবার। তার এক ছেলে খুব মেধাবি, সে ব্যাংলোরে সফটওয়ারের কাজ করে, আর এক ভাই উকিল সে হাইকোর্টে প্রাকটিশ করে। আর এক ভাই চাষবাস করে গ্রামের বাড়িতেই, তার ক্ষেতে এমনকী মুনিষও কাজ করে, এক ধরনের বন্ডেড লেবার। নানা ধরনের অর্থনীতি, নানা ধরনের সংস্কৃতি। তাদের সহাবস্থান। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তারা কেউ কাউকে আক্রমণও করছে না।

(এখানে একটা ইন্টারেস্টিং উদাহরণের কথা না বলে পারছি না, হ্যারিয়েট ফ্রাড তার অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা নামের অসুখ নিয়ে লেখায় দেখিয়েছেন, সারা পৃথিবী এমনকী উন্নততম দুনিয়াও কী ভাবে এই সমস্যায় ভুগছে, যেখানে দুটো আলাদা সংস্কৃতির দুটো আলাদা মূল্যবোধকে একই সঙ্গে একই জীবনের ভিতর হজম করতে না পেরে নারীমন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, সেটাই রূপ পাচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা নামের অসুখে)

তাহলে সময়ের গতিমুখের কী হল? সেটা তো আর রইল না। টাটা কোম্পানি পুরোহিত এজেন্সি খুলবে শিগগিরই এটা বহু আগের একটা লেখায় লিখেছিলাম, সেই বাস্তবতা আমাদের সামনে ইতিমধ্যেই এসে গেছে। এইচডিএফসি

ব্যাংক গৃহপ্রবেশের শুভদিন জানিয়ে দেয় মানুষকে। ইন্টারনেটের সাইটে সাইটে বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষ আর ধর্মীয় আচারের ধূম তো আছেই। তাহলে সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট সময়রেখাও রইল না, সব সমাজ বাস্তবতাই এক সঙ্গে বিরাজ করছে। আমাদের চারপাশের অর্থনৈতিক দুনিয়ায় কী ভাবে একই সাথে বিবিধ ভিন্ন আকারের মোড অফ প্রোডাকশন একই সাথে বিরাজ করছে সেটা আলোচনা করে দেখানোই যায়, আলাদা আলাদা ধাঁচের সারপ্লাস ভ্যালু নির্মাণ নিষ্কাশন এবং ভোগের প্রক্রিয়ায়, কিন্তু মনে হয়না তার কোনো প্রয়োজন আছে, আপনারা নিজেরাই সেটা আন্দাজ করে নিতে পারছেন।

এবার, সমগ্র নেই এবং সময় নেই এ দুটোর সঙ্গে আমরা তৃতীয় আর একটাকে নিয়ে আসব। সাম্য নেই। আসলে তার আলোচনা আমরা করেই ফেলেছি, শুধু সেটাকে আলাদা করে আমরা লক্ষ্য করাই নি। মার্ক্স-এর তত্ত্বে তথা তার ভ্যালু সমীকরণে পুঁজিবাদী সাম্যের ব্যাকরণ বিবৃত হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে কী ভাবে সেই সাম্য পেরিয়ে ব্যক্তি-শোষণ মুক্ত সমাজবাদী সমাজের প্রকৃত সাম্যের দিকে আমরা রওনা হব। কিন্তু এর আগেই আমরা দেখিয়েছি সেই তত্ত্ব কী ভাবে অনেকগুলো নৈঃশব্দ্যকে ধারণ করে। অনেকগুলো রূপকথাকে, গোঁজামিলকে। তার মানে তার উপরে যে স্থাপত্য দাঁড়িয়ে আছে সেটাও গোঁজামিল। তার মধ্যে নানা ধরনের নিষ্পেষণ আছে দমন আছে মিথ্যাচার আছে।

এবার ভাবুন তো, সাম্য ব্যাপারটা বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা আসলে কী, কোথাও দেখেছেন এই জীবনে? কোনো জায়গায়? কখনো? আমি আপনার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, "না", কারণ সেই সাম্য ধারণাটাই একটা রূপকথা। পুঁজির মডার্নিস্ট রূপকথা, ঠিক ওই আগেকার দক্ষতার ধারণার মতই। গাধা পৃথিবীকে লোলুপ করে তুলে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পশ্চিম যে মুলোটা পয়দা করেছিল। কুন্তীর সাম্য ধারণার আলোচনাটা, আমরা যেটা আগেই করেছি, মাথায় রাখুন। এবার ভাবুন, এরকম কোনো সাবজেক্টিভ, চিন্তাপ্রসূত কায়দাবাজি আপনি করতে রাজি নন, যেমনটা কুন্তী করেছিলেন, তিনি ঐহিক অসাম্য দিয়ে অন্তরের সাম্যকে এনেছিলেন। এটা ছিল কুন্তীর সাবজেক্টিভ কারসাজি, নিজের চিন্তাপ্রসূত। কুন্তী ভেবেছিলেন যে ঐ ঐহিক অসাম্যই(ভীম ১, অন্য ১/৪) অন্তরের সাম্য আনবে, প্রয়োজনের সাম্য। আপনি যদি এরকম কোনো কায়দাবাজি করতে রাজি না হন, তাহলে আপনার সাম্যকে আপনার অবজেক্টিভলি অর্থাৎ বস্তুগতভাবে সমান করতে হবে। এটা হবে গোড়া থেকেই, মানে সংজ্ঞাগত ভাবেই, অসম্ভব। ধরুন একটা অফিসের সাম্য। অফিস থেকে টিফিনে সবাই একটা করে কেক পায়। আপনাকে প্রতিটা কেক হুবহু সমান করতে হবে। আপনি কেন আপনার পিতাশ্রীও পারবেন না, কারণ, পারমানবিক ভাবে সর্বসম কেক বানাতে এই মাটির পৃথিবী এখনো শেখেইনি।

তার মানে আপনি যে সাম্যই আনুন না কেন, তার মধ্যে গোঁজামিল থাকবে। থাকবেই। তার চেয়ে মাইরি ওইসব ক্যাওড়ামি করতে না গিয়ে বলুন, সাম্য মানেই সাবজেক্টিভ। বিষয়ীগত, মননগত। আমি এমন একটা অবস্থা চাই যে অবস্থাটাকে আমি অসমান মনে করিনা, বা, তার চেয়েও বড় কথা, যেখানে সমান না অসমান সেই ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসে না। অর্থাৎ, বস্তুগত অসাম্য থাকল না না-থাকল সেটা বিষয় নয়, বিষয় হল এই যে সেখানে কেউ কারুর দ্বারা নিপীড়িত বোধ করেনা। দেখুন, শেষ অব্দি, যখন আপনি 'নিপীড়িত এবং অসম বোধ না-করা'-র কথা বলছেন তখন কিন্তু সেই মনে করার, বোধের, সাবজেক্টিভিটির দোহাই পাড়তে হচ্ছে। বস্তুভিত্তিক সাম্য বলে কিছু হয়না। আপনি আর সাম্যের কথা বলছেনও না, বলছেন নিপীড়নের কথা। তাহলে এবার নিপীড়ন থেকেই শুরু করুন না, সাম্যের গল্প ভুলে যান।

ধরুন দাম্পত্য। সেখানে স্বামী আর স্ত্রী এই দুজনের মধ্যেই প্রচুর প্রচুর অসাম্য আছে। একজন একজায়গায় শাসন করে, আর একজন আর এক জায়গায়। তাদের কেউই নিপীড়িত বোধ করেনা। আপনি কি এটাকে কাঙ্খিত অবস্থা বলবেন না? আমাদের চারপাশে যারা নানা জায়গায় সাম্য দাবি করেন, তারা নিজেরাই বোঝেন না, আসলে পশ্চিমের কায়দাবাজি তাদের বাক্যি হরে নিয়েছে। তারা নিজেরাই ভুলে গেছেন তারা আসলে কী চাইছেন। চাইছেন নিপীড়ন থেকে মুক্তি, মুখে বলছেন সাম্যের কথা, কারণ পশ্চিম তাদের ওই ভাষাই শিখিয়েছে। ময়নার মত তারা তা আউড়ে যাচ্ছে।

এবার সাম্যের কুসংস্কার মুক্ত হয়ে পৃথিবীর দিকে মুখ তুলে তাকান, পৃথিবীর কোথাও কোনোদিন সাম্য ছিলনা, নেই, থাকবে না। (অজিতদা, বস, তোমাকে এখানে একটা লাল সেলাম জানিয়ে নিই, গুরু যা নামিয়েছিলে না! যুগ যুগ জীও বস।) এবং তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। না আমাদের না আমাদের পিতাশ্রীদের না তাদের পৌত্রদের। না

কোনো শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের। এই আলোচনাটাকে আর বাড়াচ্ছি না, আপনি নিজেই এবার জীবনের নানা ভূমিতে এটাকে লাগিয়ে দেখুন কী ফল পান।

তত্ত্বের তথা যে কোনো মানববৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা কোনো এসেন্স বা ওইরকম আর কিছু দিয়ে আমি পুরোটাকে বুঝে ফেলব এটাকেই বলে এসেনশিয়ালিজম। তত্ত্বের উপর কেন্দ্রিকতাবাদী ফ্যাসিজমের আর একটা জায়গা পরিবর্তনকে এবং সময় ধারাকে একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত করে দেখা — এর নাম হিস্টরিসিজম। এই দুটোর প্রতি বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জায়গাকে আমরা নিয়ে এলাম, সাম্য নেই।

এবার দেখব আমরা, সমগ্র-সময়-সাম্য এই কুসংস্কার ত্রয়ের প্রকোপের বাইরে একটা তত্ত্বের অবয়ব কী দাঁড়াতে পারে। আমাদের তাত্ত্বিক অবস্থানকে আমরা আলোচনা করব। তার আগে, আর একটু আলোচনার আছে, এই তত্ত্ব ব্যাপারটার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অর্থের প্রসঙ্গ, যেটা আমরা আলোচনা করব মূলত ফুকোকে এনে।

২৫।। ডিকনস্ট্রাকশন

এর আগে মাল্যবান নিয়ে যে পেপারটার কথা বললাম, সেই প্রবন্ধে একটা লাইন ছিল, "দেরিদা নয়, ফুকোর অর্ডার অফ ডিসকোর্সকে এনে সাহিত্যে আর একটা নতুন বিচার-তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করছি" (বিচার তত্ত্ব মানে ক্রিটিকাল থিয়োরি)। তত্ত্বের তথা মননের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের জায়গাটা বুঝতে এখানে এই জায়গাটা নিয়ে ফের একটু আলোচনা দরকার। তার জন্যে প্রথমে দরকার দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন নিয়ে দু-একটা কথা বলা।

গ্রামশির সারোগেট বা ক্ষেত্রজ ইউনিভার্সাল নিয়ে আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম, গ্রামশির কাজের আরো অনেক এলাকা আছে। সেরকমই একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মানুষের চিন্তার উপর শাসনের প্রসঙ্গ। হেজেমনির বিভিন্ন প্রকার নিয়ে সেই আলোচনাগুলো খুবই উপাদেয়, কিন্তু আমরা এই লেখায় জাস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি ঠিক যতটুকু না বললে নয় তার বেশি আর কিছু না বলে।

দুতিনটে কথা এখানে বলে নেওয়া যাক। সিম্পল স্পেস, এবং কমপ্লেক্স স্পেস এই দুই রকম ইউনিভার্সালের কথা আমরা বলেছি, স্বাভাবিক ইউনিভার্সাল এবং সারোগেট ইউনিভার্সাল এই দুইরকম সমগ্রের যথাক্রমে দুই রকম বাস্তবতা। শাসক ও শাসিত, এলিট ও সাবঅল্টার্ন এই দুই বৃহৎ বর্গে আমরা যদি মানবসমাজকে বুঝতে চাই, তাহলে সাবঅল্টার্নের উপর এলিটের শাসন নানা ভাবে চারিয়ে যায়। পারসুয়েশন এবং কোয়েরশন, যথাক্রমে চাপ-সৃষ্টিকরণ এবং পীড়ন। নাম-দুটো লক্ষ্য করুন, বিশদ আলোচনায় না গিয়েও এটুকু বোঝা যাচ্ছে পারসুয়েশন অনেক দক্ষ পদ্ধতি সাবঅল্টার্নকে শাসনের।

ধরুন এক শাসনে অদক্ষ পিতা না কেলিয়ে তার সন্তানকে কিছু বোঝাতে পারেন না, দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গেতে কাজলের বাবা ওমরিশ পুরী যেভাবে শাসন করেন। এটাই কোয়েরশন। আর পারসুয়েশন হল ওই একই সিনেমায় শাহরুখের বাবা অনুপম খের, ফ্রেন্ডলি এবং পারসুয়েসিভ। (এই বন্ধু অভিভাবকের একদম নতুন একটা টাইপ হিন্দি সিনেমায় এসেছিল হামসে হ্যায় মুকাবলা সিনেমায়, যেখানে দাদার ভূমিকায় গায়ক এস পি তার ভাই প্রভু দেবার সঙ্গে নায়িকা নাগমার ব্লাউজ-এর হুক নিয়ে ফ্যান্টাসি-নৃত্য নেচেছিলেন প্রভুর এক বিরহের বিষণ্ণতার প্রহরে)। এবার শাসনের এই বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গে এবার আমরা মেলাব তত্ত্বচর্চা, লেখালেখি, শিল্প তথা মননের গোটা জগতটাকে। মানে, এর আগে যে হেজেমনির কথা বলেছিলাম আমরা, পুঁজি সমাজে সেই হেজেমনির আকারটাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করব। তার জন্যে, যা বললাম, প্রথমে একটু দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন।

শুরু করা যাক টেক্সট থেকে। যা আলোচনার মননের একটা প্রথম ধাপ। আর অন্য যে কোনো শিল্প বা প্রয়াসকেও একভাবে দেখলে আমরা একটা টেক্সট বা লেখা বলে ভাবতে পারি। যখন শুধু তার লিখনের চিহ্নগুলো বদলে গেছে। একজন ফিল্মবানিয়ে তার টেক্সট লেখেন ফিল্মভাষার ধবনিতে অক্ষরে চিহ্নে। একজন চিত্রকর লেখেন তুলিতে। এমনকি এটাকে বাড়াতে বাড়াতে আমরা আমাদের গোটা চিন্তনপ্রক্রিয়াকেই একটা লেখালেখির প্রক্রিয়া বলে ভাবতে পারি। একটা চিন্তা মানে আর একটা টেক্সট। কারণ, এখানে আমরা লেখাকে বুঝতে চাওয়ার ভিতর কলম বা পেনের টেকনোলজি বুঝতে চাইছি তাতো একেবারেই নয়। লেখার মধ্যে খেলা করছে যে চিন্তা এবং সেই চিন্তাকে ভাষায় নিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া তাকেই ভাবছি। এবং সেই সম্পর্কটার মাধ্যম থেকে মাধ্যমে একটা একদেশতা তো আছেই। আমরা জীবন কাটাচ্ছি। জীবন কাটানোর প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ভাবনাচিন্তার প্রক্রিয়া। সেই ভাবনাচিন্তাকে আমরা নানা

ভাবে আকার দিচ্ছি। তাই, এখানে, লেখা বা টেক্সট বললে আমরা বৃহত্তর অর্থে গোটা মননপ্রক্রিয়াকেই বোঝাতে চাইছি।

এবার একটা টেক্সটকে ভাবুন। একটা টেক্সট বা একটা লেখা মানে কিন্তু অনেকগুলো লেখা। মানে, এক এক জন সেই লেখাটার ভিতর এক একটা অর্থ খুঁজে পান। তার মানে একই লেখার ভিতর আলাদা আলাদা পাঠক আলাদা আলাদা লেখাকে আবিষ্কার করে। মানে আলাদা আলাদা অর্থকে। গীতার বিষয়ে যে কথাটা আমরা আগেই বলেছি। এবার দেখা যাক, একই লেখার ভিতর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কী ভাবে বসবাস করে, এবং সেই অর্থকে চালু সমাজের শ্রেণীক্ষমতা কী ভাবে আত্তীকরণ করে। ক্ষমতা সেই অর্থকে আত্মীকরণ করে তার হেজেমনি বা চূড়ান্ত শাসন, মনের উপর শাসন বানিয়ে তুলতে গিয়ে।

একটা লেখা মানে কী? কতকগুলো শব্দের সমাহার। শব্দ সেখানে ক্ষুদ্রতম একক। শব্দ জুড়ে জুড়ে শব্দ থেকে বাক্য গজিয়ে ওঠে। বাক্য থেকে প্যারা। প্যারা জমতে জমতে লেখা। (এই আগের বাক্যটার শেষ অব্দি এখনো এই লেখায় আছে ২৮২২৭টা শব্দ এবং ৩৩২টা প্যারাগ্রাফ।)

এবার লেখার অর্থনির্মাণের পুরো প্রক্রিয়টা ভাবুন। সেখানের থেকে যদি এক একটা শব্দকে আপনি আলাদা করে তুলে নেন, এবং তাদের ত্রিশঙ্কু করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখেন, সেখানে কিন্তু শব্দটা সেই লেখার কোনো অর্থের ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও পালন করতে পারবে না। ধরুন গীতার প্রথম শ্লোক থেকে 'সমবেত' শব্দটাকে আপনি বেছে নিলেন। এবং একটা সম্পর্কহীন জায়গায় তাকে ফেলে রাখলেন, ধরুন, শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এবার সেই 'সমবেত' মানে কী? কী সমবেত? কেরোসিনের লাইনে সমবেত কেরোসিনের টিন? তার মানে, একটা লেখার ভিতর প্রতিটি শব্দ অন্য প্রতিটি শব্দ দ্বারা ওভারডিটারমিন্ড, অতিনির্ণীত, অর্থাৎ, নির্ণীত এবং নির্মিত। প্রতি দুটি শব্দ পরস্পরকে অতিনির্ণয় করে। একটা শব্দকে বোঝা যায় শুধু মাত্র অন্য শব্দগুলোর নিরিখে।

এটা বলা মানেই আমরা লেখার কোনো একক ঐক্যকে, একটিমাত্র অর্থকে অস্বীকার করলাম। লেখা মানেই একটা মাত্র লেখা নয় আর। সেখানে বিভিন্ন স্তরের অতিনির্ণয় খেলা করছে : শব্দের অতিনির্ণয়, বাক্যের অতিনির্ণয়, লেখার, চিন্তার। এই অতিনির্ণয়গুলোকে মেনে নেওয়া মানেই অর্থের অতিনির্ণয়কেও মেনে নেওয়া। অর্থ-ও হয়ে পড়ছে অতিনির্ণীত। ক আর খ যদি পরস্পর পরস্পরকে অতিনির্ণয় করে, তবে ক আর শুধুমাত্র ক নয়, খ-ও শুধুমাত্র খ নয়। ক মানেই ক ছাড়া আরো কিছু। ক মানেই ক এবং ক-এর ছড়িয়ে থাকা একটা সারপ্লাস, উদ্বৃত্ত। এবং খ-ও তাই। 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'সমবেত' এই দুটো শব্দ যেই মিলে গেল, তাদের সঙ্গে 'যুযুৎসু' মানে যুদ্ধে ইচ্ছুক, আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা জ্যান্ত ছবিকে পেতে শুরু করলাম। যা তৈরি হল ওই আলাদা আলাদা ভাবে মৃত 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'সমবেত' শব্দদের মিলিয়েই। তার মানে এই সমাহারের ভিতর একটা বাড়তি অর্থের জীবন তৈরি হচ্ছে, সেই অর্থের তলে 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'সমবেত' পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মিশে থাকছে এ অন্যের ভিতর, কারণ, একটা অন্যটাকে বাদ দিয়ে তাদের প্ল্যাটফর্মে ফ্ল্যাট পড়ে থাকা ছাড়িয়ে বেরোতে পারছে না।

আবার আমি যা লিখছি তা তুমি বলছ/ লিখছ/ ভাবছ তার দ্বারা অতিনির্ণীত, ওভারডিটারমিন্ড। এই লেখাটার মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি আছে অপরের ছেলেরা, তেমনি আছে অন্য কোনো সম্ভাব্য পাঠকের (আশা করতে দোষ কী?) চিন্তাটাও। সে কী ভাবতে পারে আমার বাক্যটা পড়ে সেই ভাবনাটা মিশে আছে আমার বাক্যনির্মাণের প্রক্রিয়াতেই। (উদাহরণগুলো আনছি কেন? তাদের চিন্তার অটেকনিকাল সহজতার কথা ভেবেই)। অর্থাৎ, আমি চাই বা না-চাই আমার বাক্যের ও লেখার একটা উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে এবং সঠিক পাঠক বা শ্রোতার কাছে সেটা পৌঁছে যাবে। (এবং কার কাছে কী অর্থে পৌঁছবে তার উপরেও কোনো নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ নেই আমার। যেমন ধরুন, একটু আগে, যে অর্থে আমি উৎপল বসুর 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা' শব্দবন্ধটা ব্যবহার করেছি, আমি নিশ্চিত যে লেখাটা লেখার সময়ে ঠিক ওই অর্থটা তিনি করেননি।)

লেখায় অর্থ তৈরি হওয়া এবং সেই তৈরি হওয়া অর্থ পৌঁছে দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটা আবার ক্ষমতার সঙ্গে, শাসক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখা, অর্থ তৈরি করা এবং পৌঁছে দেওয়ার এই পুরো পদ্ধতিটা আসলে একটা পারসুয়েশন, চাপ-সৃষ্টিকরণ। যার কথা একটু আগেই বলছিলাম আমরা। একটা লেখা একটা অর্থ নির্মাণ করে, পাঠকের ভিতর সেই অর্থের প্রতি নির্ভরতা এবং বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। পাঠককে বোঝায়, কনভিন্স করায়। ওই অর্থে পৌঁছে দেয়। পাঠকের উপর ওই অর্থে বিশ্বস্ত হওয়ার চাপ সৃষ্টি করে। একটি লেখার চারপাশে অর্থের, উদ্বৃত্ত অর্থের

যে মণ্ডল সৃষ্টি হল, পাঠক সেটাকে আত্তীকরণ করে। অর্থনির্মাণ এবং আত্তীকরণের লেখক এবং পাঠকের এই যৌথ পদ্ধতিতে তিনটি ধাপ।

এক, লেখার লেখক, অর্থাৎ চাপের নির্মাতা চাইছে একটি বিশেষ অর্থকে পৌঁছে দিতে, যে অর্থ তার নিজের ইচ্ছার, নির্বাচিত অর্থ, সিলেক্টিভ মিনিং।

দুই, লেখার স্তরে লেখার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বৃত্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং।

তিন, পাঠক তার গ্রহণের স্তরে আবার একটি বিশেষ অর্থকে বেছে নিচ্ছে। পাঠকের নির্বাচিত অর্থ, সিলেক্টেড মিনিং।

অর্থাৎ লেখাটির বক্তব্য, তার অর্ন্তবস্তু, অতিনির্ণীত, কিন্তু সেই লেখার গ্রহণ বিশিষ্ট, ইচ্ছাগত, সিলেক্টিভ। লেখকের সিলেক্টিভ প্রেরণ এবং পাঠকের সিলেক্টেড গ্রহণ যদি মিলে যায়, তখনই নিখুঁত কমিউনিকেশন। লেখাটিকে পড়াকালীন আমি প্রেরকের ইচ্ছাটাকে ভুলে যেতে পারি। তখন শুধু প্রেরণটাকে, লেখাটাকেই দেখছি। উদ্বৃত্ত অর্থগুলো তখন গুটিয়ে আসছে। আমার সিলেক্টেড পাঠের শরীরে মিশে যাচ্ছে। আর আমার প্রতিটি পাঠেই নিহিত থাকছে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। 'নিজস্ব দৃষ্টিকোণ' এই শব্দবন্ধকে ভাঙলে আমরা কী পাই? নির্দিষ্ট কিছু অ্যাজাম্পশন, কিছু ধারণার একটা সমাহার। একটা নিজস্ব এন্ট্রি-পয়েন্ট, ওপ্‌নিং এবং ক্লোজার। বেরটোল্ট ব্রেখটের সেই কবিতাটা মনে করুন। একজন শ্রমিক ইতিহাস পড়ছে। সে কী খুঁজে পাচ্ছে? তার নিজের ঘাম রক্ত। পৃথিবী সম্পর্কে তার নিজের ধারণা।

সম্ভাবনা হিশেবে ছিল উদ্বৃত্ত অর্থের একটি ভাণ্ডার, যার থেকে একটি নির্দিষ্ট, সিলেক্টেড, বিশেষ অর্থই বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটা সিলেক্টিভ অর্থ মানেই একটা বিশিষ্ট অ্যাজাম্পশন-সমাহার। কন্টেক্সট সমাহার। অর্থাৎ একটি অর্থ মানেই একটি বিশেষ অর্থ, একটি খণ্ড অর্থ, একটি পার্টিজান অর্থ। যুক্তিবিজ্ঞান মোতাবেক ভিন্ন ভিন্ন অ্যাজাম্পশন সমাহার থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পৌঁছব। কখনো কখনো একটা সর্বগ্রাহ্য জমিও তৈরি হতেই পারে, যখন বাস্তবতা এবং আমাদের কর্মপদ্ধতির পারস্পরিকতার ভিত্তিতে, প্র্যাকটিসের ভিত্তিতে আমরা সবাই মিলে একটি মাত্র অর্থেই পৌঁছচ্ছি, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি বলে থাকে।

কিন্তু সম্ভাবনা হিশেবেই আমি যদি মাত্র একটা অর্থকে দেখি, অন্য অর্থের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করি, তখন অন্য অর্থগুলোকে আমি কণ্ঠরুদ্ধ করে দিচ্ছি একেশ্বর একটি মাত্র অর্থের পাদপীঠতলে : অর্থের স্বাধিকারপ্রমত্ততা, সংস্কৃতির ফ্যাসিজম।

অ্যাজাম্পশন-সমারোহকে বদলে বদলে একই লেখা থেকে আমরা পৌঁছে যেতে পারি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। এটাই জাক দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন। ডিকন্সট্রাকশন মানে অর্থের হত্যা নয়, নতুন নতুন অর্থের নির্মাণ, অর্থের উজ্জীবন। রিডিং বিটুইন দি লাইনস হিশেবে, ইনটুইটিভ একটা কৃৎকৌশল হিশেবে যা প্রায়ই আচরিত হয়, তারই একটা দার্শনিক ভিত্তি। দেরিদা দার্শনিক হিশেবে যুগন্ধর কিছু না হলেও মানববিজ্ঞান চর্চায় এই গনতন্ত্রকে তিনি একটা জায়গা দিলেন, এনলাইটেনমেন্ট যুক্তির পুঁজিতান্ত্রিক ফ্যাসিজমের তলায় যা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

একটা লেখার পুরো মানে, অর্থাৎ সমস্ত মানে, যদি কেউ বুঝতে চায়, সে আসলে লেখাটার সঙ্গে লেখাটার দূরের বন্ধুদের যোগাযোগ নষ্ট করে দিতে চাইছে। ভৌগোলিক ভাবে দূরের, কালগত ভাবে দূরের। একটা লেখার পুরো মানে যদি বোঝাই যায়, পঞ্চাশ বছর একশো বছর দূরে, পাঁচশো কিলোমিটার হাজার কিলোমিটার দূরে সেই লেখার কমিউনিকেট করার মত কোনো নতুন অর্থই বেঁচে থাকে না। অর্থাৎ, লেখার পুরো মানে বোঝা যায় না। এবং, একটা লেখার ভিতর বেঁচে থাকে অজস্র নতুন অর্থ — উদ্বৃত্ত অর্থ। লেখার সেই অর্থ, আরো অর্থ, যারা দূরে বেঁচে ওঠে, পরে বেঁচে ওঠে।

বাদামের খোলার ভিতর ডিকনস্ট্রাকশন চর্চা শেষ হল, এবার দেখা যাক, মিশেল ফুকো কী বলেছিলেন মনন এবং ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে।

২৬।। ক্ষমতা ও ফুকো

অরডার অফ ডিসকোর্স বা আলোচনার (শাসনের) ছক বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ফুকো। এই অর্ডার অফ ডিসকোর্স প্রবন্ধটা ফুকোর নিজের তাত্ত্বিক অবস্থানে একটা পালাবদল এনেছিল। জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব বা আর্কিওলজি অফ নলেজের পরিশিষ্ট হিশেবে ছাপা হয়েছিল এই শীর্ণ প্রবন্ধটি। এবং এর পরেকার ফুকোর যে কাজ, শৃঙ্খলা ও শাস্তি (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ) বা যৌনতার ইতিহাস (হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি) তার চরিত্র গেছিল সম্পূর্ণ বদলে, ধরুন

আগেকার কাজ সত্তার ছক (অর্ডার অফ থিংস) বা পাগলামো ও সভ্যতা (ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন) থেকে। অর্ডার অফ ডিসকোর্স প্রবন্ধটায় সত্যিই একধরনের একটা ছেদ আছে যা ফুকোর পরবর্তী কাজগুলোকে অন্যান্য উত্তরআধুনিক অবস্থানের তুলনায় আমাদের অনেক কাছে এনে ফেলেছিল। ফুকো এতে কী লিখেছিলেন?

মার্ক্স দেখিয়েছিলেন শ্রমিকের উপর অর্থনীতির শাসন। উদ্বৃত্ত শ্রম উৎপাদন করার, আত্তীকরণ করার এবং বণ্টন করার পদ্ধতি, যার নাম শ্রেণী, সেই শ্রেণী চুক্তিভিত্তিক সাম্যের রাষ্ট্রতন্ত্রের মাধ্যমে কী ভাবে একই সঙ্গে মালিককে দেয় শোষণ করার এবং শ্রমিককে দেয় শোষণ মেনে না নিলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরার অধিকার। মার্ক্স-এর শ্রেণী বিশ্লেষণ শ্রমিকের উপর এই অর্থনৈতিক শাসন, ইকনমিক কমান্ডকে বিশ্লেষণ করে, কিন্তু শ্রমিকের উপর প্রাক-অর্থনৈতিক আদিম শাসনকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। মার্ক্স-এর বিশ্লেষণে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। মার্ক্স শুধু পুঁজি কাঠামোর শ্রমিককে আলোচনা করলেন। পুংলিঙ্গ শ্রমিককে। গৃহস্থালির অন্দরমহলে, পুঁজিকাঠামোর বাইরে গৃহনারীর উদ্বৃত্ত শ্রমকে নিষ্কাশনের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বললেন না। মার্ক্স দেখলেন না শ্রমিক কী ভাবে শুধু অর্থনীতি দ্বারাই নয়, অর্থনীতির বাইরে আদিম পশুশাসন দ্বারাও শাসিত হয়। একজন শ্রমিক যখন দিনে আট ঘন্টা তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে, যেহেতু এই শ্রমশক্তি এমন একটা পণ্য যা তার মন ও শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না — আটঘন্টা ধরেই তার শরীর ও মনকে আটকে রাখা হচ্ছে। আটকে রাখা হচ্ছে শ্রমিককে। শ্রমপদ্ধতি তার শ্রমশক্তিকে শাসন করছে, অর্থাৎ তাকে। তাকে আটকে রাখা হচ্ছে আটঘন্টা যাবৎ কারখানায় বা অফিসে, খাঁচায় যেমন আটকে রাখা হয় পশুকে, পশুকে শাসন করা মানে পশুর দেহকে শাসন করা। শ্রমপদ্ধতির খাঁচায় বন্দী তার শরীরকে শাসন করছে পুঁজি : ক্ষমতা বা পাওয়ার।

ক্ষমতার শাসনের বিভিন্ন অনালোচিত ক্ষেত্রকে আমাদের সামনে উদঘাটন করেছেন মিশেল ফুকো। বিদ্যাচর্চায়, মনোবিজ্ঞানে, জেলে, হাসপাতালে, ইস্কুলে, আমাদের যৌনক্রিয়ায় কী ভাবে ক্ষমতা আমাদের দেহকে মনকে শাসন করে চলেছে। আলোচনার শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার শাসনকে দেখালেন ফুকো। অর্ডার অফ ডিসকোর্স প্রবন্ধে। আলোচনা, ডিসকোর্স কী ভাবে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফুকো এই পুরো আলোচনাটাই করছেন রিজন, যুক্তি, কান্টীয় রিজনের সাপেক্ষে। রিজনই এনলাইটেনমেন্ট। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে যে যুক্তি আমাদের আলোয় নিয়ে এল। বিজ্ঞানের আলো। যুক্তির আলো। ফুকো আমাদের দেখালেন এই আলো এই রৌদ্র কী ভাবে অন্ধকার হয়ে ওঠে, উল্টোদিকে ঠাণ্ডা হিম অন্ধকারকে কী ভাবে তুলে আনার দরকার পড়ে — মনে আলো ফেলা।

আলোচনা লেখালেখি তথা যে কোনো মনন-প্রক্রিয়ার উপর ক্ষমতা তার শাসন চারিয়ে দেয় যে প্রক্রিয়ায় (আমরা একে হেজেমনির সঙ্গে মেলাতে পারছি) তার কাজ করার দুটো ধাপ।

এক, বহিষ্কার (পাগলামি, বাউন্ডুলে, যৌন-আলোচনা)।

দুই, অন্তর্ভুক্তি, যা বহিষ্কারেরই একটা বিশিষ্টতা, বিশেষ প্রকার, ফুকো যার নাম দিলেন রেয়ারিফ্যাকশন বা প্রতিসরণ। (ফুকোর ব্যবহৃত ফরাসি 'রারেফ্যাকসিঁয়' বাংলা প্রতিসরণের চেয়ে তো বটেই, ইংরিজি রেয়ারিফ্যাকশনের চেয়েও বেশি কিছু। এর অন্তর্ভুক্ত শুধু পাতলা এবং সূক্ষ্ম হয়ে আসাই নয়, তার সঙ্গে ক্ষীণতর হওয়া, যোগান কমে যাওয়া, ঝিমিয়ে মরে আসা। ডিসকোর্সের গঠন সংক্রান্ত আলোচনা অর্থের প্রাচুর্য নয়, অর্থের স্বল্পতাকেই নির্দিষ্ট করে। অর্থের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণকে। প্রক্রিয়াটাকে এই ভাবে ভাবুন — অনেক কিছু ছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু জিনিষ আপনি পছন্দ করছেন না, আপনি প্রথমে পুরোটাকে বাইরে বার করে দিলেন, তারপরে ফের ঢুকতে দিলেন, কিন্তু বেছে বেছে, আপনার পছন্দ মাফিক বদলিয়ে। এর উদাহরণ আমরা এখনি পাব।)

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ যখন গড়ে উঠছে, সে বিরাট সংখ্যক পাগল বাউন্ডুলে ভিখিরি বাউলকে অস্ট্রেলিয়া পাঠাচ্ছে, শেষহীন সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে জাহাজে তুলে। জেলে দিচ্ছে। কোনো পাগল বা বাউণ্ডুলে বা ভিখিরি তার শহরে থাকতে পারবেনা। (শহর মানে কী? আমরা আগেই বলেছি, যেখানে পুঁজির নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন চলে, যেখানে গফুর এসেছিল রুটির খোঁজে। শহরের বাইরে মানে সমুদ্রে মানে গ্রামের প্রান্তরে তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম নিয়ে মানুষের রোমান্সের একটা জায়গা এটাও।) আসলে কুষ্ঠাশ্রম থেকে পাগলাগারদ থেকে জেল হাসপাতাল ইস্কুলে এই বহিষ্কারকে দেখালেন ফুকো।

প্রাচীন কালে পাগলকে দেখা হত মহিমার দৃষ্টিতে, ভগবানোপম ভরগ্রস্ততা। (শরিয়তের একটা অংশ আল হাদিস লেখা হয়েছিল হজরত মহম্মদের ভরগ্রস্ততা অবলম্বন করে।) পুঁজি পাগলকে প্রথমে সমাজ থেকে বার করে দিল, শহরে ঢোকা বারণ। তারপর তাকে পাগলাগারদে ঢোকাল। তারপর আনল মনোসমীক্ষণ, সাইকো-অ্যানালিসিস।

ফ্রয়েড পাগলীদের আত্মকথা শুনলেন অনেক, তারপর তাঁর বিদ্যা নির্মাণ করলেন। পাগলের পাগলামিকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আত্তীকরণ করল বিদ্যা। পাগলদের মনের অন্ধকারে আলো ফেলা হল। সাইকো-অ্যানালিসিসের ভিতর দিয়ে, কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো যেমন, পাগলদের রেয়ারিফ্যাকশন ঘটানো হল। প্রতিসরণ আলোক রশ্মির গতিমুখ বদলায়, গতিকে বদলায়, খর্ব করে। পাগলদের পাগলামিরও ডিসপ্লেসমেন্ট, স্থানান্তরণ ঘটানো হল। আমরা, অর্থাৎ পুঁজি সমাজ, পাগলী তোমার সঙ্গে আধুনিক জীবন কাটাতে শিখলাম।

আগে শাস্তি হিশেবে কয়েদিদের দেহকে শাসন করা হত। টুকরো করা হত, পোড়ানো হত, শিকলে বেঁধে। ক্রমে শাস্তি-পদ্ধতির থেকে দেহের উপর অত্যাচার বিকৃতি ও শাসনকে রদ করা হল। বদলে ফেলা হল। কয়েদিকে অন্ধকার কালো কুঠরিতে ঢোকানো হত। সেই কুঠরিতে এবার আলো ফেলা শুরু হল। মধ্যিখানে উঁচু টাওয়ারে বসে আলোকিত বন্দীদের পাহারা দেবেন পর্যবেক্ষক। যার নাম প্যান-অপ্টিকন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু চোখে পড়বে — সর্বদৃষ্টিময়। বন্দীদের উপর আলো না ফেললে, দৃষ্টি না পড়লে, জানা যাবে কী করে যে সে কী করছে? জেল হয়ে উঠল সংশোধনাগার বা রিফর্মেটরি। সেখানে সারাদিন কয়েদিকে পর্যবেক্ষকদের সামনে কাজের রুটিনে থাকতে হবে। দিবারাত্রি প্রহরার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। জেলের ভিতরেও সে শ্রম দেবে। জেল থেকে বেরিয়ে সে ফিরে যাবে পুঁজিবাদী শ্রমপদ্ধতিতে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের দরকার নিখুঁত শ্রমিক। আট ঘন্টা ধরে তার শরীর, অর্থাৎ সে নিজেই, থাকবে কারখানার অফিসের স্কুলকলেজের হাসপাতালের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। অন্য ষোলো ঘন্টাও সে কাটাবে এই আট ঘন্টার প্রস্তুতিতে, তার সমস্ত জীবনকে সে সাজিয়ে নেবে এই মজুরি-শ্রমের আট ঘন্টার সাপেক্ষে। ছোটোবেলা থেকে, শৈশব থেকে, ইস্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে সে প্রস্তুতি নেবে আট ঘন্টার মজুরি-শ্রমের খাঁচায় বন্দী হওয়ার জন্যে। এই খাঁচার বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তার।

যদি বাইরে যেতে চায় তাহলে রয়েছে পাগলাগারদ বা জেলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। আর শরীর যদি অপারগ হয় তার জন্যে রয়েছে হাসপাতাল — সেখানেও চিকিৎসকের অর্হনিশি প্রহরা ও পর্যবেক্ষণ।

পদ্ধতিটাকে ভাবুন — যে প্যান-অপ্টিকন ছিল জেলের ভিতরে তা এবার সারা সমাজ-বাস্তবতা জুড়ে ছেয়ে গেল। দি বিগ ব্রাদার ইজ ওয়চিং ইউ। প্যান-অপ্টিকন হয়ে পড়ল সমাজের অন্তরস্থ। সমাজের প্রতিটি মানুষই হয়ে পড়ল প্যান-অপ্টিকনের অংশ, এক একটা মূর্ত প্যান-অপ্টিকন। হেগেলের ফিলোজফি অফ রাইট নিয়ে আমাদের অধিকারের আলোচনাটা মনে করুন, প্রতিটি নাগরিকই যখন তার বুকের ভিতরে রাষ্ট্রকে বহন করছে। প্রতিটি নাগরিকের বুকের পাঁজরে আঁকা প্যান-অপ্টিকন নামে পুঁজি-রাষ্ট্রের জয়ধবজা। হেজেমনি প্রতিষ্ঠিত। আমরা তাই এবার মজুরি-শ্রমকে মহিমান্বিত করছি। চাকরের কাজ মানে একটা চাকরি পাওয়া মাত্র পরিবারে উৎসব হচ্ছে। বাউন্ডুলে বা বাউল হতে মানুষ এখন থেকে ভয় নয় লজ্জা পাবে। মজুরি-শ্রমকে এতদিনে সম্মানের আকর এবং আকার বলে সে দেখতে শুরু করেছে। মজুরি-শ্রম, ওয়েজ লেবারই পুঁজি মানুষের, আধুনিক মানুষের, চরিতার্থতা এবং ভবিতব্য।

শাসনের আকার বদলাচ্ছে। তার সমভিব্যাহারে বদলাচ্ছে আলোচনার আকার। তত্ত্বের আকার। কথোপকথনের গতি। আগে আমি পাগলামিকে, যুক্তিহীনতাকে, যৌনবিষয়ে সর্বসমক্ষে আলোচনাকে বহিষ্কার করেছিলাম আমার সিভিল সোসাইটি মানে ভদ্দরলোকের পাড়া থেকে। (ভিক্টোরিয়ানরা টেবিলের পায়ায় পাজামা পরাত, নয়া ভিক্টোরিয়ানরা ফ্যাশন টিভি বেআইনি করছে, কালই খবরে দেখলাম)। এবার আমি সেই বহিষ্কারের অবস্থা থেকে আবার তাকে ফেরত আনলাম, শুধু পরিবর্তিত আকারে। রেয়ারিফ্যাকশন। নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ। তাকে আমার পুঁজি মূল্যবোধে ঢেলে সাজিয়ে। যে বালক কিশোরেরা আমার ইস্কুলের কলেজের জেলখানায় ঢুকেছিল তারা বেরিয়ে আসছে পুঁজি-শ্রমিকের যোগ্যতা নিয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসছে যৌনতার পুঁজি মূল্যবোধ। সেই নাদান বাচ্চারা তাদের কথায় আলোচনায় বাথরুমের দেওয়ালে এবং সেক্স-এডুকেশনের ক্লাসে যৌনতার সামাজিক বোধগুলোকে রপ্ত করে নিয়েছে। এখন থেকে আমি পারভারশন বা বিকৃতি শব্দটা বললেই সে কিছু যৌন-আচরণকে চিনে নেবে। হোমোসেক্সুয়াল লেসবিয়ান গে বললেই খারাপ বলে চিনতে অসুবিধা হবে না তার। (এখানেও পুঁজি দিয়ে ভাবুন, কোথায় কোথায় উৎপাদন হয়? হয় এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর, নয় তো নতুন উৎপাদকের, নতুন শ্রমিকের? সেই জায়গাতেই যৌনতা অনুমোদিত। আর কোথাও নয়। আর কোনো রকমের নয়। এক, লাইসেন্স প্রাপ্ত দাম্পত্য বিছানায়, জন্ম দেবে জন্ম দেবে বলে, নতুন শ্রমিকের যোগান। নতুবা বেশ্যাবাড়িতে — সেটা অর্থনীতিরই একটা অংশ। আর সব রকমের যৌনতাই খারাপ।)

জেলখানায় পুলিশের যোগাযোগে আসছে নিচুতলার ক্রিমিনালরা। পুলিশের ইনফর্মাররা, গুপ্তচররা, ক্ষমতার প্যান-অপ্টিকনরা ছড়িয়ে যাচ্ছে সমাজের শিরায় শিরায়, কৈশিক নালীতে। সমাজ থেকে বার করে যাকে জেলে দেওয়া হয়েছিল সে ছিল অশিক্ষিত ক্রিমিনাল, ছিঁচকে চোর। এবার যে বেরিয়ে আসছে জেলখানা থেকে সে অপরাধের এবং ক্ষমতার ব্যাকরণে শিক্ষিত জেন্টলম্যান হুলিগান। মাফিয়া। পলিটিকাল লিডারদের সঙ্গে সে ক্ষমতার দরদস্তুর করে, ভোটে জেতায় এবং হারায়।

বাউন্ডুলে বেকার ভ্যাগাবন্ডদের পুঁজি চাকরি দিচ্ছে, কাজে বাধ্য করছে, পুঁজির মুনাফা-নির্মাণের প্রক্রিয়ায় কাজে আসতে বাধ্য করছে। আমার সমাজের প্রতিমা আমার ফেটিশ এখন পণ্যের কালচার, ওয়ার্ক কালচার। যাকেই, যা কিছুকেই আমি ঢুকতে দিই না কেন, তা হবে আমার সারপ্লাস ভ্যালু তৈরির ব্যাকরণ মোতাবেক বদলে নেওয়া, রেয়ারিফ্যাকটেড।

পাগলকে আমি আমার সমাজের অন্তর্ভুক্ত করলাম তার ওষুধপত্তর এবং কাউন্সেলিং সহ, সাইকো-অ্যানালিসিস দিয়ে বদলিয়ে। আমার পুঁজি-সমাজের বাজারের বাইরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকছে না। যা যা আমার বাইরে ছিল তাকে আমি আমার ভিতরে নিয়ে আসছি আমার নিজের মত করে বদলিয়ে। আমার জানার বাইরে, আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জানার বাইরে যা যা আছে সেটা অনাত্তীকৃত আলোচনা, আমি তাকে বুঝি না, আমার বাজার দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা, তাই তাকে তো আমি অ্যালাও করতে পারিনা। তাকে আমি আবার ভিতরে নিয়ে আসছি, সেই সমস্ত বাজারের বাইরের বিদ্যাকে, আলোচনাকে, তত্ত্বকে। যেমন একসময় কলম্বাসরা যেত নতুন দেশ আবিষ্কারে, জাহাজে করে আমি কিছু সৈন্য পাঠাতাম, সে কয়েকটা দ্বীপ অধিকার করত, তারপরে তার পিছন পিছন গিয়ে পৌঁছত আমার শাসন। তেমনি এখন আমি পাঠাই আমার সংবেদনশীল আঁভাগার্দ শিল্পীকে, উপন্যাসকারকে, তাত্ত্বিককে। তারাই হল আমার প্রথম এজেন্ট। কলম্বাসের মত গিয়ে নতুন জমি খুঁজে দেবে তারা, আমেরিকার, তারপর সেখানে যাবে আমার ব্যবসায়ীরা, ড্রাইভাররা, শ্রমিকরা, গিয়ে আমার সাম্রাজ্যের নতুন উপনিবেশ তৈরি করবে, আমার সাম্রাজ্যকে বাড়িয়ে তুলবে। আমার বাইরে থেকে যাওয়া আমার অনাত্তীকৃত সব বিদ্যা বা আলোচনা হল আনগ্রাউন্ডেড ডিসকোর্স। তাকে আকাশ থেকে শূন্য থেকে অজানা থেকে পেড়ে আনছে আঁভাগার্দ শিল্পীরা লেখকরা ইন্টেলেকচুয়ালরা, লিখছে লিটল ম্যাগাজিনে, টেবিল গরম করছে, তারপর আমার সরকারি ইন্টেলেকচুয়ালরা, মানে অ্যাকাডেমিকরা তাই নিয়ে সেমিনার করছে। আনগ্রাউন্ডেড ডিসকোর্স গ্রাউন্ডেড হচ্ছে। এই দুরকম ইন্টেলেকচুয়ালই আমার অন্তর্গত, আমার ভৃত্য। আমার দুইরকম মনীষী ভৃত্য, মনীষার দুই প্রেমিক, মানে ভৃত্য।

২৭।। নতুন নতুন বর্গের উদ্ভব

এই হল খুব ছোট করে ফুকোর ডিসকোর্স সংক্রান্ত আলোচনা। এটুকু আমাদের করে নিতে হল কারণ উত্তরআধুনিকতায় ডিসকোর্স তথা ডিসকার্সিভ স্পেস বা আলোচনাগত ভূমি একটা আলাদা জায়গা নিয়েছে। একটা দুটো কথা সেটা নিয়ে বলে নেওয়া যাক। (তার আগে একটা ছোটো বিষয় বলে নিতে মন চাইছে, সেটা এই মাল্যবান নিয়ে লেখাটার এই প্রসঙ্গটা পুনর্লিখন করতে গিয়ে আবার মনে হচ্ছিল, এটা কিছুতেই আমার একার লেখা না, এটা ইকনমিক্স অফ মার্ক্স নামের ওই কোর্সের লেখা, যা এখন আর নেই। কাঁটাকলের শেড আর পাঁচিলের মধ্যে দৈত্যাকৃতি নাগকেশর গাছে এখনো ফুল ফোটে, কিন্তু তার কেশর চিবোতে চিবোতে, বোধহয় ঘাসের অভাবে, মার্ক্স-লুকাচ-হেগেল নিয়ে ওইসব মাথামোটা আখাম্বা তর্ক যা ব্যানার্জি আর আমি করতাম, সেগুলোর জন্যে আর লোক মিলবে না। আমরা তো আসলে লিখি না, লেখায় ভূমি-সময়-সংবেদনের একটা সমাহার, সেই সমাহারটাই বেশ বেপাত্তা হয়ে গেল বোধহয়। যারই চিহ্ন, হয়তো, কোর্সটার আর না-থাকা। আর একটা সময় এসে যাচ্ছে যারা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান শোনেনি, ঋত্বিক এর পর যে ঘটক আসতে পারে সেটা জানেই না, দেবব্রত বিশ্বাস যে শুধু গান নয় একটা সময়ের স্পর্ধাকে গাইতেন সেটা তারা কোনোদিনই বুঝবে না। আমাদের সময়ের সংস্কৃতির ল্যান্ডমার্কগুলো, অজিতেশ শম্ভু মিত্র একুশে ফেব্রুয়ারি এগুলো বড্ড ঝট করে হাওয়া হয়ে গেল। সিপিআইএম-এর এই নেতাগুলোকে তখন প্রচণ্ড শক্তিমান লাগে যখন দেখি এদের নাকচ করতে গিয়ে বাংলার ইতিহাসের একটা বড় জায়গা জুড়ে পুরো বাম-সংস্কৃতির আবেগটাই নাকচ করে ফেলল সংবেদনশীল বাঙালি। এর পর হয়তো ধর্মের ফ্যাসিজমেও তার আবেগ খুঁজে পাবে।)

যা বলছিলাম, উত্তরআধুনিক তত্ত্বের একটা খুব বড় জায়গা জুড়ে টেক্সট মানে আলোচনা মানে তত্ত্বের জন্যে আলাদা একটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসলে সবই তো সময়ের পোলেমিকে গজিয়ে ওঠে, একটা কোনো

অনুকূলতা প্রতিকূলতার সূত্র ধরে। বোধহয়, এর আগেকার সেই বামপন্থী নিদান বেস দিয়েই সব কিছু বোঝার কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে করতেই বেস দিয়ে কিছু না-বোঝার একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে।

শ্রেণী-সংগ্রামের দায়িত্ব দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করে ফেলার ফ্যাসিস্ট ব্যাখ্যার বিপরীতে এসে গেছে দায়িত্ব নামক বর্গটাকেই জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আকাঙ্খা। তাই, তত্ত্বের নিজেরও একটা ব্যাকরণ আছে, যেখানে পুরোটা অর্থনীতি সমাজব্যবস্থা দিয়ে বোঝা যাবেনা, এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বারবার ঘোষণা করতে গিয়ে তারা তত্ত্বের সঙ্গে বাইরের বাস্তবতার কোনো রকম কোনো সম্পর্ককেই নাকচ করে দিয়ে বসে আছেন বহু জায়গায়। (যদি কেউ আমার মত বা আমার চেয়েও বয়সে বড় থাকেন তারা হয়ত আর্ট ফর আর্টস সেক নিয়ে অনেকটা এরকম আর একটা আন্তর্জাতিক তর্ককে মনে করতে পারবেন।)

উত্তরআধুনিকতার সবার অবস্থান যে এই একই তা নয়, কিন্তু এই প্রবণতা প্রচণ্ড ছাপ ফেলেছে বিশেষত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে সাহিত্যপাঠকে ঘিরে উত্তরআধুনিকতা চর্চায়। দুটো দিকই খেলা করে অনেক লেখায়। যেমন দেরিদা অনেক বেশি সামাজিক জায়গাকে জায়গা দিয়েছেন, বিশেষত তার পরের দিকের লেখাগুলোয়, স্পেকটারস, ইউরোপ, ফ্রেন্ডশিপ ইত্যাদিতে। এমনকী অফ গ্রামাটোলজির মত গোমড়ামুখো গ্রন্থেও এই ছায়া পরিষ্কার দেখানো যায়, বিশেষত সাপ্লিমেন্ট অংশে। মার্জিনস বা রাইটিং অ্যান্ড ডিফারেন্স-এও আছে। পল ভ্যালেরির উপর একটা লেখা আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি। এর উল্টো দিকে বদ্রিলারকে ভাবুন, তার ট্রানসপ্যারেন্সি অফ ইভিল বা ইন দি শ্যাডো অফ দি সাইলেন্ট মেজরিটিজ। বইটার নামটা দেখলেই গা জ্বলে যায়। লিওতার অনেক ব্যালান্সড। তার পলিটিকাল রাইটিংস বলে একটা সংকলন আছে আমার কাছে — বেড়ে বই। যাইহোক, এই ডিসকার্সিভ স্পেস বা আলোচনাগত ভূমির প্রসঙ্গটা মাথায় রাখুন। এবার পরের সেকশন যেখানে অন্য উত্তরআধুনিকদের সঙ্গে আমাদের অবস্থানের পার্থক্য চিহ্নিত করব আমরা।

আর একটা পুরোনো প্রশ্নের উত্তরও মিলল আমাদের। সেকশন ৫ আমরা শেষ করেছিলাম এই প্রশ্ন দিয়ে উত্তরআধুনিকতার, পোস্টমডার্নিজমের জেহাদটা কার বিরুদ্ধে ? এককথায় বলতে গেলে এইমাত্র ফুকো দিয়ে আমরা যে মনের উপর চিন্তার উপর জীবনের উপর শাসনকে দেখলাম, তার বিরুদ্ধে। রিজনের বিরুদ্ধে। মডার্নিজমের বিরুদ্ধে। শাস্ত্র এবং ট্রাডিশনের পুরোনো ঈশ্বরের জায়গায় মডার্ন মানুষ বসিয়েছে এক নতুন ভগবানকে, তার নাম রিজন, যুক্তি। এই যুক্তির বিরুদ্ধেই জেহাদ পোস্টমডার্নিজমের। যে যুক্তি মনে করে আলোকিত বইয়ের খোলা পাতার মত সে বাস্তবতাকে পড়ে ফেলবে। কোথাও কোনো কুয়াসা কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

কিন্তু, আগেই তো বলেছি, বইটা আলোকিত মানেই বইয়ের বাইরেটা অন্ধকার। সেখানের সেই অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে আসে মাঝেমাঝেই এই আলোকিত বইয়ের পাতায়। যাদের আমরা আর বুঝতে পারিনা। এরাই যুক্তি দিয়ে বোঝা বিশ্বের মধ্যে অযুক্তির প্রতিরোধ, লাকাঁ এদের ডেকেছিলেন সিম্পটম বলে। চালু পুঁজিবাদী যুক্তি এদের অপ্রয়োজনীয় বলে সরিয়ে রাখে, সরিয়ে রাখে চিরাচরিত ধারার মার্ক্সবাদও, কারণ সেই তত্ত্বও একইরকম কেন্দ্রিকতার কুসংস্কারে আক্রান্ত। যুক্তির এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই জেহাদ উত্তরআধুনিকদের। এখানটাতেই আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা তাদের। আমরাও এই যান্ত্রিক এসেনশিয়ালিজম থেকে মার্ক্সবাদী বর্গগুলোকে বার করে আনতে চাইছি। যুক্তি দিয়ে তুমি যদি পুরোটাকে বুঝতে চাও তো তুমি আসলে তোমার তত্ত্বকে অত্যাচারী এবং অবুঝ করে তুলছো। তুমি অযুক্তির পাঠ নিতে শেখো, দেখবে পৃথিবীর সব বেদনার ব্যাকরণই একটা জায়গায় এক। একটা সম্মিলিত জয়েন্ট ফ্রন্ট বানাতে পারবে তুমি। ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন অন্তরে সব একাঙ্গী।

চালু এবং আবহমান মার্ক্সবাদের সম্পূর্ণ সমগ্রের কেন্দ্রিকতার ফ্যাসিজমের প্রতিক্রিয়ায় নতুন নতুন বর্গের উদ্ভব হতে শুরু করল। যারা ওই পুরোনো এসেনশিয়ালিজম থেকে সমাজভাবনাকে বার করে আনতে চাইছিল। তারা তত্ত্বের তথা মননের জগতে রাজনীতির নতুন ব্যাকরণ খুঁজতে শুরু করলেন। সেরকম একটা নতুন জায়গাকে আনলো সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ। এইরকম প্রয়াস ক্রমে আরো ঘটতে লাগলো, তত্ত্বের জগতে বামপন্থী উপাদানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে আসতে শুরু করলো উত্তরআধুনিক এবং উত্তরঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক অবস্থানগুলো। ক্রমে তাদের কয়েকটাকে আলোচনায় আনব আমরা।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের শরীরে গ্রামশি যে নতুন ভাবনাগুলো এনেছিলেন, তারই কিছু কিছু জায়গাকে নিজেদের আলোচনায় নিয়ে এসেছে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ঘরানা। এই সাবঅল্টার্ন শব্দটার মধ্যেই আগেকার বামপন্থী চিন্তার সঙ্গে তফাতটা চিনতে পারবেন। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ঘরানার ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিকরা স্টাডি করতে চান সাবঅল্টার্নকে।

সাবঅল্টার্নই তাদের কেন্দ্রীয় বর্গ। প্রাকৃত মানুষ। তার বিরোধ এলিট বা কুলীনের সঙ্গে। মিল এবং গরমিলটা লক্ষ্য করুন, মার্ক্সবাদী ঘরানার সঙ্গে। মার্ক্সবাদী দর্শন হল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ। এখানে কেন্দ্রীয় বর্গ শ্রমিকশ্রেণী। তার জায়গায় সাবঅল্টার্ন এখানে কেন্দ্রীয় বর্গ। তার মতাদর্শের এবং সংস্কৃতির লড়াই এলিটের সঙ্গে। শাসনের নিরিখে পরাজিত এই সাবঅল্টার্নের প্রতিরোধের চিন্তাকে খোঁজা শুরু করলেন সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর গবেষকরা। এখানে প্রথম গরমিল, বেস বনাম সুপারস্ট্রাকচার এই সম্পর্কে বেসের দ্বারা শাসনের এসেনশিয়ালিজম-এর বিরোধিতা। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর কাজ ইতিহাস খুঁড়ে খুঁড়ে প্রতিরোধের সংস্কৃতিকে খুঁজে পাওয়া। প্রথমেই গুরুত্বপ্রদানের জায়গাটা বদলে গেল। মার্ক্সবাদ যেখানে অর্থনীতির ইতিহাস দিয়েই একমাত্র বুঝতে চাইত, এই গবেষকরা বুঝতে চাইছেন সংস্কৃতির ইতিহাস দিয়ে। মনন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র গুরুত্ব নিয়ে হাজির হল সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর তত্ত্বে।

দ্বিতীয় গরমিল, তত্ত্ব ও বাস্তবতার সম্পর্কের জায়গায়। মার্ক্সবাদ তত্ত্বের জগতে ব্যাখ্যা এবং উপদেশকে, থিয়োরি এবং প্রেসক্রিপশনকে তৈরি করে তার শুধু প্রয়োগ ঘটাত বাস্তবতায়, মানে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে সংগঠিত করে। অর্থাৎ দুই মূল বর্গ, শ্রমিক ও মালিক, এদের ভিতর বিরোধিতাকে বুঝত তার তত্ত্ব দিয়েই, তারপর সেই বিরোধিতাকে শ্রেণীসংগ্রামের আকার দিত। তত্ত্ব এখানে কারণ, বাস্তবতা কার্য। বিরোধ এবং প্রতিরোধকে তত্ত্ব যেমন বোঝাল তেমন তার প্রয়োগ করল কমিউনিস্ট পার্টি তার চারপাশের বাস্তবতায়। তত্ত্ব থেকে বাস্তবতায় পৌঁছত। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ সেখানে সম্পর্কটাকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখতে চাইছে। তারা বাস্তবতা থেকে তাদের তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌঁছতে চাইছেন। তারা ইতিহাসকে নতুন করে পড়তে চাইছেন। ইতিহাস জুড়ে ক্ষমতাসীন মানুষ আর ক্ষমতাহীন মানুষের বিরোধের কাহিনী বিধৃত। সেই কাহিনীকে নতুন করে পড়তে পড়তে তার ক্ষমতাহীন মানুষ সাবঅল্টার্নকে, ক্ষমতাসীন মানুষ এলিটকে বুঝে ফেলতে চাইছেন এরা। এবং সেখান থেকে, সেই ইতিহাস থেকে এলিট-সাবঅল্টার্নের বিরোধের তত্ত্বে।

এইভাবে মার্ক্সবাদী কেন্দ্রিকতার বিপরীতে নতুন নতুন বর্গকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, নতুন ভাবে সমাজে শাসনের গতিটাকে ভাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এদের কাছে শাসনের মডেলের আকারটা নিয়ে একটু বলে নেওয়া যাক। এটা পরে আমাদের স্পিভাকের সাবঅল্টার্ন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের আলোচনাতেও লাগবে। একটা শাসনকে ভাবুন। শাসন নামক ক্রিয়ার দুই দিকে দুটো বর্গ। শাসক আর শাসিত। কুলীন আর প্রাকৃত। এলিট আর সাবঅল্টার্ন। প্রভু আর ভৃত্য। তাদের মধ্যে শাসনের সম্পর্কটা হল বশীকরণ এবং বশ্যতার (ডমিনান্স এবং সাবঅর্ডিনেশন)। প্রভু বশ করে, ভৃত্য বশ মানে। এই বশীকরণ আবার দুই ভাবে হয়। চাপসৃষ্টিকরণ এবং নিপীড়ন (পারসুয়েশন এবং কোয়েরশন)। প্রভুর এই বশীকরণের বিপরীতে ভৃত্যের বশ্যতা আবার দুভাবে হয়, সাহায্য এবং প্রতিরোধ (কোলাবোরেশন এবং রেজিস্টান্স)। গ্রামশির তত্ত্বের অনুসরণে আমাদের এই ছকটা একবার সাজিয়ে নেওয়া যাক। এই বিষয়গুলো আমরা আগেই একাধিকবার ছুঁয়ে গেছি।

শাসন $\rightarrow$ বশীকরণ + বশ্যতা

বশীকরণ $\rightarrow$ চাপসৃষ্টিকরণ + নিপীড়ন

বশ্যতা $\rightarrow$ সাহায্য + প্রতিরোধ

শাসনের মূলধারা চলে প্রভু থেকে ভৃত্যে বোঝানো এবং চাপসৃষ্টিকরণ অর্থাৎ পারসুয়েশন-এর রূপে, এবং ভৃত্য থেকে প্রভুতে সাহায্য বা কোলাবোরেশনের রূপে। তার মধ্যে মধ্যেই বেঁচে থাকে নিপীড়ন-এর প্রয়োজন এবং প্রতিরোধ-এর অবশ্যম্ভাবিতা। এবার দেখুন, বশীকরণ এবং বশ্যতা — এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত, একটা প্রভু থেকে ভৃত্যে এবং অন্যটা ভৃত্য থেকে প্রভুতে — প্রভু ভৃত্যকে দেয় পারসুয়েশন, বিনিময়ে ভৃত্য প্রভুকে দেয় কোলাবোরেশন।

এবার শাসনকে দেখার সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর পদ্ধতির বিষয়ে এই আলোচনাকে মাথায় রেখে আমরা সাবঅল্টার্নকে নিয়ে স্পিভাকের প্রশ্নটাকে পড়ব। কিন্তু তারও আগে দরকার উপনিবেশ এবং উত্তর-উপনিবেশ নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়ার, আমাদের নিজস্ব বর্গ সিন্থেটিক স্পেস যার শুধু নামটুকু করে এসেছি আমরা তাকে একটু বুঝিয়ে নেওয়া।

২৮।। উত্তর-উপনিবেশ

সমগ্র সময় ও সাম্য এই তিনটে কুসংস্কারের প্রতি আপত্তির জায়গা থেকে দেখলে উত্তর আধুনিকতার অন্যান্য অবস্থান গুলোর সঙ্গে আমাদের অবস্থানের আন্দাজ পাওয়া শক্ত হবে। তার সঙ্গে প্রয়োজন হবে, কলোনি ও পোস্টকলোনি

(উপনিবেশ ও উত্তর-উপনিবেশ) এই সম্পর্কটাকে ভাবা। পোস্টকলোনিয়াল বা উত্তরঔপনিবেশিক বলতে আমরা ঠিক কী বোঝাচ্ছি এই প্রশ্নটার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রয়োজন পড়বে সিন্থেটিক স্পেস বা কৃত্রিম ভূমির আলোচনা, গ্রামশির সূত্রে আমাদের আনা সিম্পল স্পেস এবং কমপ্লেক্স স্পেস (সরল ভূমি এবং জটিল ভূমি) এই দুটোর সঙ্গে যার নামটুকু জাস্ট উল্লেখ করেছিলাম আমরা।

সরল যৌগিক এবং কৃত্রিম এই তিন বর্গে ভূমির প্রকারভেদটা নির্দিষ্ট করা যায় গ্রামশির প্যাসিভ রেভলিউশনের আলথুসারিয় আলোচনা করতে গেলেই। প্যাসিভ রেভলিউশন মানে আর কিছু না, যে পদ্ধতি আমরা আগেই বলেছি, যখন সঠিক সঙ্গত সমগ্রটাকে কিছুতেই ঘটিয়ে তুলতে পারেনা পুঁজিব্যবস্থা, শেষ অব্দি বাধ্য হয়ে একটা সারোগেট বা ক্ষেত্রজ সমগ্র ঘটিয়ে তোলে।

এই পদ্ধতিটাকেই যখন আমরা শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্রিয়ার দিক দিয়ে দেখছি তখন ডাকছি প্যাসিভ রেভলিউশন বলে। ধরুন গান্ধী-নেহরুকে কেউ কেউ প্যাসিভ রেভলিউশন হিশেবে দেখেছেন। বিশুদ্ধ পুঁজিব্যবস্থা আনা যাচ্ছে না তাকে ভারতের আবহমান অর্থনীতি ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করে হাজির করলেন গান্ধী নেহরু। ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা প্যাসিভ রেভলিউশন ঘটল এরকম বলা যায়। (যে অপ্রতিহত গতিতে যে পরিমাণ অতিসরলীকরণ আমি নির্দ্বিধায় করে যাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে, কোনো সিরিয়াস লোকের চোখে যদি ভুলক্রমেও অপরের এই সংখ্যাটা পড়া খুব বিপজ্জনক হতে পারে। তবে এখানে আমার একমাত্র ভরসা বাংলার একজন আদি ও মহত্তম লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এই লেখাটা লিখে যাচ্ছি তার মডেলে তারই দেওয়া সাহসে। এলিট জীব গোস্বামী খার খেয়ে গেছিলেন কৃষ্ণদাসের উপর, কারণ তাঁদের সংস্কৃতে লেখা গূঢ় তত্ত্বাবলী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন সাবঅল্টার্ন কৃষ্ণদাস, যাকে তার পাঠকরা আদর করে ডেকেছিল কবিরাজ, আসলে তিনি ধর্মগ্রহণের জায়গায় গোস্বামী অব্দি ছিলেন না, বছরের পর বছর তিনি ভৃত্যের কাজ করে গেছেন অন্য নামী গোঁসাইদের, রূপ গোস্বামীর, রঘুনাথদাসের, নিজের চেয়ে বয়সে ছোট বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন তাঁর অনন্য সাহিত্য ও তত্ত্বগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত।)

আলথুসারের ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয়ের মাপকাঠিতে যদি বিচার করি, গ্রামশির প্যাসিভ রেভলিউশনের ফল হল সিন্থেটিক ভূমির নির্মাণ। (যদিও, এটা উল্লেখ করে রাখা ভাল, আলথুসের কিন্তু গ্রামশির মধ্যে কিছু ইতিহাসবাদী ঝোঁক, বা হিস্টরিসিজমের ট্রেস পেয়েছিলেন। হিস্টরিসিজম বলতে আমরা যেটাকে সময়ের একমুখী গতিতে বিশ্বাস বলে উল্লেখ করেছি তারই একটা সমস্যা বলে ধরতে পারেন।) এই সিন্থেটিক ভূমিকে একটা ডিসকার্সিভ স্পেস, বোধগত আলোচনাগত ভূমি হিশাবে ভাবুন — নিয়ত যেখানে মডার্নিজম আর ট্র্যাডিশন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের পারস্পরিক অতিনির্ণয়ের খেলা চলছে। আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে ভাবুন। সেখানে কতকিছু ঘটে চলেছে প্রতি মুহূর্তেই, নিয়ত ট্রাডিশন আর মডার্নিজম মিশে যাচ্ছে, এইচডিএফসি ব্যাংকের সেই উদাহরণটা মনে করুন, আধুনিক পুঁজিব্যবস্থার একটা সেক্টর গৃহপ্রবেশের শুভদিন জানাচ্ছে তার বিজ্ঞাপনে, নিয়ে আসছে আমাদের ট্রাডিশনের একটা জায়গাকে।

সেই খেলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পরপর ঘটে চলেছে মেটাফোরিক আর মেটোনিমিক বদল (সেকশন ৬)। মেটাফোরিক বদল বলতে আমরা বোঝাই এমন অবস্থাকে যখন মূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে তার সরাসরি একজন বদলি যে তার চেয়ে ন্যূন নয়, গুরুত্বে তার সমান। আর মেটোনিমিক বদল মানে প্রতিনিধি মূলের চেয়ে ছোটো, খাটো, ক্ষুদ্রতর। রাজার জায়গায় রাজদণ্ড। এই দ্বিপাক্ষিক খেলা খেলতে খেলতে দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা, আধুনিকতাও আর আধুনিকতা থাকছেনা, ঐতিহ্যও আর ঐতিহ্য থাকছেনা। এই খেলাটা পশ্চিমকে পূবের সঙ্গে, মডার্নকে ট্রাডিশনের সঙ্গে, কলোনাইজারকে কলোনাইজডের সঙ্গে, মারুতিকে ঠেলার সঙ্গে শুইয়ে দিচ্ছে একই বিছানায়। মাপ কোরো জয় গোঁসাই তোমার লাইনটা বদলে আর বেড়ে গেল বলে।

কিন্তু, প্লিজ, মাথায় রাখবেন ওই দুধরনের খেলার অসমতার জায়গাটাও। (আমরা সেকশন ২ এর একদম শেষে বাক্যে এই পয়েন্টটা চিহ্নিত করে এসেছিলাম, পাতা উল্টে দেখে নিন।) একই ক্রীড়ায় একজন ক্রীড়ক আর একজন ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতোটা কেলো যদি নাও ঘটে, অ্যাট লিস্ট দুজনে বদলাচ্ছে দুই ভাবে। দুজনই দুজনকে অতিনির্ণয় করছে। কিন্তু সেই অতিনির্ণয় সমান না। যেমন গনতন্ত্রে উই আর অল ইকোয়াল বাট সাম আর মোর ইকোয়াল দ্যান দি আদারস। যে উদাহরণ আমরা অন্য প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি, সেটাই আর একবার করা যাক। আমাদের অ্যাকাডেমিকদের কা কা রবে বিদেশের বিদ্যালয়ের উঠোন এমনকী সামনের ফুটপাতগুলো অব্দি। কিন্তু

কজন সাহেব আমাদের দেশে এমনকী সেমিনার করতে অব্দি আসেন আধুনিক পশ্চিম থেকে এই ট্রাডিশনাল পূর্বে? রবিশঙ্কর রবিশঙ্কর হয়ে উঠলেন আমেরিকায় বাজাতে বাজাতে — কিন্তু কলকাতার ছোঁড়ারা কি একবারও বেলেল্লা করতে পারল নজরুল মঞ্চে মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে নেচে?

আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের ক্রীড়ার এই ভূমিটাকেই আমরা ডাকছি কৃত্রিম ভূমি, সিন্থেটিক স্পেস বলে। যেখানে অতিনিয়ন্ত্রণের সাম্য আছে কিন্তু সেই সাম্যের মধ্যে রয়েছে আপাত-গোপন অসাম্য। (এই পয়েন্টটায় আরো ভালো করে আমরা আলোচনা করব মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন-এর প্রসঙ্গে, যার আগে একটু ভাভা জেনে নিলে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা পরে আসছি এইখানটায়।) গ্রামশি-আলোচনার পরিচিত বর্গ যৌগিক ভূমি, কমপ্লেক্স স্পেস থেকে এটা আলাদা। গ্রামশি-আলোচনায় যৌগিক ভূমিকে আমরা আলাদা করেছিলাম সরল ভূমি থেকে। সরল ভূমি একটা সহজ ত্রুটিহীন হেগেলীয় সমগ্র। এই সমগ্রে আধুনিকতা নামক থিসিস (যার আধার স্টেট, সিভিল সোসাইটি) তার অ্যান্টিথিসিস ঐতিহ্যকে দেখে নিচু চোখে, দেখে তার নিজের রিজন-এর, যুক্তিবোধ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিবন্ধক হিশেবে। এদের আন্তঃক্রিয়ায় নির্মিত হয় সিন্থেসিস — নেশন স্টেট, জাতি।

এর বিপরীতে, চালু গ্রামশি-আলোচনায়, যৌগিক ভূমি হল একটা পরিবর্তিত ক্ষেত্র, আধুনিকতা আর ঐতিহ্যও এখানে পরিবর্তিত। সরল ভূমির মত তারা আর বিশুদ্ধ ক্যাটিগরি নেই। সঙ্গত স্বাভাবিক হেগেলিয় সমগ্রটি আর নেই। তার জায়গা নিয়েছে সারোগেট ইউনিভার্সাল, বদলি সমগ্র। কিন্তু, লক্ষ্য করুন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য এখানেও চিরাচরিত হেগেলিয় রকমে অ্যান্টাগনিস্টিক, পরস্পরবিরোধী।

এই শত্রুতা কিন্তু আমাদের কৃত্রিম ভূমি বা সিন্থেটিক ভূমির ক্ষেত্রে আর সত্যি নয়। আগেই তো বললাম, তারা পরস্পরের বন্ধু, এমনকী শয্যাসঙ্গীও। তারা আর মডার্নিজম আর ট্রাডিশনই নেই। (আমরা পরে, ঔপনিবেশিকতার উদাহরণে বিশদ ভাবে দেখাব সিন্থেটিক ভূমি বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি।) মডার্নিজম আর ট্রাডিশন দুজনেই বদলে গেছে দুজনের প্রকোপে। তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে আমরা থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস-এর যে সম্পর্কটাকে আমরা চিরকাল বুঝে এসেছি অ্যান্টাগনিজম বা শত্রুতা দিয়ে সেটার এবার আমরা পিন্ডি চটকে দিলাম। (আসলে এই বদলটা ঘটল আরও গভীর এবং জটিল একটা স্তরে। আমরা হোলের অধীনস্থ বিভিন্ন পার্টদের পারস্পরিক সম্পর্কের গঠনটাকেই বদলে দিলাম, কিন্তু সেটা পুরোটা এখানে বোঝাতে গেলে হবসের লেভিয়াথান অব্দি টেনে আনতে হবে।)

বাকি রইল পোস্টকলোনি বা উত্তরউপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ ধীরে ধীরে পরাধীন দেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করল। তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের জায়গায় দেশীয় লোকেদের সরকার। কলোনি গুলো আর কলোনি রইল না। কিন্তু সত্যিই কি রইল না? দেখা গেল এই দেশগুলোর, যারা একসময় কলোনি ছিল, ইতিহাসে কিছু একই ধরনের ব্যাপার ঘটছে। একসময় যে কলোনি ছিল এই ইতিহাসটা এদের অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি, ইকনমিক পলিটিকাল কালচারালের ক্ষেত্রে কিছু বিশিষ্টতা প্রদান করল। একটা নতুন ধরনের তাত্ত্বিক ক্ষেত্র জন্মাল এদের ইতিহাস এবং বাস্তবতা বিচারের — পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজ। আমরা আমাদের 'মার্জিন অফ মার্জিন' নামের তাত্ত্বিক অবস্থানে এই পোস্টকলোনির সাপেক্ষেই প্রশ্ন তুলেছি। পরে আসছি সেই কথায়।

পোস্টকলোনি আমাদের কাছে একটা সিন্থেটিক স্পেস বা কৃত্রিম ভূমি। হোমি ভাভা, একে দেখেছেন থার্ড স্পেস হিশেবে। কেউ কেউ পোস্টকলোনিকে হাইব্রিড স্পেস হিশেবেও দেখেছেন। (একটু বাদেই স্পষ্ট হবে, এই বিভিন্ন ধরনের স্পেস-ধারণার ভিতর পার্থক্যের জায়গাটা)। আগেই বলেছি, আমরা সিন্থেটিক স্পেসকে দেখি এমন একটা ভূমি হিশেবে যেখানে ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয় কাজ করছে ট্রাডিশন আর মডার্নিজম-এর ভিতর, কিন্তু এই অতিনির্ণয়টা নিজেরি একটা মিমিক্রি বা নকল হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা খেলা খেলা এবং দেখনাই অতিনির্ণয়। যেখানে অতিনির্ণয়ের অংশীদাররা পরস্পর পরস্পরকে সমানভাবে নির্ণয় এবং নির্মাণ করেনা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা অসমান। ট্রাডিশন যেভাবে মডার্নিজমকে অতিনির্ণয় করে মডার্নিজম সেভাবে ট্রাডিশনকে করেনা। তাদের দুজনের দুটো অতিনির্ণয়ের রকমের ভিতর ফারাক আছে।

কেন্দ্র যেভাবে পরিধি-কে নির্মাণ ও নির্ণয় করে, পরিধি সেভাবে কেন্দ্রকে করতে পারেনা। কেন্দ্র পরিধিকে শাসন করে মেটোনিম দিয়ে, পরিধি তার প্রত্যুত্তর দেয় মেটাফর-এ। এই শেষ বাক্যটাকে কিছুতেই এখানে পুরোটা বোঝানো যাবেনা, অনেক বেশি টেকনিকাল ভাবে লেখার প্রয়োজন পড়বে। শুধু আমাদের আগের রবিশঙ্কর-জ্যাকসন উদাহরণ দিয়ে এটাকে একটু বিশদ করা যায়। জ্যাকসন তো আসেন না, কিন্তু তার ছবিরা ভিডিওরা সংবাদরা এখানে আসে,

এখানের সংস্কৃতিচর্চার উপর তার শাসনটা গড়ে তোলে সেই মূল জ্যাকসনের জায়গায় তার খণ্ডউপস্থিতির মেটোনিমরাই। আর পশ্চিমের কাছে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রতিনিধিত্ব করতে রবিশঙ্করকে যেতে হয়।

এর পরে এই তুলনাটাকে আরো বুঝতে চাইলে একটু লাকাঁ লাগবে। এই মেটাফর মেটোনিম বর্গগুলো নিয়ে আসার একটা বড় কারণ অবশ্যই লাকাঁর তত্ত্বকে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা। সেই তত্ত্ব নিয়ে একটুও না বলে এদের নিয়ে আর এগোনো যাবে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত মোতাবেক লাকাঁকে আমরা বাদ দিয়ে রাখব আমাদের লেখা থেকে। একটা জটিলতা থেকে মুক্তির চেষ্টায়। যদি অপরের ছেলেরা চায় তাহলে মোট রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের জগতের সঙ্গে লাকাঁর সম্পর্কটা নিয়ে পরে একটা পৃথক এবং বিশদ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে।

এর পরের সেকশনেই আমরা বুঝতে চাইব ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক এই লেখাটায় গায়ত্রী স্পিভাকের তাত্ত্বিক অবস্থানটা ঠিক কী। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ঘরানার আলোচনায়, বা স্পিভাক এই আলোচনাকে যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন এই লেখাটায়, তাতে ক্ষমতার সম্পর্ক মানেই একটা একমুখী স্রোত। বশীকরণের একটা ওয়ান-ওয়ে-ট্রাফিক। শাসন একমুখী। এলিট শাসন করে সাবঅল্টার্নকে, কুলীন করে ব্রাত্যকে। কুলীন বা ব্রাত্য বলতে আলাদা আলাদা কমবিনেশন হতে পারে। কখনো কুলীন বলতে পুঁজি, মজুরি শ্রম তখন ব্রাত্য। এছাড়াও শ্রেনী, জাতপাত, চামড়ার রং, সামাজিক ক্ষমতার ক্রমভেদে আপেক্ষিক অবস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই আসতে পারে কৌলীন্যের আর ব্রাত্যতার মাপকাঠি হিশেবে।

এবার আমাদের প্রশ্নটা হল — এই কুলীন-ব্রাত্য ছকটা ধূসর, না সাদা-কালো অক্ষরে স্পষ্ট? কুলীনকে বা ব্রাত্যকে, বা ব্রাত্য-র উপর কুলীনের শাসনকে কি সবসময়ই খুব স্পষ্ট সাদা কালো অক্ষরে চিনে নেওয়া যায়, নাকি সেখানে অনেক অস্পষ্ট ধূসরতা আছে? আমাদের সিন্থেটিক স্পেস-এর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ভাবুন। বর্গগুলো, যেমন মডার্নিজম ট্রাডিশন, বা এলিট সাবঅল্টার্ন, বা শ্রমিক মালিক, এরা যদি আর তাদের পুরোনো জায়গায় না থাকে, যদি তারা পরস্পরের মধ্যে পরস্পর ঢুকে এসে থাকে, যদি তারা প্রত্যেকেই অন্যের দ্বারা বদলে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের পুরোনো চেনা স্পষ্ট অবয়বে আর আমরা তাদের পাব না।

আমরা এর আগের সেকশনগুলোয় যে কথা গুলো বলেছি তার সাপেক্ষে ভাবার চেষ্টা করুন, খুব স্পষ্ট একটা সমগ্র যদি না থাকে, যদি খুব স্পষ্ট ঐতিহাসিক একটা গতিরেখা না থাকে, তাহলে এই বর্গুলোকেও কখনোই আঙ্কিক স্পষ্টতায় চেনা যাবে না। তাদের প্রতিটি অস্তিত্ববাচক বর্গই ভেজা কাগজে আঁকা ওয়াশ ছবির মত নিজেদের চারপাশে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকবে, কোথাও কোথাও মিশে মিশে যাবে তারা। আর তাই যদি হয় তো তাদের আভ্যন্তরীন শাসনক্রিয়াকে খুব আঙ্কিক স্পষ্টতায় কখনোই চিহ্নিত করা যাবে না। আমরা আমাদের সামাজিক ভূমিকে এভাবেই ভাবতে চাইছি, নানা দিক থেকে বারবার সে আলোচনা আমরা করেছি।

স্পিভাকের প্রশ্নটাকে এইরকম একটা সামাজিক ভূমিতে পুনরুচ্চারণ করব আমরা। এই সামাজিক ভূমিটা হবে আমাদের পছন্দ মোতাবেক — একটা পোস্টকোলোনিয়াল, উত্তর-উপনিবেশ উপত্যকা, যেখানে প্রতিটি বর্গই ধূসরের প্রকারভেদ, কোনো স্পষ্ট সাদা কালো সেখানে নেই। আমাদের সাবঅল্টার্ন অনেক ধূসর। স্পিভাকের ব্রাত্যের মত ঝকঝকে, বিজ্ঞাপন-স্পষ্ট, শার্প-ইন-ফোকাস নয়। আমাদের বই, মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর-এ আমরা এই আউট-অফ-ফোকাস সাবঅল্টার্নকে আমরা ডেকেছি স্যাভেজ বলে। 'স্যাভেজ' শব্দটার ইংরিজি বানানটা ভাবুন। এস এ ভি এ জি ই। মধ্যের ভি এ অংশটাকে বাদ দিলে পড়ে থাকে সেজ। আমাদের এই স্যাভেজ তার বুকের গভীরে বহন করে বেড়ায় একজন ঋষিকে, তার অর্ন্তদৃষ্টি ও জ্ঞান, তাঁর চৈতন্য। এবার সরাসরি স্পিভাকের প্রশ্নটায় যাওয়া যাক।

২৯।। সাবঅল্টার্নের কথা বলা

ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক? সাবঅল্টার্ন কি কথা বলে উঠতে পারে? কিন্তু, "সাবঅল্টার্নের কথা বলা" — এই প্রসঙ্গটার মানে কী? কথা বলে ওঠা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? তার পরে তো আমরা আলোচনা করব কথা বলে ওঠাটা কতটা সম্ভব, স্পিভাক যে প্রশ্নটা করেছিলেন।

পৌরাণিক মার্ক্সবাদ, যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, সাবঅল্টার্নের কথা তার হয়ে বলে দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করে তার একমাত্র বৈধ স্বামী কমিউনিস্ট পার্টির উপর, আগেই বারংবার বলেছি আমরা। এবং তাদের তাত্ত্বিক ফ্যাসিবাদের কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্য কোনো ভাবে কোনো কথা বলার কোনো উচ্চারণের কোনো সম্ভাবনাই তার কাছে নেই। ট্রাডিশনাল মার্ক্সবাদের কাছে বাস্তবতাটা একমাত্রিক। মালিক-শ্রমিক। লেনিন

বলেছিলেন যে, কথা বলার জন্যে প্রয়োজনীয় চৈতন্য শ্রমিকশ্রেনীর, ওয়ার্কিং ক্লাসের, নিজের কাছে থাকেনা। সেই সচেতনতাটা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়। ওয়ার্কিং ক্লাস কনশাসনেস ইজ ব্রট টু দি ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্রম উইদাউট। কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বহিরাগত তত্ত্বকে আত্তীকরণ করে সাবঅল্টার্ন, ওই তত্ত্ব তার বাচনে পরিণত হয়।

গ্রামশি বলেছিলেন ভুয়ো চৈতন্য, ফল্‌স-কনশাসনেস-এর কথা। এই ফল্‌স কনশাসনেস-কে বানিয়ে তোলে পুঁজি, পুঁজির বাস্তবতার প্রতি মানুষের সামাজিক-সম্মতি নির্মাণ করতে। টু ম্যানুফ্যাকচার কনসেন্ট। শাসক শ্রেণী এই ফলস কনসাশনেস দিয়ে মানুষকে বিশ্বাস করায় যে এটাই তার মত। এভাবেই তার হেজেমনি নির্মিত হয়, শাসিত মানুষের উপর পুঁজির মতাদর্শগত প্রভুত্ব। এবং গ্রামশির তত্ত্ব মোতাবেক এই ফলস কনসাশনেস দিয়েই পাকিয়ে তোলা হয় সাবঅল্টার্নের সারোগেট স্পিচ, পরিবর্ত বক্তব্য। যে কথা তার বলার কথা ছিল না এবার সে সেটাই বলে ওঠে। পুঁজির মতাদর্শগত প্রভুত্ব হেজেমনির চাপে নিজের আসল কথাটাই ভুলে যায় সে। এবং গ্রামশির তত্ত্ব মোতাবেক এই ফলস কনসাশনেস দিয়েই পাকিয়ে তোলা হয় সাবঅল্টার্নের সারোগেট স্পিচ, পরিবর্ত বক্তব্য। যে কথা তার বলার কথা ছিল না এবার সে সেটাই বলে ওঠে। পুঁজির মতাদর্শগত প্রভুত্ব হেজেমনির চাপে নিজের আসল কথাটাই ভুলে যায় সে।

(পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের অজস্র ক্যাজুয়াল শ্রমিক, কোনো নিরাপত্তা ছাড়া, প্রায় কোনো ছুটি ছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক একটা মজুরিতে কাজ করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। তাদের পারিশ্রমিকগুলো শুনলে আর কষ্টও হয় না, হাসি পায়, ভিখিরিদের দেয় অ্যাভারেজ ভিক্ষার চেয়ে সামান্য বেশি। কিন্তু সেই ধর্মঘটকে জনবিরোধী বলে তো শাসক সরকার বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল। নানা জায়গা থেকে, যার সবটা ভুয়ো বা মিথ্যে কিছুতেই নয়, এই ধারণাটা মানুষের মাথায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে ছিল যে বাম শ্রমিক আন্দোলন মানেই কোনো না কোনো লেভেলে ভাঁওতাবাজি, নেতাদের পয়সা পেটানোর ধান্দা। ক্ষমতাসীন বাম দলের নেতাদের সামনে শো করে এইভাবেই পাওয়ার এই ফলস কনসাসনেসটা গজিয়ে দিতে পেরেছিল যে বাম রাজনীতি মানেই ধান্দাবাজি। আর, আর একটা জায়গা, দক্ষতা আধুনিকায়ণ (এফিসিয়েন্সি, মডার্নাইজেশন) ইত্যাদি পুঁজি স্লোগান, যার কথা আমরা আগেই বলেছি, সেগুলো দিয়েও মানুষকে এটা বোঝানো হয় যে ইউনিয়নবাজি মানেই সেটা দক্ষতার বিরোধী, উন্নতির বিরোধী, আধুনিকায়ণের বিরোধী।)

সাবেক সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ স্কুল ধরে নিত যে সাবঅল্টার্ন কথা বলে বৈকি, ইতিহাসে ভূগোলে গপ্প-উপন্যাসে বারবার সে কথা বলেছে। তার কথার রেখাপাত ঘটেছে নানাকিছুতে। সেই কথাকে শুধু পড়তে জানতে হবে। সেই কথার অর্থকে খুঁড়ে আনতে হবে, পাঠ, পুনঃপাঠ, মর্মপাঠ করতে হবে। যে কাজের দায়িত্ব সাবঅল্টার্ন ঐতিহাসিকের। (মিশেল ফুকোর কাজগুলো কথা বলে উঠতে চেয়েছে সমাজের শাসিত শ্রেনীর নানা অংশের হয়ে — জেলখানার কয়েদি, হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগী, সমকামী — কোনো না কোনো ভাবে যে পতিত, আলাদা, স্বতন্ত্র, এককথায় ডেভিয়ান্ট।)

আজকের ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ আবার চেষ্টা করছেন সাবঅল্টার্নের, ব্রাত্যের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ থেকে, তার কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আর এক ধরনের জ্ঞান ও বিদ্যার কাঠামো খাড়া করতে। এটা একটা যান্ত্রিকতা, রিডাকশনিজম, এসেনশিয়ালিজম, খর্বীকরণ। সাবঅল্টার্ন অস্তিত্বকে খাটো করে, নামিয়ে এনে, সমান করে তোলা তার কিছু চিহ্নের সঙ্গে। যেন, এবার থেকে, ওই চিহ্ন = সাবঅল্টার্নতা। হেগেল যেমন তার তত্ত্বে বাস্তবতাকে সমগ্রকে বুঝেছিলেন একমাত্র একেশ্বর এসেন্সের, পরমব্রহ্মের রূপে।

মডার্নিজমকে পোস্টমডার্নিজমের সবচেয়ে বড় সমালোচনার জায়গাটাই হল এই খর্বীকরণ বা রিডাকশনিজম। একটা জলজ্যান্ত পদ্ধতিকে, যার নিজের একটা অবয়ব, ব্যাকরণ, এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা ইতিহাস আছে, তাকে তার সেই ইতিহাস থেকে ছিঁড়ে নামিয়ে আনা একটা বা কয়েকটা ভ্যারিয়েবলে। এই ভ্যারিয়েবলের উপস্থিতি মানে ১, আর অনুপস্থিতি মানে ০ — পোস্টমডার্নদের আপত্তি এই জায়গাটাতেই — কোনো পরিবর্তনশীল ইতিহাসমান পদ্ধতিকে এই বাইনারিপনায় নামিয়ে আনা যায়না এরকমটাই মনে করে পোস্টমডার্নিজম। এ আলোচনা আমরা আগেও করেছি। শ্রেণী নিয়ে আমরা আগে যা বলেছি, যে শ্রেণী কোনো ভৌত সংজ্ঞা নয়, সেটা আর একবার মনে করুন। এবার যদি শ্রমিকশ্রেনীকে শ্রমিক-হওয়া নামক বাইনারি চলরাশিতে নামিয়ে আনা হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রমিক-হওয়া নামক চলরাশি সমান ১ হলেই সে শ্রমিকশ্রেনীর অংশ, নতুবা, ০ হলে, নয়। এটাই রিডাকশনিজম, খর্বীকরণ। বা আর এক রকমের এসেনশিয়ালিজম। হেগেল যেমন পুরো বাস্তবতাটাকে ধরতে চেয়েছিলেন তার সার, অন্তর্বস্তু, এসেনস-এর নিরিখে, যেখানে এসেনসই ভিত্তি, বস্তুজগতের আর সমস্ত কিছু, সমস্ত থিং, সব অ্যাপিয়ারেন্স,

সবই সেই এক সার এসেনস-এর প্রকাশ, শাইনিং ফোর্থ মাত্র। এখানেও সাবঅল্টার্নতার ওই চিহ্নগুলো থাকা মানেই সাবঅল্টার্ন হয়ে ওঠা, এবং তার পর, একবার যখন এই সাবঅল্টার্নকে পেয়ে গেছি তখন ইতিহাস থেকে তার বিদ্রোহের গাথাকেও পড়ে ফেলব। অহো, কী সুন্দর সাজানো পৃথিবী। যাইহোক, চ্যাংড়ামি ছেড়ে দিয়ে এটুকু বলাই যায়, যে এসেনশিয়ালিজম থেকে দূরে যাওয়ার আশায় সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর যাত্রাটা শুরু হয়েছিল, আর এক ধরনে সেই এসেনশিয়ালিজমই এসে ভর করলো নানা ধরনের সাবঅল্টার্ন তত্ত্ববীক্ষাকে।

সেই যান্ত্রিক স্পষ্টতার জগতে সাবঅল্টার্ন বা ব্রাত্য যেন একটা স্বশাসিত এলাকা। তাদের বোঝা হয় কিছু চিহ্নে খর্ব করে নিয়ে — সেই চিহ্নগুলোর থাকা বা না-থাকায়। ব্রাত্য হওয়ার চিহ্ন গুলো যে সত্তায় আছে সে ব্রাত্য। এবং এই খর্বীকৃত চিহ্ননির্ভর ব্রাত্য (তার চিন্তা ও মনন) খেলা করে বেড়ায় একটা স্বয়ংসম্পূর্ন স্বশাসিত এলাকায় — ব্রাত্য চিন্তা, ব্রাত্য মনন, ব্রাত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি। ওই চিহ্নগুলো যার আছে সে ব্রাত্য আর সেই ব্রাত্যের চিন্তা হল ব্রাত্য চিন্তা। সেটা নিজে একটা স্পষ্ট ভূমি। তার স্পষ্টভাবে চিহ্নিত সীমা আছে। যার মধ্যে সে আছে। যার বাইরে সে নেই। একেবারে অঙ্কের মত।

আবার কুলীনের চিন্তার রীতিবিধিকেও গাঁথা হয় এই একই এসেনশিয়ালিস্ট রকমে। এই মডেলটা এসেনশিয়ালিস্ট এই অর্থে যে এই মডেলে চৈতন্য তথা মনন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, একটা স্বয়ংসম্পূর্ন বিশুদ্ধ সত্তা। যেমন অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে চিন্তাকে তার উপর একমুখী ভাবে নির্ভরশীল বলার এসেনশিয়ালিজমকে আমরা দেখেছি আমাদের এই লেখা জুড়ে, সেরকমই আর একটা বিপরীতমুখী এসেনশিয়ালিজম এটা, যেখানে চিন্তাকে চৈতন্যকে ভাবকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেখা হচ্ছে। একধরনের ভাববাদ।

তাই, এই ধারণা মোতাবেক সাবঅল্টার্ন বা ব্রাত্য একটা নাউন বা বিশেষ্য যার একটা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা আছে। চালু মডেলগুলোয় সাবঅল্টার্ন সাবজেক্ট পোজিশন বা ব্রাত্য বিষয়ী অবস্থান (মানে ব্রাত্য কী ভাবে এই দুনিয়াকে দেখে ভাবে গ্রহণ করে ইত্যাদি) এই বিশেষ্যর গা বেয়ে গজিয়ে ওঠে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন স্পষ্টতায়। তাদের থেকে ঠিকরে পড়ে বিশুদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বশাসিত স্বাধীন ব্রাত্য চেতনার জগত। এই জগতের বিশুদ্ধ দ্বর্থহীন ভাষা-য়, যে ভাষা ব্রাত্যের নিজস্ব মননসঞ্জাত, তাই দিয়ে সে লিপিবদ্ধ করে এই বাস্তবতাকে, সেই বাস্তবতার সঙ্গে ব্রাত্যের নিজস্ব সম্পর্ককে, সেগুলোকে সে নিজে যেভাবে দেখে। ভাষা বলতে চিন্তা ও মতপ্রকাশের বিভিন্ন কাঠামো। সেই ভাষায় খচিত হয় এই জগতের সম্পর্কনিচয়। আমি এবার হস্তশিল্প মেলা থেকে দেবাশিস বলে বাঁকুড়ার এক ছোকরা পট-আঁকিয়ের কাছ থেকে একটা পট কিনেছি। তাতে স্পিলবার্গের ডাইনোসর আর অভ্যস্ত পটোচিত নারী-আকার নর-আকার কী চমৎকার মানিয়েছে। গীতাদি আমাদের ঘরে কাজ করে, নারকেল ফাটিয়ে তার মধ্যে ফোঁপরা পেয়ে উল্লসিত আমার বৌ সেটা কচকচ করে খাওয়াকালীন চটে গিয়ে গীতাদি বলেছিল, ওই জন্যেই তোমার বাচ্চাকাচ্চা হয়না। হয়ত সম্পর্কটা এখানে ভ্রূণ নারকেল আর মানব ভ্রূণর। গীতাদি যদি পালাকার বা কথক হত, এই জৈবনিক তত্ত্ব সেখানে ঠাঁই পেত, সাঁওতাল নারীদের মত ছবি আঁকতে জানলে সেখানেও আসত। আবার, খেয়াল রাখুন, কুলীন বা এলিটের জগতও তাই, তার সম্পর্কও সেই একই রকম। তাই এলিটের অবস্থান এবং ভাষাও, ওই একইরকম দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ। চালু সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর তাত্ত্বিক আলোচনা এই ভাবেই দেখে পুরোটাকে।

৩০।। স্পিভাকের প্রশ্ন এবং উত্তর

স্পিভাক এর অবস্থানটা কিন্তু সাবেকি সাবঅল্টার্ন অবস্থান থেকে আলাদা। তাঁর তফাতের জায়গাটায় আসছি আমরা, তিনি সাবঅল্টার্নকে কেমন ভাবে ভেবেছেন। তার আগে তার প্রশ্ন এবং উত্তরটা শুনে নেওয়া যাক।

স্পিভাক প্রশ্ন করেছেন, সাবঅল্টার্ন কি কথা বলে উঠতে পারে? এবং এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মনে করেছেন যে, না, সাবঅল্টার্ন কথা-বলে উঠতে পারেনা। বলো না একবার কথা, বলে দেখো! শাসক এলিট এসে তোমার কথাকে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর সুদৃশ্য সুদৃশ্যতর প্যাকেটে করে হার্ড বা সুলভ মলাটে বেচে দেবে দোকানে দোকানে, লাইব্রেরিতে, আর অ্যাকাডেমিতে, পুরস্কারে এবং সচেতনতায়। এটা সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হল যে কেউ তোমায় শুনবেই না, কানই দেবেনা তোমার কথায়। সাবঅল্টার্ন ঐতিহাসিক সাবঅল্টার্নের ইতিহাস লিখবেন আর শাসক ক্ষমতা সেই ইতিহাস পড়বে সাবঅল্টার্নকে আরো নিখুঁত ভাবে শাসন করার কায়দাকানুন রপ্ত করতে। একবার কথা বলে ফেলা তৈরি করে দেবে আরো আরো নিপীড়নকে, আরো আরো কথা বলতে না-পারাকে।

এবার, কথাটা হল, স্পিভাক-এর এই প্রশ্ন এবং উত্তরে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা নিশ্চিতভাবেই আছে। পোস্টমডার্নিজমের এত এত এসেনশিয়ালিজম বিরোধী রিডাকশনিজম বিরোধী আলাপ আলোচনার পরেও, আবার,

একধরনের একটা এসেনশিয়ালিজম এবং রিডাকশনিজম গ্রাস করছে স্পিভাককে। তার টেকনিকাল খুঁটিনাটিগুলো আমরা আমাদের বইয়ে দেখিয়েছি। দু একটা কথা এখানে বলা যাক।

স্পিভাক সাবঅল্টার্নকে ফিরে দেখতে চাইলেন একটা 'আইডেন্টিটি-ইন-ডিফারেনশিয়াল' নামে একটি বিশেষ ধরনের ডিসকার্সিভ স্পেস বা আলোচনার ক্ষেত্র হিশেবে। এই বর্গের চারপাশেই গড়ে উঠেছে এই প্রবন্ধে স্পিভাকের তাত্ত্বিক পৃথিবী। অর্থাৎ তার বাস্তব অস্তিত্বের নড়াচড়ার জায়গায় তত্ত্বের জগতে ওই বর্গটির নড়াচড়াকে ধরতে চাইছেন স্পিভাক। যাকে স্পিভাক খাড়া করছেন একদিকে দেরিদা আর অন্যদিকে ফুকো এবং দেল্যুজ-গুত্তারির তুলনামূলক বিচারের সাপেক্ষে। ফুকো এবং ফুকোর মত অন্যান্য পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে স্পিভাকের নালিশ আত্মসন্তুষ্টি। তার মতে, একগুচ্ছ পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীর এই আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে তাল মেলায় আর এক গুচ্ছ পূর্বের বুদ্ধিজীবীর কোলাবোরেশন বা মুৎসুদ্দিপনা, সহজ কথায় চামচাবাজি। (পোস্টকোলোনিয়ালিটি চর্চার একটা চালু বিষয় এটা — কীভাবে এলিট নিজেকে সাজিয়ে তোলে উদ্ধারকর্তা হিশেবে আর শেষ অব্দি আবিষ্কার করা যায়, ও হরি, এতো দেখি পশ্চিমের আর এক ভৃত্য, চামচা-সিরিজে নবতম।)

প্রথম বিশ্বের বুদ্ধিজীবীর এই সন্তুষ্টি আর তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের চামচাবাজি — এই দুটো মিলিয়ে যে সমাহার তাকে গায়ত্রী স্পিভাক খারাপ বলছেন। নৈতিক ভাবে খারাপ। আর নৈতিক ভাবে ভালো হল সেই অবস্থা যেখানে ওই সন্তুষ্টি বা মুৎসুদ্দিপনা কিছুই নেই। এই দুই দল — আত্মসন্তুষ্ট পশ্চিম এবং মুৎসুদ্দি পূর্ব — দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীদেরই কাঠগড়ায় তুলছেন স্পিভাক — প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে অংশগ্রহনের নালিশে। নৈতিকভাবে এটা খারাপ কারণ এই সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াপদ্ধতি কাজ করে বলপ্রয়োগ এবং বশ্যতা দিয়ে।

পরাধীন ব্রাত্যের জন্য স্পিভাক চিন্তার জগতে সাবঅল্টার্ন অবস্থানকে মানে ব্রাত্য সাবজেক্ট পজিশনকে নতুন রকমে ব্যবহার করার কথা বলছেন। ব্রাত্যকে তার সমাজবিজ্ঞানে নিয়ে আসছে তো এলিটই, তাই, বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে ব্রাত্যকে ধরতে গেলে সেই ব্রাত্য প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে দাঁড়ায় এলিটের আয়না, এলিটের চিন্তনে জাত, এলিটের ভূমিতে বিধৃত এবং বিবৃত। সত্য-সাবঅল্টার্নতা সতত সঞ্চরমান সলিল-শৈবালের মত, ধরতে গেলেই পিছলে যাচ্ছে, হায়। তাই, স্পিভাক বললেন ওই সত্য-সাবঅল্টার্ন-কে অকারণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হওয়ার কোনো মানেই হয়না সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের। খুঁজতে হবে ওই সত্য-সাবঅল্টার্ন বা আদর্শ সাবঅল্টার্ন থেকে বাস্তবতা কতটা চ্যুত হচ্ছে তার নিরিখে। ধরুন থিওরি দিয়ে বুঝে আমাদের মাথায় আছে যে এই শ্রেণী-বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একটা সাবঅল্টার্ন অবস্থান এরকম হওয়ার কথা। এবার আমি বাস্তব ইতিহাস থেকে দেখব আমি যে সাবঅল্টার্নকে খুঁজে পাচ্ছি সেই সাবঅল্টার্ন বা ব্রাত্য আমার ওই ভেবে রাখা বা মডেল সাবঅল্টার্ন থেকে কতটা আলাদা হচ্ছে। ওই আদর্শটাকে আমি বাস্তবতা দিয়ে খুঁজতে যাবই না, কারণ খুঁজতে গেলেই সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা এলিট অবস্থান যেহেতু তাকে বিবৃত করছি বা লিখছি বা তত্ত্বে নিয়ে আসছি যে সেই আমি একজন এলিট। কিন্তু একটা সম্ভাব্য আদর্শ সাবঅল্টার্ন অবস্থান থেকে কতটা পার্থক্য আমি খুঁজে পাচ্ছি বাস্তব বিদ্যার এম্পিরিকাল একজন সাবঅল্টার্নের — আইডেন্টিটি ইন ডিফারেনশিয়াল সেটাই খোঁজা উচিত সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের। খোঁজা উচিত ওই গরমিলটুকুকেই।

তার মানে একটা নির্দিষ্ট সাকার সসীম স-অন্ত সংজ্ঞা হিশেবে সাবঅল্টার্নকে ভাবলেন না স্পিভাক। বাস্তব অস্তিত্ব থেকে তার সংজ্ঞায় পৌঁছনোর চেষ্টাই করলেন না। এটা আমাদের অভ্যস্ত সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ প্রকরণের ঠিক উল্টো। তারা যেখানে খুবই স্পষ্ট এবং সাকার একটা ব্রাত্য অবস্থানকে ভাবেন সেখানে স্পিভাক একটা স্বশাসিত সত্তা, অটোনমাস অস্তিত্বের বাস্তব ভূমিকে, অন্টলজিকাল ভূমিকে জাস্ট বাতিল করছেন, নাকচ করে দিচ্ছেন। সত্তাকে অপসারণ করে টিকিয়ে রাখছেন একটা সংজ্ঞাকে। একটা আদর্শ, অর্থাৎ, ভাবনা চিন্তা ও বিদ্যাচর্চার, মননের একটা ভূমি হিশেবে, একটা জ্ঞানতত্ত্বগত বর্গ বা এপিস্টেমলজিকাল ক্যাটিগরি হিশেবে। একটা আদর্শের আকারে সাবঅল্টার্ন আছে, কিন্তু রক্তমাংসে, শরীরী অবয়বে তাকে ধরা সম্ভব না। আছে লেখার রচনার টেক্সট-এর অভ্যন্তরে, তাত্ত্বিক উপাদান হিশেবে। এই উপাদান একটা বিশেষ্য, যা বেঁচে থাকে আখ্যানে। এ নাউন ইন ফিকশন।

স্পিভাকের এই সাবঅল্টার্ন, এই আখ্যানের বিশেষ্য কথা বলতে পারেনা। এর মানে কখনোই এই নয় যে সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারেনা কারণ কথা-বলা বলে কিছু হয়না — বলা নামক ক্রিয়াটাই একটা মিথ্যা স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতার মায়া সৃষ্টি করে, কিন্তু, আসলে কিছুই দৃষ্টিগোচর করেনা, কিছুই জানায় না। সেই অর্থে তো কোনো ডিসকোর্স কোনো টেক্সট কোনো রচনাই কথা বলতে পারেনা। এই কথা-বলতে না-পারাটা এই অর্থে যে এই সাবঅল্টার্নের কোনো ভূমিই নেই, এমনকি আত্মপরিচয়ের ভূমিটুকুও নেই। সাবঅল্টার্ন এই নামে ম্যাক্সিমাম যা বোঝা যেতে পারে

তা হল একটা ডিসকার্সিভ ক্যাটিগরি — আলোচনার একটি বর্গ। মননের, অধ্যয়নের, রচনার। বাস্তবতার নয়। তাই, স্পিভাকের এই বাস্তবতারিক্ত মননের সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারেনা। কোনোক্রমে বলে উঠলেই ক্ষমতা তার বলা সেই কথাকে কাজে লাগিয়ে নেয়। বলাটা পর্যবসিত হয় গভীরতর একটা না-বলায়। আর তার এই বলার লিপিলিখন যে করে, যে ডিকটেশন নেয়, সে হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার স্তাবক।

সাবঅল্টার্নের কথা-বলার এই অসম্ভাব্যতা ঘোষণা করার পর স্পিভাক নিয়োজিত হন তার নিরাকরণে, প্রতিবিধানে, প্রত্যাদেশে। এক্ষেত্রে স্পিভাকের প্রস্তাবিত রণনীতি হল ডিকন্সট্রাকশন। একটি এলিট টেক্সটকে এলিট যেভাবে পড়ে, পড়তে গিয়ে যে বর্গগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করে তাদের শীর্ষাসীন করার, উল্টে ফেলার, উল্টে ফেলতে ফেলতে একটা সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থান নির্মাণ করে তোলার পদ্ধতি হিশেবে ডিকন্সট্রাকশনকে ভাবছেন স্পিভাক। আমরা ডিকন্সট্রাকশনকে যে ভাবে সংজ্ঞা দিয়েছি সেটা মনে করুন, গুরুত্বদানের মাপকাঠিটাকে বদলে আর একটা সম্ভাব্য অর্থকে বার করে আনা একটা টেক্সট থেকে। এখানে উল্টে দেওয়া বলতে সেই মাপকাঠিটাকে নাটকীয় ভাবে বদলানো। ধরুন, মালিকের জায়গায় শ্রমিক অবস্থানের গুরুত্বদানের মাপকাঠিকে নিয়ে আসা। সরাসরি কোনো অস্তিত্বগত ভাবে বাস্তব সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থান থেকে, যেমন নারী বা প্রবাসী ইমিগ্রান্ট, কথা বলে উঠতে নিষেধ করছেন স্পিভাক।

৩১।। ডিকলোনাইজেশন

কিন্তু এবার ভাবুন তো এই আইডেন্টিটি ইন ডিফারেনশিয়াল-এর স্পিভাকীয় সাবঅল্টার্ন আসলে কী? কার প্রতিনিধিত্ব করে সে? এই অভিধাটা দিয়ে আমরা কী বুঝব? এভাবে দেখলে তো এই সাবঅল্টার্ন সবজায়গাতেই আছে, আর তার মানে আবার কোনো জায়গাতেই নেই, মানে বিশেষভাবে নেই। ধরুন, এই প্রবন্ধটা পড়াকালীন আপনার চোখের সামনে কী আছে? যদি বলেন প্রবন্ধটা, তাহলে কিন্তু মিথ্যা হবে, কারন এই প্রবন্ধটা ছাড়াও কিছুটা হাওয়া আছে। কিন্তু হায় হাওয়া, তাকে আমরা কেউই উল্লেখ করিনা, কারণ, সে সবজায়গাতেই আছে, তাই কোনো জায়গাতেই নেই। একটা অনন্ত-প্রসারিত সর্বব্যাপী সবার-মধ্যে-উপস্থিত সাধারণ বিষয়ী-সংস্থান হিশেবে সাবঅল্টার্ন নামক বর্গ চিহ্নিত করে বড্ড বেশি পরিমাণে বড্ড বেশি কিছুকে। এটা স্পিভাকের নির্মাণের একটা সমস্যা।

সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থানকে খুঁজে দেওয়ার এবং নির্মাণের এমন সাধারণীকৃত একটা পরিকল্পনার জায়গায় আসা উচিত অনেক নির্দিষ্ট এবং চিহ্নীকরণযোগ্য কিছু। যেমন ধরুন, শ্রমিক-শ্রেনী বা ওয়ার্কিং ক্লাস — কিন্তু মাথায় রাখবেন — একটা বিশেষ্য নয়, বিশেষণ হিশেবে। বিশেষ্য হিশেবে আসা মানে একটা নির্দিষ্ট বর্গ আকারে আসা, তার মানেই তার একটা আঙ্কিক অবয়ব থাকবে, তার মানেই একটা এসেনশিয়ালিজম, যার কথা আমরা নানা ভাবে বলেছি। তার বদলে বিশেষণ হিশেবে আসা মানে অস্তিত্বের একটা রকমকে চিহ্নিত করা। একটা ঝোঁককে দেখা। একটা রিলেটিভ বা তুলনামূলক রকম। মানে ব্যাপারটা এরকম, আমরা শ্রেণীকে যেভাবে বলেছিলাম সেটা মনে করুন। ক এবং খ এবং গ এরা শ্রমিকশ্রেণী — এই কথাটা না বলে আমরা বলছি — এই অবস্থানটা শ্রমিকশ্রেণী-অবস্থান। প্রথম বাক্যাংশটায় শ্রমিকশ্রেণী এসেছে একটা বিশেষ্য হিশেবে, আর দ্বিতীয়টায় অভিধা হিশেবে।

এবার আসুন স্পিভাকের ওই ভালো-মন্দ এই নৈতিক বিচারে। আমাদের কাছে স্পিভাকের ওই নৈতিক অবস্থানের কোনো অর্থই নেই। আমরা তো জানি, আলো-অন্ধকারে যেখানেই যাই না কেন পশ্চিম আমাদের আত্তীকরণ করবেই। সম্পর্কটা বশ্যতারই থাকবে, জানো ইয়া না-জানো/ মানো ইয়া না-মানো, আত্তীকৃত আমাদের হতেই হবে। আমরা জানি পূর্বের বেঁচে থাকার একটাই মডেল, মুৎসুদ্দি হয়ে বাঁচা, ভৃত্য হয়ে বাঁচা, পশ্চিম আর পূর্বের মধ্যে কোনো ইকুয়ালিটি নেই, কারণ ইকুয়ালিটি বলে কিছু পৃথিবীর কোথাওই নেই। তাহলে মুৎসুদ্দিপনায় এতো গভীর গভীরতর পাপের কী আছে? এসো তার চেয়ে আমরা সরাসরি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চোখে চোখ রাখি, সহজ চোখে তাকাই, আমাদের দাসত্বের আর একটু ভালো প্রভু হই।

আমরা এর আগে বাইনারি রকমে বাস্তবতাকে ভেবে নেওয়ার চেষ্টার যান্ত্রিকতার কথা বলেছিলাম। স্পিভাকের এই অপরাধবোধ ফলে ওঠে তাঁর নিজেরি তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ বাইনারি অপোজিশন, দ্বিত্ব-ভেদ প্রকরণ থেকে। স্পিভাকের কাছে স্পষ্ট দুটো ১ আর ০ — শোনাতে পারা আর না-পারা, সাদা আর কালো — স্পষ্ট এবং পৃথক। স্পিভাক এখানটায় উত্তরআধুনিক কেন ঠিক আধুনিকও হয়ে উঠতে পারছেন না, তিনি ভুলে যাচ্ছেন ধূসরতার লক্ষ লক্ষ মাত্রাভেদকে যা একটা আধুনিক গ্রাফিক্স সফটওয়্যার চিহ্নিত করতে পারে।

"আমি আমার কথাকে শুনিয়ে উঠতে পারবনা" — এই যে অবস্থানটা এটাকে জেরা করা যায় আমাদের ডিকোলেনাইজেশনের ধারনা দিয়ে, যাকে আমরা এনেছি দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের একটা বদলি হিশেবে। দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন আর লিওতারের দিফেরঁদ এই ধারণা দুটো মিলিয়ে আমরা ওই তাত্ত্বিক অবস্থান তৈরি করেছি — ডিকলোনাইজেশন। সেটা একটা লিখে চলার কৌশল, কথা বলে চলার কৌশল। সেই রাইটিং স্ট্র্যাটেজি ডিকলোনাইজেশন দিয়ে কীভাবে স্পিভাকের এই অবস্থানটার গলতিটা ধরা পড়ে সেটায় আসছি এখনি। (যদিও, ডিকলোনাইজেশনের টেকনিকাল খুঁটিনাটি এই লেখাটায় আসা সম্ভব না।) তার জন্যে স্পিভাকের ওই প্রশ্নটাকে ফের একবার জিগেশ করা দরকার, ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক, কিন্তু এবার প্রশ্নটা করা হবে আমাদের ওই ধূসরতাসহ ছড়িয়ে থাকা বর্গের পোস্টকলোনিয়াল ভূমিতে।

তার মানে এবার প্রশ্নটা দাঁড়াবে, ক্যান দি স্যাভেজ স্পিক, এই স্যাভেজের উল্লেখ তো আমরা আগেই করেছি, সে কি কথা বলে উঠতে পারে পোস্টকোলোনিয়াল স্পেস, উত্তর-উপনিবেশ ভূমিতে? খেয়াল রাখবেন, এই স্যাভেজ সাবঅল্টার্ন আর সেই আগেকার সহজ-সরল সত্তাটি নেই, সেই এসেনশিয়ালিস্ট সংস্করণ আর নয়। সে একটা নতুন সংজ্ঞা, নতুন অবয়ব ধারণ করেছে। তার বাস্তবতাটা একটা অতিনির্ণীত বাস্তবতা, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা পরস্পরের দ্বারা অতিনির্ণীত। ঐতিহ্য আর আধুনিকতা মিলে তৈরি করেছে একটা সিন্থেটিক স্পেস যেখানে তারা যে শুধু পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে তাই নয়, পরস্পর তারা পরস্পরের বন্ধু, পরস্পর পরস্পরের দ্বারা নির্মিত এবং নির্ণীত। তাই, তারা কেউই আর বিশুদ্ধ ঐতিহ্য বা বিশুদ্ধ আধুনিকতা নেই। এবং মনে রাখবেন, আমাদের এই সিন্থেটিক স্পেসে এই নতুনতর সাবঅল্টার্ন অবস্থানটি আর বিশেষ্য নয়, বিশেষণ। আমরা তাকে কিছু চিহ্ন দিয়ে চিনব না, চিনব ক্ষমতার সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কের প্রকার দিয়ে।

এবার আসা যাক লিওতার-এর দিফেরঁদ-এর প্রসঙ্গে। দিফেরঁদ-এর একটা উদাহরণ মাস্টারপিস লেখার, অসাধারণ লেখা লেখার সমস্যা। ধরুন, একজন লেখক একটা মাস্টারপিস লিখেছে। কোনো সম্পাদক তা ছাপতে রাজী হচ্ছেনা। এবার, সেই লেখক কেমন করে প্রমান করবে যে এটা একটা মাস্টারপিস? প্রশ্নটাকে বাড়িয়ে তুলুন অনাগত কিন্তু আগমমান ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা অব্দি। ওই লেখক নিজেকে লেখক হিশেবে টিকিয়ে রাখবে কোন প্রকৌশলে? যে নিজে জানে যে সে মাস্টারপিস লিখছে আর এই জানাটাই তাকে একটা সলিটারি সেলে, একা অন্ধকার কালোকুঠরিতে বন্ধ করে দিচ্ছে — সসাগরা বসুন্ধরায় আর কেউ নেই যে একথা জানে। আর, কেউ জানতে পারবেও না, কারণ তার লেখা সে ছাপাতে পারছেনা।

দিফেরঁদ হল সেই সব সম্মুখীনতা যেখানে দুই বিপরীত বিন্দু, যারা পরস্পর মুখোমুখি, কখনো একত্র হতে পারেনা। যাদের কখনো মেলানো যায়না। মেলানো-টা সংজ্ঞাগত ভাবেই অসম্ভব। আমাদের স্যাভেজ-এর সমস্যাও ঠিক এটাই। যা সে বলছে তা সে কখনোই শুনিয়ে উঠতে পারেনা। তাই, এখানে, স্যাভেজের রণনীতি হওয়া উচিত — তার রচনায়, তার টেক্সট-এর মাধ্যমে, কথা-বলা। নিজের বাচনে সে কথা বলবে না, কারণ কথা তো সে বলে উঠতেই পারেনা। তার হয়ে কথা বলবে তার টেক্সট। এই পদ্ধতি মানে :—

স্যাভেজ তার মুখ বন্ধ করে, কথা বলা বন্ধ করে। এবং তার বাচন, তার বক্তব্য, তার কথা-বলা, চালিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন লেখার, টেক্সট-এর মাধ্যমে। টেক্সট-এর শরীরে তার প্রবেশে, পুনঃপ্রবেশে অনুপ্রবেশে। সবকিছু সত্ত্বেও, সবকিছুর পরও, বলা তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। নিরবচ্ছিন্ন, ছেদহীন। হয়তো কখনো প্রেতের মত করে, চুপিসাড়ে, সাঁঝের ঝুঁঝকোবেলায়, সব বেড়ালেরাই যেখানে যখন ধূসর, নানাবিধ ধূসর অক্ষরে পাণ্ডুলিপিতে। যে বলা, যে লেখা, একদা কোনো ভবিষ্যতে, মেলাবেন তিনি মেলাবেন, ডিকন্সট্রাকশন আর দিফেরঁদ দুটোকেই, মেলাবেন তিনি মেলাবেন। "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে/ ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া হৃদয়ের আকাঙ্খার নদী/ ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় —/ ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি —/ তবে ওই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে/ লিখিতে যেয়োনা তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে/ অন্তরের কথা! —/ আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সেসব ব্যর্থতা! ..."— লেখো ধূসরতায়, কবিতার বইয়ের নাম দাও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। হাজার হাজার পাতা গদ্য ঘোরগ্রস্তের মত লিখে যাও, প্রকাশ কোরোনা।

তুমি যদি সরাসরি তোমার তত্ত্বের কথা বলতে যাও, কিছুতেই শুনিয়ে উঠতে পারবে না। মনে রেখো, এটা একটা উত্তরউপনিবেশ, আমরা উত্তর এবং পশ্চিমের উপনিবেশ। দি কিং ইজ দি ডেড, লং লিভ দি কিং। তুমি যদি রাজাকে আক্রমণ করো, হয় মারা যাবে, নয় রাজা হবে। মানে রাজাকে মারতে পারবে না। রাজা থাকছেই। আর তোমার তত্ত্বের কথা বলার ক্ষেত্রে তুমি রাজাকে আক্রমণই করে উঠতে পারবে না। রাজা অব্দি পৌঁছনোর আগে অনেক সেপাই।

তারাই দাঁড়াবে তোমার পথ জুড়ে। তোমাকে যদি তারা আক্রমণ করত, তবু তুমি একটা মোক্ষ পেতে, অন্তত, নিজে কাহিনী না লিখতে পারো, নিজেই কাহিনী হয়ে গিয়ে কিছু মানুষের কাছে পৌঁছতে পারতে। সেটুকু সম্মানও তোমায় দেখাবে না তারা, তারা তোমাকে নৈঃশব্দ্য দেবে। তুমি একসময় নিজেই নিজেকে ভুলে যাবে।

তুমি দূরের প্রভুকে ছেড়ে দাও, তোমার চারপাশের মানুষগুলোকেই তোমার কথা শোনাতে পারবে না। রাম শম্বূককে হত্যা করেছিল কারণ সে শূদ্র হয়েও বেদ পাঠ করেছিল। তখন শুধু ব্রাহ্মণের ধর্মই ভাঙেনি সে। শূদ্রের ধর্মও ভেঙেছিল। অন্য শূদ্ররাই রামকে সমর্থন করেছিল। রামের হেজেমনি। হেজেমনি বড় সহজ জিনিষ নয় হে। তৃতীয় বিশ্বের চিন্তাবিদ জন্মেছে প্রথম বিশ্বের তত্ত্বের ফুটনোট লেখার জন্যে, তাদের ফুটে মানে পায়েই তো আমাদের আশ্রয়। এখানের বুদ্ধিজীবীর কানে বাজনা বাজে চলো আমেরিকা (এর আগের জেনারেশনের বাজত মেডিটেরানিয়ান, চারুলতার অমল সুর করে গাইত)। বিদেশের তত্ত্বের চরণ ধরিতে দিও গো আমারে গাইতে গাইতে সে পশ্চিমের আকাডেমির তৃতীয় বাচ্চা হয়ে খুর তুলে তুলে নাচে। এছাড়া আর কোনো ইতিহাস নেই। তাকিয়ে দেখুন। অন্য জায়গা ছেড়ে এমনকি মার্ক্সবাদে আসুন। পশ্চিমের মার্ক্স সাহেবের তত্ত্বের আমরা শুকতলা লিখে চলেছি।

এর বাইরে যদি কিছু করতে যাও তো শম্বূকের আত্মীয়ের মত তোমার প্রতিবেশীরাই তোমায় গাল দেবে। বলবে তোমার কাজটা কিছু হয়নি, বা বলবে তুমি মাতাল, তুমি নারীসঙ্গপরায়ণ, ওই ট্রটস্কাইটের মত। কিম্বা আর কিছু। হেজেমনি বড় সহজ জিনিষ নয় হে। তত্ত্বের এলাকা মননজগতের অন্দর মহল। সেখানে তুমি যে কিছু করতে পারো এই আত্মবিশ্বাসটা তোমার নিজেরই হবেনা, যদি তোমার শরীরে থাকে তৃতীয় বিশ্বের জিন। তবু কবিতায় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে কিছু জায়গা পাওয়া যেতে পারে। পাগলামিকে, তৃতীয় বিশ্বের পাগলামির বিশেষতাকে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। তাই তুমি পাগলামির লেখায় তোমার নিজের কথা বলে যাও। কোনো একদিন কোনো একটা টেক্সট লেখা হবে, হয়তো পশ্চিমেই, তখন তুমি একটা বাবা আবিষ্কার করে ফেলতে পারবে তোমার এই পাগলামির লেখার। সেদিন তারা অর্থের জগতে পুনস্থাপিত হবে। আনগ্রাউন্ডেড থেকে গ্রাউন্ডেড হবে (অর্ডার অফ ডিসকোর্স মনে করুন) আর কিছু কিছু কথা বলতে থাকো পশ্চিমের কথার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে জুড়ে জুড়ে। লাকাঁ এখন খাচ্ছে খুব লোকে, বেশ তবে লাকাঁর টার্মে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক। দেরিদা নিচ্ছে, বেশ তবে দেরিদা দিয়েই বলা যাক। নিজের মতো করে কথা বলতে যদি যাও তুমি পেরে উঠবে না। তোমার কলোনির ইতিহাসকে তুমি যদি অস্বীকার করতে যাও তো তুমি পারবেনা, হয় তুমি হেরে যাবে, নয় তোমার লেখা। তার চেয়ে তুমি এই দাসত্বকে মেনে নাও, এবং দাস হিশেবে সাহেবের কথার খেই ধরে ধরে নিজের কথা বলে চলো। তুমি যদি ভাবো পশ্চিম সরাসরি তোমার উপর প্রভুত্ব করবে, তো ভুল করছো। তার প্রয়োজনই নেই। সাহেবদের জায়গায় সুবোরা আছে। তাদের চামচারা আছে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকাডেমিতে। তাদের বাণীতে যারা আলোকিত হয় সেই রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রজারা আছে, সুবোদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করে যারা বিলিতি সেন্ট মাখে সেই নেতা ও মন্ত্রীরা আছে। প্যান-অপ্টিকন ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়। পুঁজির পশ্চিমের এই হেজেমনি বড় সহজ জিনিষ নয় হে।

এই হল দুইকথায় সেই ডিকলোনাইজেশনের রাইটিং স্ট্র্যাটেজি। যার উদাহরণ দিয়েছি আমরা নিজেদের ওই বই দিয়েই। অন্যের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং জুড়ে জুড়ে কথা বলে চলার এবং তাকে ছড়িয়ে যাওয়ার এই রাইটিং স্ট্র্যাটেজিকে তার বিভিন্ন টেকনিকাল খুঁটিনাটি সহ আমরা এনেছি আমাদের বই মার্জিন অফ মার্জিন-এ। এখানে সেই ডিটেইলস আর আনছি না। আর লেখার কৌশলের বিষয়ে পুরোটা কখনো লেখা দিয়ে বলা যায়? সেটা ছড়িয়ে থাকে কথায়, ফিসফিসানিতে, নৈঃশব্দ্যে। ডিকলোনাইজেশন এমন একটা তাত্ত্বিক অস্ত্র যা কাজ করে তত্ত্বের তলের বাইরে, বাস্তব প্রয়োগে। তাই তত্ত্ব দিয়ে তাকে পুরোপুরি বলা যায় না।

৩২।। থার্ড স্পেস আর সিন্থেটিক স্পেস

অন্য আর যে উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক অবস্থানকে এখানে উল্লেখ করতে চাই, খুব সংক্ষেপে, সেটা হল হোমি ভাভা, এস্কোবার, আপ্পাদুরাই ইত্যাদি পোস্টকলোনিয়াল তাত্ত্বিকদের। এই ঘরানায় অরো অনেকেই আছেন। হয়তো পার্থ চ্যাটার্জি দীপেশ চক্রবর্তীদেরও একভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এদের সঙ্গে।

নিশ্চিত ভাবেই এদের মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ভাভা। ভাভার স্লাই সিভিলিটি বা মিমিক্রির ধারণা তত্ত্বের জগতে একটা ভালো কাজ। ভাভা মিমিক্রিকে, মানে নকল এবং মুখ-ভ্যাংচানো এই দুইভাবেই পড়ুন, দেখেছিলেন কোলোনিয়াল সম্পর্কের মডেল হিশেবে। এই মিমিক্রিই তো তাই যা সুবোদের সুবো এবং সাহেবদের সাহেব করে, কারণ, সুবোরা সাহেব হওয়ার চেষ্টা করে, আর সাহেবরা তা করে না, করবে কী করে, তারা তো নিজেরাই সাহেব।

তাই সুবোদের এই সাহেব হওয়ার চেষ্টাটা নিজের গর্ভেই নিজের মৃত্যুকে বহন করে। এই নকল করাটাই প্রমাণ করে যে তারা নকল করতে পারছে না।

ঔপনিবেশিক সমাজের সাংস্কৃতিককে কালচারালকে ভাভা বুঝেছিলেন এই মিমিক্রির নিরিখে। আর উত্তরউপনিবেশকে পোস্টকলোনিকে বোঝার জন্যে ভাভা এনেছিলেন হাইব্রিডিটি। সঙ্কর সংস্কৃতি। মিমিক্রির একটা উদাহরণ হতে পারে বঙ্কিমকে বাংলার স্কট ভাবা। আর হাইব্রিডিটির উদাহরণ ধরুন, ডিস্কো ভাংরা, বাংলা রক। পটের ছবিতে ওই জুরাসিক ডাইনোসর। প্রথমে ভাভার তত্ত্বের বিষয়ে আমাদের আপত্তিটা জানাই, তারপর দুচারটে বিষয় আলোচনা করা যাক ভাভা থেকে।

ভাভার বিষয়ে আমাদের আপত্তিটা দুটো স্তরে। এক, আমরা মিমিক্রিকেই ঔপনিবেশিক সমাজের মূল সংস্কৃতি বলে মনে করিনা। আমাদের মতে হাইব্রিডিটির পদ্ধতিকে খুঁজে পেতে গেলে পোস্টকলোনি অব্দি যেতে হয়না, কলোনিয়াল যুগের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতেই তাকে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক প্রভুর সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে সঙ্কর সংস্কৃতি শুরু হয়ে গেছে ঔপনিবেশিক যুগেই। আর দুই, মিমিক্রির পদ্ধতি, উল্টোদিকে, ঔপনিবেশিক স্তরেই ফুরিয়ে যায়না, চলতে থাকে, আজও, এই পোস্টকলোনিয়াল যুগেও চলছে।

এবার একটু ভাভার তত্ত্ব নেড়ে ঘেঁটে দেখা যাক। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে। এই সারা লেখাটা জুড়েই যে অতিসরলীকরণ চালিয়ে যাচ্ছি তার পরে অতিসরলীকরণ শব্দটাও অত্যন্ত লঘু লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই, গোড়া থেকেই ঠিক করা ছিল, এই লেখাটা এরকমই হবে। তিন ঘন্টায় শিখুন হেগেল-মার্ক্স-পোস্টমডার্ন-পোস্টকলোনিয়াল, দশ টাকা, দশ টাকা, দশ টাকা, তিনটি কিনলে পাঁচ টাকা ছাড়, তিন কপি মেড-ইজি পাবেন মাত্র পঁচিশ টাকায় আমাদের এই প্রচার-গাড়ি থেকে, নিজে শিখুন, অন্যকে শেখান, বাড়ির বাচ্চাদের উপহার দিন। যাকগে, যে কথা বলছিলাম, ভাভা। ভাভা তার তত্ত্বকে খাড়া করেছিলেন থার্ড স্পেস নামে একটা বর্গের উপর ভিত্তি করে।

এই থার্ড স্পেসের সঙ্গে তুলনায় আনা যায় আমাদের সিন্থেটিক স্পেস নামের বর্গটাকে। মূলত প্রবাসী মানুষের চারপাশের বাস্তবতাকে বুঝতে ভাভা তার থার্ড স্পেস-কে ভেবেছেন। ভাভার থার্ড স্পেস মানুষের কোনো ধরনের শিকড়বিহীনতা বা রুটলেসনেসকে বুঝতে অস্বীকার করে। শিকড় বা শিকড়বিহীনতা কোনোটাকেই থার্ড স্পেস কোনো আমল দিতে নারাজ। এখানে কোনো সাবজেক্ট পজিশন (বিষয়ী সংস্থান — মানে চৈতন্যের মননের ভাবনা চিন্তার কোনো একটি বিশেষ অবস্থান) মানেই যাযাবর বা নোমাডিক। তাই এই নোমাডিক বা যাযাবর ব্যক্তিসত্তার কোনো পরবাস বা নিজবাস বলেই কিছু নেই। সব ঠাঁই তার ঘর আছে। তার বসুধৈব কুটুম্বকম। সে একটা নিরন্তর প্রব্রজ্যায় রয়েছে। ভাভা যদিও সরাসরি ওভারডিটারমিনেশন নিয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু আমাদের এতক্ষণে পরিচিত হয়ে যাওয়া এই অতিনির্ণয়ের ধারণা দিয়ে ভাভার থার্ড স্পেসকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। থার্ড স্পেস একটা সাংস্কৃতিক ভূমি যেখানে মডার্নিজম আর ট্র্যাডিশন পরস্পর পরস্পরকে অতিনির্ণয় করে আছে। এবং যেহেতু অতিনির্ণয় মানেই তারা পরস্পর পরস্পরকে নির্মাণ ও করে আছে, তাদের দুজনেরই অস্তিত্ব তাদের নিজেদের চেয়ে বড় এবং বেশি কিছু। মানে, তাদের মডার্নিজম আর ট্র্যাডিশন এই দুজনেরই কিছু সারপ্লাস মিনিং, উদ্বৃত্ত অর্থ আছে। তারা দুজনেই নিজেদের অতিক্রম করে পরস্পরের মধ্যে মিলে মিশে গেছে। এই দেশে কেউই আর আলাদা করে মডার্নও হতে পারে না, ট্রাডিশনালও হতে পারে না। তাই কেউ আর স্বদেশীও নয়, বিদেশীও নয়। কারুরই ঘর নেই, তাই কারুর প্রবাসও নেই।

কিন্তু, এটা তো আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের খুব কাছাকাছি শোনাচ্ছে। আমরাও তো ট্রাডিশন আর মডার্নিজমের একটা ওভারডিটারমিন্ড ভূমির কথা বলেছিলাম। যেখানে ট্রাডিশন আর মডার্নিজম 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'-তে রয়েছে। উন্নত বিশ্ব আর অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের, পশ্চিম আর পূর্বের, পুঁজির আর প্রাক-পুঁজির, মারুতি আর ঠেলার ওভারডিটারমিনেশন। তাহলে আমাদের সিন্থেটিক স্পেস আর ভাভার থার্ড স্পেস — এই দুটোর মধ্যে তফাত নেই কোনো? নিশ্চিত ভাবেই তফাত আছে। তফাতটা একাধিক স্তরে।

এক, ভাভার আমাদের ভূগোলটা আলাদা। ভাভা দেখছেন ইমিগ্রান্ট পরবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে। সেখান থেকে তাকিয়ে ভাভার কাছে ভূগোলটাই আর থাকছে না। আমাদের কাছে ভূগোলটা খুব স্পষ্ট ভাবে আছে। এখানটা এখান এবং আমেরিকাটা আমেরিকাটা। এবং এখান আর আমেরিকাটা যে সমান নয়, এক নয়, সেটা আপনি 'চলো আমেরিকা' দেখার পরেও যদি টের না পেয়ে থাকেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রথম লোকটাকে জিগেশ করুন, ভাই একটা চমৎকার সুযোগ আছে, আমেরিকায় চলে যাওয়ার, যাবে? (কুইজ অব দি মিলেনিয়াম — কোটিতে নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে আপনি কী উত্তর পাবেন বলুন তো?) থার্ড স্পেস যদি সীমান্তরিক্ত পরবাসীদের কথা

ভেবে থাকে, সিন্থেটিক স্পেস বিচার করছে সেই অবস্থানটাকে যা নিজভূমে পরবাসী। ঠেলা আর মারুতির অতিনির্ণয়ে যে তার চারপাশটাকেই বদলে যেতে দেখছে, সেখানের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থানকে। যখন তার নিজের দেশের মধ্যেই খেলা করছে আমেরিকা।

দুই, ভূগোলের এই তফাত এই দু ধরনের স্পেস-এর ভিতর ক্ষমতা-সম্পর্কের একটা তফাত গড়ে দিচ্ছে। ভাভা যে পরবাসীদের কথা বলছেন সেই পরবাসীদেরও কিন্তু একটা ভূগোলগত সংস্থান আছে। (কুইজ অফ দি মিলেনিয়ামের দ্বিতীয় প্রশ্ন, এবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে দুটো বিকল্পকে পাশাপাশি রাখা হল, আমেরিকা আর বাংলাদেশ, এবারের উত্তর কী হবে?) এই পরবাসীরা কোথায় গিয়েছে? কোন পরবাসে? বাংলাদেশে না আমেরিকায়? অবশ্যই আমেরিকায়, মানে উন্নত বিশ্বে। প্রথম বিশ্বে তারা তৃতীয় বিশ্ব আগত পরবাসী। তাদের সঙ্গে উন্নত বিশ্বের পুঁজি ক্ষমতার মোলাকাত হচ্ছে মুখোমুখি। আর আমরা বলছি সিন্থেটিক স্পেসের কথা যেখানে উন্নত বিশ্বের পুঁজি ক্ষমতার পারস্পরিকতা সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন এজেন্সি মারফত, আমেরিকা এখানে সরাসরি উপস্থিত নেই। ক্ষমতা কাজ করছে তার অর্থনীতি দিয়ে, সংস্কৃতি দিয়ে, বিদ্যাচর্চা দিয়ে। বিদেশী পুঁজি, মালটিন্যাশনাল করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, এনজিওরা, মিডিয়া, তত্ত্বচিন্তা। অর্থাৎ? আমাদের পুরোনো প্রসঙ্গটা, মেটাফর আর মেটোনিমের, মনে করুন। ভাভার থার্ড স্পেস-এ ক্ষমতার শাসনটা মেটাফরিক। এই সিন্থেটিক স্পেস-এ শাসনটা মেটোনিমিক।

তিন, ভাভা এসকোবার আপ্পাদুরাইদের কাছে পৃথিবী একটা মহাসমুদ্রের মতো, সব ধারা সেখানে মিশে গেছে, সবই শুধু অতিনিয়ন্ত্রণ, যেখানে কোনো দেশ আর নেই, পরদেশ আর নেই। তার মানে, একটা অতিনিয়ন্ত্রণের ভিতরে বিভিন্ন উপাদানগুলো যা হয়, তারা সব পরস্পর সমান। কিন্তু, আমাদের মিলেনিয়াম কুইজের রেজাল্ট কী বলে? সত্যিই কি ভারত বাংলাদেশ আর আমেরিকা সমান হয়ে গেছে এই মহাসমুদ্রে? না, আমরা তা মনে করিনা, আমাদের সিন্থেটিক স্পেস তা মনে করেনা। আমরা মনে করি এই অতিনির্ণয় আসলে অতিনির্ণয় তবে পুরোপুরি নয়। আসলে অতিনির্ণয়ের নকল এবং মুখ-ভ্যাংচানো। মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন। এর পরের সেকশনে আমাদের তাত্ত্বিক অবস্থান মার্জিন অফ মার্জিন-এর সাপেক্ষে সেই আলোচনায় আসব আমরা। থার্ড স্পেস যেখানে অতিনিয়ন্ত্রণ দেখেছিল আমরা দেখি অতিনিয়ন্ত্রণের নকল। থার্ড স্পেস যেখানে সাম্য দেখে সিন্থেটিক স্পেস দেখে সাম্যের পালাগানে অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়।

৩৩।। ভাভার সংস্কৃতি ধারণা

আমাদের বইটাতে আমরা ভাভার বিভিন্ন ক্যাটেগরি তুলে তাদের আলোচনা করে দেখিয়েছি, ভাভা যে ভাবে পার্থক্যকে ভেবেছেন তার মধ্যেই কী ভাবে তার তাত্ত্বিক কম-বোঝা লুকিয়ে আছে। ভাভা তার আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের চালু এসেনশিয়ালিস্ট প্রকার এবং তার সঙ্গে অতিনির্ণয়বাদী প্রকারের তফাত করতে গিয়ে দুটো বর্গ ব্যবহার করেছেন, কালচারাল ডিফারেন্স এবং কালচারাল ডাইভার্সিটি। আমাদের বইতে আমরা ভাভার এরকম অনেকগুলো বর্গকে তুলে আলোচনা করেছি। এখানে তার এই একটাকে ছুঁয়ে যাওয়া যাক।

কালচারাল ডিফারেন্স এবং কালচারাল ডাইভার্সিটি নিয়ে এই আলোচনাটা করতে গিয়ে ভাভার মূল ইংরিজি বাক্য ও বাক্য বন্ধগুলোকে রাখতে পারলে ভালো হত। মূল বইয়ে ওগুলো রাখার জন্যে এরকমই আর এক শীতে, ছিয়ানববইয়ের ডিসেম্বর আর সাতানববইয়ের জানুয়ারিতে ঠান্ডায় অসাড় আঙুলে কীবোর্ড টিপতে হয়েছিল ঘন্টার পর ঘন্টা। যারা শীত ভালোবাসে তারা কী কে জানে, পাগল না পায়জামা?

যা বলছিলাম, কালচারাল ডাইভার্সিটি। ভাভা কালচারাল ডাইভার্সিটি দিয়ে চালু সমাজবিজ্ঞানের আবহমান চিন্তা-প্রক্রিয়াটাকে ধরতে চাইছেন। এখানে মূল প্রসঙ্গ অবশ্যই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিতরকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য, একটা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়, নানা জনগোষ্ঠীর নানা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেকার আদান-প্রদান। ভাভা কালচারাল ডাইভার্সিটি বলতে বুঝছেন 'প্রদত্ত সাংস্কৃতিক অন্তর্বস্তু এবং প্রথার উপলব্ধি'-র উপর দাঁড়িয়ে একটা তুলনামূলক বিচার। এখানে ভালো করে বুঝুন এই 'প্রদত্ত' শব্দটাকে। ইতিহাস দ্বারা প্রদত্ত, বাস্তবতা দ্বারা প্রদত্ত। যেন অনড় কিছু একটা রয়েছে তাকে জাস্ট জেনে ফেলা পড়ে ফেলাটাই আমাদের দায়িত্ব।

আর এর বিপরীতে কালচারাল ডিফারেন্স বলে আর একটা বর্গকে ব্যবহার করছেন ভাভা তার নিজের তত্ত্বগত অবস্থানটাকে বোঝাতে। কালচারাল ডিফারেন্স বলতে তিনি বুঝছেন নিয়ত বদলে যেতে থাকা সীমান্তের একটা খেলাকে। সীমান্ত মানে আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মধ্যেকার সীমারেখা। এর বাইরে এটা আর গুজরাতি নয়। এর

ভিতরে এটা বাঙালি। ইত্যাদি। বিভিন্ন সংস্কৃতির নিজ-পরিচিতির এই সীমান্তগুলোকে অতিক্রম করে যাওয়ার ভিতরেই তিনি আলাদা আলাদা সংস্কৃতিকে আলাদা আলাদা করে চেনার প্রক্রিয়াটাকে আবিষ্কৃত হতে দেখছেন। সংস্কৃতিকে জানার চেনার হয়ে উঠতে দেখছেন নিয়ত বদলের এই জীবন্ত প্রক্রিয়ার ভিতর।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, যখন আমরা শুধু বাঙালিরাই ছিলাম সারা বাংলা জুড়ে তখন আমাদের বাঙালি বলে এই নিজ-পরিচিতি, আইডেন্টিটিটাই ছিলনা। বাঙালি বলে নিজেদের বোঝা, কাকে আমি বাঙালি বলব কাকে বলব না এই ভাবনাটাই গজিয়ে উঠল যখন বাঙালি বাস্তবতা সম্মুখীন হল বহির্দেশীয় কোনো বাস্তবতার। ধরুন গুজরাতিদের সামনাসামনি এলো তারা। তখনই বাঙালি বাঙালি হল, গুজরাতি গুজরাতি। গুজরাতি বাঙালি এই পারস্পরিকতাটা ঘটে ওঠার আগে অব্দি তো এই বোঝাটাই তৈরি হবে না।

এবার ভাভা যে পরবাসী এনআরআই বাস্তবতাটা বিবৃত করছেন তার সঙ্গে এটাকে মেলান, তাহলে বুঝতে পারবেন, পরবাসে পরবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গুলোর যে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় সেটাকে ধরতে চাইছেন। এবং সেটা ধরতে গিয়ে ওই কালচারাল ডাইভার্সিটি নামক এসেনশিয়ালিস্ট বর্গটাকে বাতিল করছেন। করে তার জায়গায় আনছেন কালচারাল ডিফারেন্সকে, যাকে আমরা বলব অতিনির্ণয়বাদী। কারণ, ভাভার মতে, প্রদত্ত কোনো সাংস্কৃতিক অর্থ একটা রূপকথা। ঠিক প্রথা ও আচারের স্মৃতির রূপকথার মতো।

ধরুন দুর্গাপুজো। সবার সবার সুবিধামত দিনে সুবিধামত সময়ে একটা দুর্গাপুজো ঠিক করা হল নিউইয়র্কে, সেখানে ক্যাসেট করা মন্ত্র বাজানো হল, একটা মাদকতাময় ভ্যারিয়েশনে বৈচিত্রে কয়েকটা প্রহর অতিবাহিত করলেন তারা। এবার ভাবুন তো, কেন করলেন তারা এই দুর্গাপুজোটা? দুর্গাপুজোটা যে ভূগোলে যে ইতিহাসে আসলে ঘটে সেখানে সেটা কোনো ইচ্ছিত ক্রিয়া নয়, একটা প্রথা, বরং সেই প্রথাটা ভাঙতে গেলেই আলাদা করে চেষ্টার দরকার পড়ে। যে মানুষগুলো সেটা করেন তাদের অস্তিত্ব থেকে নিউইয়র্কের এই মানুষগুলোর অস্তিত্ব সর্বতোভাবেই আলাদা। তারা যে দুর্গাপুজোয় পৌঁছচ্ছেন তাই সেটাও আলাদা। তাই সেই পৌঁছনোটা কখনোই ওই মূল প্রথায় না। এখানে দুর্গাপুজোটা আসছেই নিজের আইডেন্টিটি, আত্মপরিচয়টা হারিয়ে ফেলার ভয়ে। ওই পুজোটাই সেই কালচারাল ডিফারেন্স যা আচরিত হয়ে সাদা চামড়ার সাহেবদের দেশে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্তর্বস্তুটাকে নির্মাণ করল। কোনো প্রদত্ত পরিচয়ে পৌঁছনো নয়, পরিচয়টাই এখানে তৈরি হল।

(এখানে লোভ সামলাতে পারলাম না, নিজেরই একটা পুরোনো গল্পের কয়েকটা লাইন ঝেড়ে দেওয়ার — "যদিও এই ভারতবর্ষে, উজলি কিরন, বনমে হিরন, মন্দিরমে হো এক জলতা দিয়া আর খুশবু লিয়ে আয়ে ঠান্ডি হাওয়া থেকে সলমনের বাহো কি দরমিয়ান পৌঁছতে আর মুশকিল ইজাহার প্রকাশ করতে করতে মনীষাকে কেজি দশেক বাড়াতে হয়েছিল। ভাস্কর বলেছিল, সিন্ডি ক্রফোর্ড আর নাওমি ক্যাম্পবেলরা এখানে একটা প্যান্টিও বেচতে পারবেনা, লোকে ভাববে ওই কোমরে প্যান্টি থাকবে কী করে, খুলে তো পড়ে যাবে। ভুল, ভাস্কর ইনোসেন্ট, জাতিসত্তার উপর বড্ড বেশি নির্ভর করেছিল, জাতিসত্তা সত্যিই একটা সচেতন লোকেশন অফ কালচার, লোকেশন যা রিঅ্যা-লোকেশন, মিথিক মেমরি বানিয়ে তুলতে থাকা, বালি সাগুর রিমিক্সে, ডালের মেহন্দীর গলায় ভারতের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি জন্মাচ্ছে, এই ভারতবর্ষ পয়দাই হয়েছে পরবাসে, যেখানে ডলারও আছে, মেহন্দীও, হাইব্রিড। এনআরআইদের ভারতবর্ষ। যাদের ডান্ডিয়া খেলতেই হয়, দুর্গাপুজো করতেই হয়, নইলে তার নিজেকেই বলতে হবে, আমি তবে কেউ নই। এই আইডেন্টিটি, গোড়া থেকেই, আইডেন্টিটি অফ ইনকনফিডেন্স, নিজেকে ভারতীয় বলে চিহ্নিত করতে হয় তো তারই, যারা ব্যামবিনো থেকে ক্যাসেট নিয়ে গিয়ে দূর দ্বীপে বসে শোনে, এই পরবাসে রবে কে?)

ভাভার কৃতিত্ব এইখানটায় যে চালু এসেনশিয়ালিস্ট প্রকরণ থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা এখানেই যে তিনি, পার্থক্যরাও যে নানা প্রকারের হয় সেটা বুঝতে পারেননি। কিছু পার্থক্য ক্রিয়া করে মেটাফরে আর কিছু পার্থক্য ক্রিয়া করে মেটনিমিতে। এবং এই না বুঝতে পারা থেকেই তৈরি হয় ভাভার সঙ্গে আমাদের আর একটা বড় তফাত। কলোনি আর পোস্টকলোনির ঐতিহাসিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা নিয়ে। সেটার ইঙ্গিত আমরা আগেই করেছি, ভাভা কলোনি আর পোস্টকলোনিকে আলাদা বিচ্ছিন্ন কর্তিত বলে ভেবেছেন। আমরা বরং সেখানে ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতাকে দেখি। কিন্তু এর বেশি এখানে এগোতে গেলে এখানে আবার আমাদের লাকাঁর সিম্বলিক-রিয়াল-ল্যাক-মিমিক্রিতে ঢুকতে হবে। যা আমরা করবনা আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে এটা লিখতে লিখতে একবারও কীবোর্ড ছেড়ে উঠব না, কোনো বইয়ের পাতা না, কোনো লেখা না। যা মাথায় আছে তাই থেকে লিখে যাওয়া। কারণ রেফারেন্স আসতে শুরু করলেই লেখাটা হয়ত একটু স্পষ্টতর

হয়, কিন্তু যাদের জন্যে আমি এটা লিখছি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। এমনকী এইমাত্র যে গল্পটার লাইনগুলো আনলাম সেটাও হার্ডডিস্কেই ছিল, শুধু কপি আর পেস্ট। বহুজায়গায় হাত নিশপিশ করছে, ইস ওইটা একটু বলে নিতে পারলে ভালো হত, কিন্তু না, এইভাবে লেখাটায় একটা ভারি আরাম আছে। একটা প্রবাহে একটানা সেকশনের পর সেকশন লিখে যাওয়া। গল্প যেভাবে লেখে। যেন একটা মনোলগ।

ভাভা আপাতত শেষ। এবার আমরা যাব এই ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক নিয়ে আমাদের অবস্থানের কিছু খুঁটিনাটিতে।

৩৪।। সিন্থেটিক হেজেমনি

ভাভার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, ভাভা এস্কোবার এরা যেমন কলোনি আর পোস্টকলোনির মধ্যে ইতিহাসের একটা ছেদ দেখছেন আমরা তা দেখছি না। তারা পোস্টকলোনিয়াল বাস্তবতাকে দেখছেন অতিনির্ণয় দিয়ে, কিন্তু কোলোনিয়াল যুগে সেই অতিনির্ণয়কে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের ধারণায় ঔপনিবেশিক আমলে শাসন ছিল অনেক খাড়া সরাসরি প্রত্যক্ষ। আমরা কিন্তু আমাদের সিন্থেটিক স্পেসকে, এবং সেই স্পেস-এর পরিবর্তিত শাসন সিন্থেটিক শাসনকে খুঁজে পাচ্ছি ঔপনিবেশিক আমলেই। সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

মেকলে পশ্চিমী শিক্ষার কাণ্ডারী হয়েছিলেন। সাহেবদের তখন অনেক ক্লার্ক দরকার ছিল। খাঁটি দেশী ক্লার্ক। সাহেব ক্লার্ক বিলেত থেকে ইমপোর্ট করা খুব কস্টলি এটা তত বড় বিষয় না, বড় কথা এখানে কিছু মিডলম্যান, যারা সাহেবদের কথা অনুবাদ করে দিতে পারবে দেশীদের কাছে। হিজ মাস্টার্স ভয়েজ যদি সাহেবদের ভয়েসে শুধু সাহেবি মানে ইংরিজি গানই বানায়, লোকে তো শুনবে না। তাই ওই কুত্তা-ছাপ গানই শুনব কিন্তু এবার তার ভাষাটা হবে বাংলা। আবার সেই বাংলা মানে সাহেবদের কথার বাংলা। সাহেবরা যা বলবে তা লোকের কাছে তা বাংলায় পৌঁছে দেবে এই ক্লার্করা।

ঔপনিবেশিক ভারতকে ভাবুন। ইংরাজরা আধুনিকতা আনছে। মডার্ন পশ্চিম ট্র্যাডিশনাল পূর্বকে মডার্নাইজ করছে। এখানে শাসক এবং শাসিত এদের মধ্যের শাসনের সম্পর্কটাকে খুব সরল রকমে দেখার ফলাফল হল, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা বা রণজিৎ গুহ ইত্যাদি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ঐতিহাসিকেরা যেভাবে এই ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে দেখেছেন। অর্থাৎ, যেখানে যেখানে মডার্নাইজেশনের যে যে খামতি রয়েছে, যেমন ধরুন রেলপথ বা শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট রকমের আধুনিকীকরণ করল না ইংরাজরা, সামাজিক প্রথার আধুনিক-বিরোধী সব জায়গাগুলোকে অপসারণ করবার চেষ্টা করল না — এই খামতিগুলোকে এই সরলপ্রাণ ঐতিহাসিকেরা ইংরেজ হেজেমনির অসম্পূর্ণতা বলে ভেবেছেন। ইংরাজ শাসনের একধরনের অক্ষমতা বলে ভেবেছেন।

আমরা আলোচনা করেছি কেমন করে পুঁজি আদৌ না চাইতেই পারে সমগ্র হয়ে উঠতে। তার মানে কোনো কোনো জায়গা সে নিজের বাইরেই থেকে যেতে দেবে। এটা সে করে সে তার মোট অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে। তার মানে যে জায়গাটা ছেড়ে না দিতে হলে তাকে নিপীড়ক বা কোয়েরসিভ হয়ে উঠতেই হয়, সেরকম কিছু জায়গাকে ছেড়ে দিয়ে বরং সে বাস্তবতাটাকে শাসন করবে তার পারসুয়েশন দিয়ে। প্রজারা রাজার গুণও গাইবে। শুধু অত্যাচারের ভয়েই তাকে মানবে এমন নয়। পুঁজির ক্ষেত্রে হেজেমনির এই প্রকারভেদ এখন বেশ চালু বিষয়।

কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুকে সচরাচর কোয়েরসিভ বলেই ধরা হয়। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলতে নিপীড়ক বা কোয়েরসিভ রাষ্ট্রই বুঝেছেন। তাই কোলোনাইজড মানুষের কাছ থেকেও একমাত্র রেজিস্টান্স বা প্রতিরোধকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেখানে যেখানে কোলাবোরেশন বা সাহায্য পাওয়া গেছে তাকে হয় ধরে নেওয়া হয়েছে প্রভুর সম্পদে কিনে নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা, অথবা ঔপনিবেশিক প্রভুর বানানো কোনো গুলগল্প। এটা একটা ভুল — ঔপনিবেশিক প্রভুদের ক্ষমতাকে অনেক কমিয়ে দেখা। এই ভুলের কারণেই ঐতিহাসিকের পর ঐতিহাসিকের নজর এড়িয়ে গেছে কী ভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা মানুষের মন অব্দি পৌঁছে যায়, তাকে ভেঙেচুরে বেঁকিয়ে বানিয়ে তোলে একটা নয়া চীজ — কোলোনিয়াল মাইন্ড বা ঔপনিবেশিক মন, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বস্তু। আর ঔপনিবেশিক প্রভুর ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দেখার একটা ওপিঠ আছে। সেটা হল, আমাদের তথাকথিত নবজাগরিত চিন্তাবিদদের বাড়িয়ে দেখা। তৃতীয় বিশ্বের এই জনসাধারণের হয়ে যারা কথা বলেছেন, হে ঈশ্বর, এমন হতেই পারে যে তারাও আসলে পৃথিবীর বুকে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন ঔপনিবেশিক মন নিয়ে! যাঃ! এরকম বলতে নেই, পাপ হয়!

আমাদের সিন্থেটিক স্পেস এই সরলমতি ঐতিহাসিকদের শৈশবিক সরলতাকে একটু কোরাপ্ট করার চেষ্টা করেছে। একটু ম্যাচিওর করার, বয়স বাড়ানোর। সিন্থেটিক স্পেসের সিন্থেটিক হেজেমনিকে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আমাদের প্রথমেই বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের চালু ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ওই প্রবণতা থেকে যা শাসনকে শুধু সরল সাংস্কৃতিক ভূমিতেই বুঝতে চায়। দেখা যাক, এই সরল সাংস্কৃতিক ভূমির ধারণা শাসন এবং বশীকরণকে কী ভাবে দেখে। (মনে করতে পারছেন, সরল ভূমি কাকে বলে? যেখানে সরল সোজা সাপ্টা ভাবে সমগ্র তৈরি হয়, পুরোনোকে অপসারণ করে ক্ষমতা সরাসরি নিজের শাসনকে অপ্রতিহত করে তোলে। এর পরে এসেছিল জটিল ভূমি, যেখানে সমগ্র গজায় না, তাই পুরোনো আর নতুনের কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে কারবাইডে পাকানো হয় একটা সারোগেট সমগ্র। এই কারবাইডে পাকানোটাকেই বলেছিলাম আমরা প্যাসিভ রেভলিউশন। এর সাপেক্ষে এনেছিলাম আমাদের সিন্থেটিক ভূমিকে।) এই সরল সাংস্কৃতিক ভূমির ধারণা ধরে নেয় যে প্রভুর পারসুয়েশন এবং ভৃত্যের কোলাবোরেশন একই সমস্বত্ত্ব বা হোমোজিনিয়াস ভূমিতে নির্মিত হয়, তাদের সিগনালিং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য বা দূরত্ব নেই। মানে সিগনাল প্রেরণ বা গ্রহণের লেভেলে কোনো কেলো নেই। প্রেরণ মানেই গ্রহণ। পারসুয়েশনের সিগনাল সে ঠিকই পাবে, কিন্তু কোলাবোরেশন করবে কি করবে না সেটা পরের ব্যাপার। মানে বোঝাবুঝির জায়গায় কোনো সমস্যা নেই। তাই, এই সরল ভূমিতে, প্রভু ভৃত্যকে বোঝায়, চাপ সৃষ্টি করে, ভৃত্যও বোঝে, সে তখন দেয় কোলাবোরেশন। তাই প্রভু যদি এই কাজে ব্যর্থ হয় তার মানে সেটা তার পারসুয়েশনের ব্যর্থতা, শাসনের ব্যর্থতা। এখানে তো সিগনাল ব্যবস্থার কোনো গড়বড় হতে পারে যে এটা ভাবাই হয় না। এটা সরল ভূমি।

কিন্তু এই প্রশ্ন করা হয় না, কেন ওই ঔপনিবেশিক প্রভুর শাসনের এই ব্যর্থতাটা ঘটল? কেন সে কমিউনিকেট করতে পারল না এই পারসুয়েশনের সিগনালটা? বা এই প্রশ্নটাও করা হয় না, কমিউনিকেশনের এই ব্যর্থতাটা সে কী ভাবে কাটিয়ে ওঠে এবং পাকিয়ে তোলে আর একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শাসন, যা আর শুধুমাত্র পারসুয়েশনের উপর নির্ভর করে না? ভাবা হয় না ওই প্রশ্নটাও যেটা আমরা একটু আগেই বললাম, যে প্রভু আর ভৃত্য একই সাংস্কৃতিক ভূমির না হলে, তাদের সাংস্কৃতিক ভূমি তথা ভাষা আলাদা আলাদা হলে তখন কী হবে? আমরা এর আগে হেজেমনির আলোচনার সূত্রে বলেছি, কী ভাবে প্রভু তার পারসুয়েশন পাঠায়, আর তার বিনিময়ে ভৃত্য পাঠায় তার কোলাবোরেশনকে। এখানে আমরা সেই প্রশ্নটাকে করতে চাইছি একটা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে। উপনিবেশ গড়ে তুলল যে সেই কলোনাইজারের ভাষা তো কলোনাইজড প্রজার থেকে আলাদা। ভাষা বলতে আবার আমরা, ঠিক টেক্সট এর মত করেই, পুরো চিন্তনপ্রক্রিয়টাকে ভাবছি। এবং ভাষা তো তাদের আলাদা বটেই। এবার, প্রশ্নটা হল, কী ঘটবে ওই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে, যদি তাদের ভাষাটা আলাদা হয়? যদি তাদের সাংস্কৃতিক ভূমি দুটো আলাদা হয়?

এবার, প্রভু আর ভৃত্য যদি দুটো আলাদা সাংস্কৃতিক ভূমিরই প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে এই বিনিময়টা ঘটার জন্যে কী ভাবে বিভিন্ন সিগনাল বা সঙ্কেত একটা ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে পৌঁছয় সেটা দেখানো দরকার। কারণ, পারসুয়েশন তৈরি হচ্ছে প্রভুর সাংস্কৃতিক ভূমিতে আর কোলাবোরেশন তৈরি হচ্ছে ভৃত্যের ভূমিতে, তাই পারসুয়েশনের ঠিক প্রতিবিম্ব হিশেবে ভেবে ওঠা যাচ্ছেনা কোলাবোরেশনকে, দুজনে দুটো আলাদা সাংস্কৃতিক ভূমির দুটো আলাদা ভাষায় তৈরি করছে তাদের সিগনাল। প্রভুকে যদি সফল ভাবে তার পারসুয়েশনের কাজটা করতে হয় তাহলে এই ক্রিয়ার কর্তা ওই প্রভুকে অন্তত এমন একজন কর্ম মানে ভৃত্য খুঁজে পেতে হবে যে তার এই পারসুয়েশনের ভাষা বুঝে উঠতে পারে।

তাহলে এবার প্রশ্নটা হল, কী ভাবে ওই প্রভু এমন একটা সাংস্কৃতিক (অর্থাৎ আলোচনাগত) ভূমি নির্মাণ করবে যেখানে প্রভু আর ভৃত্যের মধ্যে মতামত-বিনিময়টা ঘটতে পারে? কোলোনাইজার প্রভু কী করে তার কোলোনাইজড ভৃত্যকে শাসন করবে যদি ওই ভৃত্য তার ভাষা না বোঝে?

এখানে আমাদের বক্তব্যটা এই যে, এই রকম একটা প্রাথমিক ব্যর্থতার পর, প্রভুর এবার বানিয়ে তোলার দরকার পড়ে একটা কৃত্রিম সঙ্কর সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমি। যে ভূমিতে প্রাথমিক পারসুয়েশন কোলাবোরেশন সিগনালকে বাদ দিয়ে আর এক ধরনের সিগনালও করা যাবে। সেখানে একটা বানিয়ে-তোলা ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে যার মধ্যে প্রভুর মতামত অনুযায়ী বদলে যাবে পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন দুইই। কারণ, প্রভু তাদের বদলে নিতে চায়। সে দেখেছে তার প্রাথমিক সিগনাল ব্যর্থ হয়েছে। সিন্থেটিক ভূমি, সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমি বলতে আমরা বুঝব ওই বানিয়ে-তোলা

ক্ষেত্রটিতে প্রভু থেকে ভৃত্যে ওই পরিবর্তিত পারসুয়েশন সিগনালের প্রবাহ, এবং তার বিপরীতে, সেই সিগনাল গ্রহণের পর ভৃত্যের পরিবর্তিত কোলাবোরেশনের প্রবাহ।

তার মানে, দেখুন, আমরা সিন্থেটিক স্পেসকে সরাসরি প্রভুর পারসুয়েশন থেকে পেলাম না। ভৃত্যের আদত নিজস্ব জায়গাগুলোকে প্রভু বদলে নিয়েছে তার শাসনকে চারিয়ে দিতে গিয়ে, এবার সেই বদলে যাওয়া ভৃত্যতার থেকে আমরা পেলাম আমাদের সিন্থেটিক স্পেসকে। অর্থাৎ, প্রভু বদলে ফেলল ভৃত্যের অস্তিত্বের মূল নীতিগুলোকে এবং তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তার বশীকরণের পারসুয়েশনের নীতি এবং ফের সেটা পাঠাল ভৃত্যকে। এই পারসুয়েশন কিন্তু এবার বুঝতে পারবে ভৃত্য যা আগে সে পারেনি। সিন্থেটিক স্পেস তাই প্রভুর দিক থেকে একটা মতাদর্শগত প্রচেষ্টাকে, একটা সচেতন উচ্চারণকে ধরে নেয়। যে মতাদর্শগত প্রচেষ্টা বশীকরণের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে বদলে দেয়, ওই মতাদর্শগত প্রচেষ্টা দিয়ে তাদের পুরোনো চেহারাটাই বদলে ফেলে।

এটা করতে গেলে প্রভুকে শিখে নিতে হবে ভৃত্যের ভাষা, তার প্রতিমা, তার নিষেধ, তার সংস্কার, তার আবেগ। কারণ নইলে সে তার সিন্থেটিক শাসনের মতাদর্শগত প্রচেষ্টায় তাদের বদলাবে কী করে? সেই ভাষাটাকে, সেই উপাদান গুলোকে এবার সে বদলাবে আর তার সঙ্গে মেশাবে তার পারসুয়েশন। ভৃত্য এখন থেকে একটা নতুন ভাষা বলবে, কথা বলবে তার প্রভুর গলায়, হিজ মাস্টার্স ভয়েস। সাধে এইচএমভি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে এতখানি বহন করে? এবং ভৃত্য এটা করবে তার অগোচরে, সে ভাববে সে বুঝি এখনো তার মাতৃভাষাতেই কথা বলছে। আসলে তার অগোচরেই সে গৃহহীন হয়ে গেছে , নিজভূমে পরবাসী হয়ে গেছে। এই নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়ার, নিজের ভাষার শব্দগুলো একই থেকে আসলে তাদের অর্থ বদলে যাওয়ার কথায় আসছি আমরা। তার আগে চালু ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ধারণা নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

৩৫।। ঔপনিবেশিক ইতিহাস

ঔপনিবেশিক শাসনের চালু আলোচনাগুলো শাসকক্ষমতার এই কায়দার জায়গাগুলোকে লক্ষ্য করতে পারে না। তাদের কাছে শাসনের সাফল্য মানেই সাফল্য, আর ব্যর্থতা মানেই সাফল্যের অভাব। আসলে অনেক ব্যর্থতাকে নিজেই রেখে দেওয়ার, তার মধ্যে দিয়ে মতাদর্শ আর সংস্কৃতির পুরোনো অর্থগুলোকে বদলে ফেলার এই কৃৎকৌশলটাই ধরতে পারেনি তারা। আর একবার গুহকে নিয়ে পড়া যাক, যিনি মনে করেন যে ইংরাজ শাসন কখনোই ভারতের মানুষের উপর হেজেমনিতে যেতে পারেনি, এবং তার উদাহরণ হিশেবে ইংরাজদের আধুনিকীকরণের কিছু খামতিকে উল্লেখ করেন। আধুনিক এবং ঐতিহ্যকে তারা মুখোমুখী সংঘাতপ্রবণ হিশেবে ধরে নিয়েছেন, এবং আধুনিকীকরণের ওই খামতিকে আসলে ঔপনিবেশিক শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা হিশেবে দেখা দেওয়ার অক্ষমতা হিশেবে বুঝেছেন।

এই ঐতিহাসিকরা তাই একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনকে শুভ আর অশুভ বলে ভেবেছেন। শুভ এই অর্থে যে সে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতাকে নিয়ে আসছে। আর অশুভ তো খুব সহজ কারণেই, উপনিবেশের মানুষের পরাধীনতার তারাই কারণ। এবং ভারতীয় অর্থনীতি তথা সমাজকে এরা কতটা আধুনিক করে তুলতে পেরেছেন তাই দিয়ে মাপা হয়েছে শাসক হিসেবে ইংরাজদের সাফল্যকে। এর মানে এই যে ইংরাজ শাসনকে তারা সরল ভূমির নিরিখে ভেবেছেন। কিন্তু আসলে সেখানে যেটা ঘটেছিল সেটা সিন্থেটিক ভূমির উপর সিন্থেটিক শাসন। এই সরল ভূমি দিয়ে ভাবা ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রভুকে ভেবেছেন তার আভ্যন্তরীন অস্তিত্বের নীতি মানে আধুনিকতা দিয়ে, আর ভারতীয় প্রজাসমাজকে ভেবেছেন ভৃত্যের আভ্যন্তরীন নীতি মানে ঐতিহ্য দিয়ে।

তার মানে ঔপনিবেশিক শাসনের সাফল্য তখনই যখন সে তার মডার্নিস্ট পারসুয়েশন দিয়ে ভারতীয়দের থেকে কোলাবোরেশন বার করে আনতে পেরেছে। আর ব্যর্থ কখন? যখন ভারতীয়রা আধুনিকতার ওই পারসুয়েশনে সাড়া দেননি। যেমন, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে তারা আধুনিকীকরণের আওতায় আনতে পেরেছিলেন, তাই এই ঐতিহাসিকরা এখানে সেটাকে ইংরাজ শাসনের সাফল্য বলে ভাববেন। সেখানে ভারতীয় কোলাবোরেশনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেমন বিদ্যাসাগর, আশুতোষ এদের আধুনিক ভারতে সম্মানিত চিন্তাবিদ এবং মহান মানুষ বলে ধরা হয়। তেমনি ভারতে রেলপথ আনাটাও তাদের সাফল্য, কারণ অর্থনীতি আধুনিক হচ্ছে। যারা আবার ততটা সফল মনে করেন না ইংরেজ শাসনকে তারা বলে থাকেন দেশের মোট বাস্তবতার তুলনায় এই আধুনিকীকরণের পরিমাণটা অত্যন্ত নগণ্য। অর্থাৎ, এই সরল ভূমির জায়গাটায় এই বিরোধীরাও এক। তারাও ইংরেজ শাসনের সাফল্য অসাফল্য বলতে ওইগুলোকেই বুঝছেন, শুধু সাফল্যের পরিমাণ নিয়ে তাদের মতবিরোধ আছে। এ এক বিস্ময়কর মতৈক্য।

গুহ আধুনিকীকরণের এই অসাফল্যকে ইংরেজদের তরফে একধরনের কমপ্রোমাইজ বা সমঝোতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এখানে ধর্ম/ অধর্ম-র ধারণাকে এনেছেন। বলেছেন ভারতীয় প্রজা ইংরেজ প্রভুকে দেখেছে তার ধর্ম এবং অধর্ম ধারণার নিরিখে। যেখানে এটা রাজার ধর্মের মধ্যে পড়ে যে প্রজা যেন তার ন্যূনতম জৈবনিক প্রয়োজনটা এবং তার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন গুলো মেটাতে পারে সেটা দেখা। যে রাজা এটা দেখেনা সে অধার্মিক। তাই রাজাকে কার্যসূচী নিতে হবে যাতে প্রজাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। সেচ, সুরক্ষা ইত্যাদি। আর প্রজারা যদি তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও না মেটাতে পারে, তখন প্রতিরোধও তাদের প্রজাধর্মের মধ্যেই পড়ে। যদি খরা দুর্ভিক্ষ চলাকালীনও রাজা বিলাসরত থাকে সে রাজা অধার্মিক ইত্যাদি। গুহ, মজার কথা, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের পারসুয়েশনের ভিতর মডার্নিজম এবং এই ধর্ম ধারণার একটা মিশ্রণকে পেয়েছেন। এবং এই মিশে যাওয়াটাকে তিনি বুঝেছেন ইংরেজ শাসনের একটা কমপ্রোমাইজ তাই অসম্পূর্ণতা বলে। শাসনের খামতি।

আমরা এটাকে দেখছি খামতি নয়, অন্য এক ধরনের শাসনের উপস্থিতি হিশেবে। সিন্থেটিক স্পেসের সিন্থেটিক শাসন। আমরা এইখানে প্রশ্ন করেছি যে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক ইংরেজ শাসন — এই দুটো পরস্পর বিরোধী উপাদান এত সহজে মিশল কী করে? এখানে এবার ব্যবহার করুন আমাদের সিন্থেটিক স্পেস সম্পর্কে আগের বলে আসা কথাগুলো। যেখানে আমরা বলেছি, ট্রাডিশন আর মডার্নিজম এই দুই থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস আর পরস্পরবিরোধী নয়। তারা যে শুধু মিলে মিশে আছে, নিজেদের বাঁচাতে, একে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে (কমপ্লেক্স স্পেস বা জটিল ভূমি) তা নয়। তারা আর পরস্পরের শত্রুই নয়। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন দুই-ই দুয়ের মধ্যে মিশে আছে। নইলে ওই সমঝোতা বা মিশ্রণ ওভাবে ঘটতেই পারত না। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন অতিনির্ণীত। দুই-ই দুয়ের দ্বারা নির্মিত ও নির্ণীত। তারা আর দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন জল-অচল বর্গ নয়। মডার্নিজম নিজেই ইকনমিক কালচারাল আর ইডিওলজিকাল এই তিনটে জটের একটা জট। তার মানে মডার্নিজমের মধ্যেই ট্রাডিশন রয়েছে। এই আগে-থেকেই-ট্রাডিশন-মিশে-থাকা মডার্নিজম যখন ট্রাডিশনের মুখোমুখি হচ্ছে ততক্ষণে সে নিজেই বদলে গেছে। এবং এখানে, এই ঔপনিবেশিক ইতিহাস বোঝার আমাদের কাজে, আমাদের কাছে আরো জরুরি এর ঠিক উল্টো জায়গাটা যে ট্রাডিশন যখন মডার্নিজমের সামনে দাঁড়াচ্ছে তখন সেও বদলে যাচ্ছে।

আমাদের বইয়ে আমরা এই কাজটা করেছি লাকাঁর কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এখানে সেগুলো না-করেই আমরা দেখার চেষ্টা করব যে সিন্থেটিক শাসনের এই ধারণা ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক ইতিহাসটা পড়া যায় কিনা। আমরা একটু আগে নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, নিজের মাতৃভাষা নিজের অগোচরে বদলে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। যেখানে ভৃত্য যেটাকে ঐতিহ্য বলে ভাবছে আসলে তার মধ্যেই মিশে আছে আধুনিকতা। সে যে অর্থে যে শব্দ গুলোকে পড়ছে, যে ছবিগুলোকে দেখছে, যে কথাগুলোকে লিখছে আসলে তার মধ্যেই মিশে আছে ভীষণ ভিন্ন এমনকি একদম বিপরীত সব অর্থ। আমরা এখানে বেছে নিচ্ছি দুটো গল্প বা উপকথা। যা শুনতে শুনতে আমরা তো বড় হয়েইছি, বোধহয় এখনকার বাচ্চারাও হয়। এক, বিদ্যাসাগরের সাহেবের সামনে টেবিলে ঠ্যাং তুলে নাচানোর গল্প, আর একটা আশুতোষ মুখার্জির কোট ও জুতোর গল্প। দুটো গল্পেরই মূল উপজীব্য কী? দেশপ্রেম, বীরত্ব, সাহস। এবং এই তিনটেই গড়ে উঠছে ইংরাজ প্রভুদের প্রতি বিরোধিতায়। মানে এ দুটোই ইংরাজ বিরোধিতার গল্প।

এবার গল্প দুটোকে আর একবার ভাবুন। বিদ্যাসাগরের গল্পে বিদ্যাসাগর অপমানিত হয়েছিলেন একজন ইংরাজের কাছে যিনি টেবিলে ঠ্যাং তুলে রেখেছিলেন যখন বিদ্যাসাগর তার ঘরে গেছেন, এবং তাই, তিনি আবার যখন ইংরেজটি তার ঘরে এল তখন তার ঠ্যাং টেবিলে তুলে রাখলেন এবং নাচালেন। আর কী, থোঁতামুখ ভোঁতা হয়ে গেল সেই ইংরেজের, এই বলে আমার মা এই গল্প শেষ করত। মানে, বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধের কাছে আত্মসমর্পণ করল ইংরেজ ঔদ্ধত্য। এবার গল্পটাকে আর একবার ভাবুন তো? গল্পটা আসলে ইংরেজ বিরোধিতার না ইংরাজ তোষণের? গল্পের সাহেব তার ঔদ্ধত্য ভেঙে একজন ভারতীয়ের কাছে নত হয়েছিলেন। তার মানে তেমন সাহস তেমন আত্মাভিমান থাকলে ইংরেজ তার কাছে নত হয়। ইংরেজ মর্যাদাবানের মর্যাদা দিতে জানে। এবং এর আরো একটা উপ-সিদ্ধান্ত হয় — বেশির ভাগ মানুষ তেমন মাপের নয় বলেই ইংরেজ তাদের এই মর্যাদা দেয় না, তার মানে তো একটা জায়গায় তারা ঠিক আচরণই করে, ন্যায়সঙ্গত, কারণ সেই মানুষগুলো তো মর্যাদা দেওয়ার মত মানুষই নয়। এবার আশুতোষের কোট একজন সাহেব ট্রেনের জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বলে আশুতোষ আবার সেই সাহেবের বুট জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন — নাকি আশুতোষের বুট আর সাহেবের কোট — আসলে তো দুটোই এক,

কোলোনিয়াল মিমিক্রিতে সাহেব আর সুবো — এই গল্পটাকে নিজেই আর একবার ভাবুন। এটার কথায় আর যাচ্ছি না।

আর একটা খুব মজার জায়গা হল গীতাকে কী ভাবে দেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বা গীতাকে এবং বঙ্কিমের এই গীতা-দেখাকে কী ভাবে দেখেছিলেন মোহনদাস গান্ধী বা পার্থ চ্যাটার্জি। পরতে পরতে কী ভাবে সেখানে রিডিফাইন্ড বা পুর্নসংজ্ঞায়িত হয়েছে ট্রাডিশন। আসলে মডার্নিজম কী ভাবে ঢুকে পড়েছে আমরা যাকে ট্রাডিশন বলে চিনছি তার অভ্যন্তরেই। ধরুন তার গুরু-শিষ্য-সংবাদ বা কৃষ্ণচরিত্র বা গীতার ভাষ্যে বঙ্কিম বারবার তার নিজের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মনের কাছে যা খারাপ লাগছে তাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় গুরুত্ব দিচ্ছেন। জাতিভেদ বর্ণভেদের বিষয়ে এক ধরনের একটা নৈঃশব্দ্য দিচ্ছেন। কারণ তিনি তো গীতার গৌরব বৃদ্ধি করতে চাইছেন। খারাপ জায়গাটাকে কম আর ভালো জায়গাটাকে বেশি করে তুলে ধরতে চাইছেন। এবার এই 'খারাপ' বা 'ভালো' মানে? কার কাছে খারাপ? কার কাছে ভালো? অবশ্যই পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত পশ্চিমের যুক্তিবোধ বা রিজনের কাছে। এবার সেই বঙ্কিম যে পূর্বকে খুঁজে দিচ্ছেন আমাদের সামনে তা কতটা পূর্ব আর কতটা পশ্চিম? আবার গান্ধী যখন সেটাকে বুঝতে চাইছেন তখন তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে আর এক স্তরের অতিনির্ণয়। পার্থ চ্যাটার্জি যখন গীতা বিষয়ে বঙ্কিমের আলোচনা নিয়ে তার আলোচনায় বঙ্কিমের এই নৈঃশব্দ্য বিষয়ে তার দ্বিতীয় স্তরের নৈঃশব্দ্য দিচ্ছেন তার মধ্যে ঢুকে আসেছে আর এক স্তরের পশ্চিমের মুখ চেয়ে থাকা। দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা, প্যাঁয়্যা।

এই ইংরাজ-বিরোধিতার ছবিতে লুকিয়ে রাখা ইংরাজ-তোষণের সিন্থেটিক স্পেস-এর শুরুয়াতটা হয়েছিল মেকলেকে দিয়ে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ। তার থেকে ঔপনিবেশিক ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণ তাই সিন্থেটিক শাসনের নবজাগরণ।

৩৬।। অন্য অবস্থানগুলো এবং আমরা

চালু এবং নেতৃস্থানীয় পোস্টকলোনিয়াল পোস্টমডার্ন অবস্থানের সঙ্গে আমাদের কিছু পার্থক্য চিহ্নিত হল। উত্তরআধুনিকদের সঙ্গে আমাদের আর একটা পার্থক্যের জায়গা বাকি আছে। আমার মাল্যবানের লেখাটা পড়ে কলকাতার একজন উত্তরআধুনিক লেখক অপরের একজনকে বলেছিলেন, পোস্টমডার্ন কোথায়, এ শালা তো মার্ক্সিস্ট। সারা লেখাটা জুড়ে মার্ক্সবাদের প্রতি সমালোচনার ওই সমূহ চিহ্ন থেকে নিশ্চই তিনি মার্ক্সবাদ থেকে তফাতের জায়গাটা চিনতে পারেননি এমন নয়। আসলে তিনি মার্ক্সিস্ট বলতে ঠিক মার্ক্সিস্ট নয় অন্য একটা কিছুকে বুঝিয়েছিলেন। সেই অন্যকিছুটা হল অবশিষ্ট উত্তরআধুনিকদের আমাদের তফাতের জায়গাটা। আমরা মনে করিনা সমগ্র নেই বলেই ক্ষমতা নেই, বা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নেই। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গল্প শেষ হয়ে গেছে।

লেখার চার নম্বর সেকশনে এসে বলেছিলাম, আমার নিজের জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে আমি কিছুতেই বলে উঠতে পারব না এই 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' বইটায় ঠিক কী বলতে চেয়েছি। কারণ কী বলতে চেয়েছি এই প্রশ্নটাকে একমাত্র উত্তর দেওয়া যায় কেন বলতে চাই এই প্রশ্নটার নিরিখেই। চালু রাজনীতির হতাশা আমার এই রাজনীতিটাকে কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু আমার রাজনীতি কেড়ে নিতে পারেনি। রাজনীতি করে চলেছি এই লেখাগুলো দিয়ে। লেখাগুলো আমার কাছে অন্তত, একান্তই রাজনৈতিক। প্রতিরোধের পুরোনো থিওরিগুলো ফেটে যাচ্ছে। আর একটা প্রতিরোধের তত্ত্বে পৌঁছনোর চেষ্টা হিশেবেই আমার কাছে এসেছিল এই বই লেখার কাজটা। এবং এই লেখাটাও গজাচ্ছে সেই একই জায়গা থেকে। এবং এই রাজনৈতিক অবস্থানটা লক্ষ্য করেই ওই পোস্টমডার্ন লেখক আমার পোস্টমডার্নতার প্রতি তার অশ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এই অশ্রদ্ধাটা একান্তই উচিত এবং জাস্টিফায়েড, ন্যায়সঙ্গত। আমি সেই অর্থে পোস্টমডার্ন কখনোই নই, যে অর্থে আমাদের তৃতীয় বিশ্ব নামক ঠিকানাটাই আজ আক্রান্ত। চালু পোস্টমডার্ন অবস্থানগুলো থার্ড ওয়ার্ল্ড এই সংজ্ঞাটাকেই নেই করে দিতে চাইছে।

কী ভাবে সেটা দেখা যাক। তৃতীয় বিশ্ব এই নামটার মধ্যেই যে 'তৃতীয়' শব্দটা আছে, তিন নম্বর, সেটা এক এবং দুই নম্বরে পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং সমাজবাদী বিশ্বকে ধরে। সেই অর্থে, আজ, সমাজবাদী বিশ্বটাই যখন নেই হতে বসেছে, তৃতীয় বিশ্বটাই দ্বিতীয় বিশ্ব হয়ে যাচ্ছে, যে প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক দিকটাকে আমরা গ্লোবালাইজেশন বলে ডেকে অভ্যস্ত। যখন পুঁজির মেরুকরণ হয়ে যাচ্ছে। তার আন্তর্জাতিক অবাধগতির দৌলতে সারা পৃথিবীর পুঁজি ক্রমে একসূত্রে গ্রথিত হতে যাচ্ছে। এইটা নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত। কিন্তু অনেকেই যেটা ভাবেন না, আমার বন্ধু ব্যানার্জি যেটা খেয়াল করেছিল খুব ভালোভাবে, এই পুঁজির মেরুকরণেরই আর একটা দিক শ্রমের মেরুকরণ। সারা পৃথিবীর

শ্রমকে একসূত্রে গ্রথিত করে সত্যিকারের একটা আন্তর্জাতিকের বাস্তবতা এরকম স্পষ্ট আর কখনো হয়নি যা গ্লোবালাইজেশন আর ইন্টারনেটের পৃথিবীতে হয়েছে। যাই হোক, যা বলছিলাম, পোস্টমডার্নিস্টরা যে তৃতীয় বিশ্বকে নেই করে দিচ্ছেন সেটা কিন্তু কখনোই এই দ্বিতীয় বিশ্ব করে দেওয়া নয়। সেটা আরো গভীর জায়গায়।

কলোনি গুলো ছিল একটা এলাকা, যেখানে আধুনিক সাম্যের সভ্যতার পুঁজি তার অন্ধকারকে ঠেলে দিত, আমরা সেই কথা আগেই বলেছি। এই কলোনি গুলো ছিল সেইসব এলাকা যেখানে সাম্য কাজ করত না। পুঁজির রিজন কাজ করত না। সেখানে ছিল অসাম্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোয় দেশগুলো স্বাধীন হল, তাদের উপর ঔপনিবেশিক শাসন আর রইল না। কিন্তু তাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাস রয়ে গেল। সেই একদেশতা, মিল, যা তাদের একত্রে 'তৃতীয় বিশ্ব' এই নামে সূচিত করল। সেই পুরোনো ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতাও রইল। অসাম্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। কিন্তু পোস্টকলোনিয়াল থিওরি, পোস্টমডার্নিজম একযোগে আক্রমণ করল সেই জায়গাটায়। পোস্টকলোনিয়ালিটি দেখল যে কলোনিতে আমরা অসমান ছিলাম, কেউ ভারতীয় কেউ ব্রিটিশ। এখন আমাদের কোনো দেশ নেই, কোনো জাতি নেই, আমরা আর কেউ ভারতীয় কেউ আমেরিকান নই, আমরা সবাই একই গ্লোবের নাগরিক। আর তাই যদি হয় তাহলে তো কোনো অসাম্য নেই। কিন্তু আমরা সেটা মনে করি না। আমরা মনে করি তৃতীয় বিশ্ব আজো আছে। এবং এই ঠিকানা কেড়ে নিতে চাওয়া তৃতীয় বিশ্বকেই আমরা ডেকেছি মার্জিন অফ মার্জিন বলে।

পোস্টমডার্নিজম মনে করছে আমরা আজ পরস্পর পরস্পরকে অতিনিয়ন্ত্রণ করছি, তার মানে আমরা পরস্পর পরস্পরের সমান। আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি, যেমন আগেই বলেছি, অতিনিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু সবাই সে অতিনিয়ন্ত্রণে সমান অংশীদার নয়। পশ্চিম আমায় অতিনিয়ন্ত্রণ করে তার মেটোনিম দিয়ে, আর আমি তাকে অতিনিয়ন্ত্রণ করি আমার মেটাফোর দিয়ে। এটাই আমাদের মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন এর তত্ত্ব, যা আমাদের বইতে আমরা বিশদ করেছি।

এবং প্রতিরোধের নতুন তত্ত্ব লেখার জন্যে নোটস তৈরি করে যাওয়াই আমাদের কাজ। এই বই সেই কাজটাই করতে চেয়েছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ প্রতিরোধের তত্ত্ব মার্ক্সবাদ, তার ত্রুটি বোঝার জন্যে প্রয়োজন পোস্টমডার্নিজম, তৃতীয় বিশ্বের নতুন সমাজবাস্তবতাকে বোঝার জন্যে পোস্টকলোনিয়াল থিওরি, এই সবকিছুকে মিলিয়েই সেই তত্ত্ব তৈরি হবে। সারা পৃথিবীর নানা জায়গায় সে কাজ হচ্ছে। আমরা করছি। রেজনিক-উল্ফ, লাকলাউ-মুফে, জিজেক, এবং আরো অনেকেই করছেন। ক্ষমতা অন্তহীন, প্রতিরোধ অন্তহীন।

এবার আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন-এর অবস্থান থেকে আমরা কী ভাবে দেখছি এই পৃথিবীকে সেটা একটু বিশদ করা যাক।

৩৭।। উত্তরআধুনিক ভূগোল

এডোয়ারড সোজা উত্তরআধুনিক ভূগোল বলে একটা বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন আজকের উত্তরআধুনিক লস অ্যাঞ্জেলেস বা এলএ-র ভূগোলের কথা। যেখানে সবকিছু আছে একই সাথে, একই জায়গায়, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিশ্ব সব সেই একই এলএ-তে।

বোরহেস আমাদের আলেফ বলে একটা গল্প বলেছিলেন। একজন বন্ধু, সে সফল লেখক, তার আর এক বন্ধুকে, সে ততটা সফল নয়, নিয়ে গেছিল তার সিঁড়ির নিচের ভাঁড়ারে, সেখানে চিত হয়ে শুয়ে দেখা যায় একটা বিন্দু। সেই বিন্দুটাই আসলে সিন্ধু। শুধু সিন্ধু না, মরু, পর্বত, নদী, নালা, মানুষ, বাঘ, চুড়ি, কবিতা, বাদামভাজা সবকিছু, পৃথিবীর প্রতিটি কিছুই সেখানে আছে, সেই বিন্দুতে। প্রতিটি স্পেস, প্রতিটি টাইম। ধরুন ওই সফল মানে প্রথম বিশ্ব বন্ধুই এডোয়ারড সোজা। যে তার তৃতীয় বিশ্ব বন্ধুকে আলেফ দেখাতে নিয়ে গেছিল।

প্রতিটি ভালো মনের মানুষের মত সোজাও খুব সোজাসুজি তার এলএ-র প্রথম বিশ্বের অভিজ্ঞতা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে চেয়েছেন তার বন্ধু কাম তার অপর মানে আদারের সঙ্গে, তার তৃতীয় বিশ্বের বন্ধুর সঙ্গে। সে ওই একই ভাবে ওই বন্ধুকেও নিয়ে গেল তার সিঁড়ির নিচে। বন্ধু সেটা দেখলও। সেই বিন্দুতে সিন্ধু। কিন্তু তার দৃষ্টির ভার সইতে পারল না আলেফ। তৃতীয় বিশ্বের নজর পড়তেই আলেফ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এই দুই বন্ধু, প্রথম বিশ্বের সোজা, এবং তার অপর, ধরুন তার নাম বেঁকা, এই দুজন এই সোজা আর বেঁকা এরা কি দুজনে একই আলেফ দেখেছিল? এখন তো আর বোঝার উপায় নেই, কারণ, আলেফ তো বিস্ফোরিত হয়ে ভেঙে

টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে গেছে। কিন্তু আলেফ কেন ফেটে গেল? কেন বেঁকার চোখের দৃষ্টি তার অসহ্য বোধ হল?

কারণ, তারা দুজনে একই আলেফ দেখেনি, তাদের দেখার কথা না, সোজা আর বেঁকা, প্রথম বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্ব একই আলেফ দেখতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বও আলেফ দেখল, একই কিন্তু পুরোপুরি এক না। সে দেখল আলেফের মিমিক্রি, আলেফের নকল আর মুখ-ভেংচানো। তার তৃতীয় বিশ্বও আর একটা আলেফ, সেখানেও সব কিছুই আছে, কিন্তু তার এই তৃতীয় বিশ্বের আলেফ হল প্রথম বিশ্বের আলেফের নকল, তার একটা খর্ব বেঁটে এবং খাঁটো সংস্করণ। যে নকল আলেফের মধ্যে রয়েছে উত্তরঔপনিবেশিক পার্থক্য, প্রথম আলেফের একটা উত্তরউপনিবেশ অপর।

হেগেলের ফেনোমেনোলজি অফ স্পিরিটে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে আক্রমণ করেছিল, তাকে জয় করে তাকে তার ভৃত্য বানিয়েছিল। এই ভৃত্য সব শ্রম দিত। আর প্রভু সব ভোগ করত। হেগেলের এই প্রভু তার অপরকে ভৃত্য বানিয়েছিল। তাকে ভেঙে চুরে গলিয়ে ফেলে নিজেরই ছাঁচে বানিয়েছিল নিজেরই প্রতিবিম্ব। হেগেলের প্রভু সরল ছিল, নাদান। এখন উত্তরউপনিবেশ প্রভুরা তাদের ভৃত্যকে আর ভেঙে ফেলেনা, তাদের সংরক্ষণ করে, শুধু নিজের মত করে বদলে নিয়ে, তার সিন্থেটিক হেজেমনি দিয়ে।

চালু সংস্কৃতিবিদ্যা (কালচারাল স্টাডিজ) যা তৈরি হয়েছে আমাদের পরবাসী এনআরআই ভাইবোনদের দিয়ে, বা কলকাতায় তাদের স্যাটেলাইটদের দিয়ে, তা শুধু বোরহেসের গল্পটাকে বোরহেসের মত করে পড়ে। বোরহেসের লাইনে, প্রথম বিশ্বের আলেফের দৃষ্টিতে। (মনে রাখবেন আমাদের আলোচনা, দৃষ্টিতেই বসবাস শ্রেণী নামক বর্গের)। হোমি ভাভা এদের প্রমুখতম। তার পেছনে পেছনে আছেন আরো অনেকে যারা তার অনুসরণ করেন, তাকে আরো নিখুঁত করে তোলেন, বা তাকেই ফের পুনরাবিষ্কার করেন।

তারা একটা সঙ্কর বা হাইব্রিড আলেফের কথা বলেন, হাইব্রিড স্পেসের আলেফ। বিপুলা এ পৃথিবীর সবকিছুই এখন সঙ্কর বা হাইব্রিড, তাই তারা সমান, তাই তারা জমাট দ্রবীভূত এক। তারা সবাই মিলে এখন আলেফ। তাদের কাছে সারা গ্লোবটাই নির্মিত পরবাসীর ইমেজে। এই সঙ্করতার তত্ত্বে আক্রান্ত হচ্ছে নিগেশনের বা নাকচকরণের তত্ত্ব। হেগেলের ডায়ালেকটিক্সে যেমন থিসিস অ্যান্টিথিসিসকে নাকচ করত।পুঁজিতন্ত্র লড়াই করত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে।

এই সঙ্করবাদীরা বলেন বাইনারি বৈপরীত্য আর নেই। তার জায়গায় এসেছে নির্জলা নিট পার্থক্য। আমি সে ও সখার ভিতরে আমার আর তার, তার আর সখার, সখার আর আমার পার্থক্য। এরকম তো থাকেই, একজনের থেকে আর একজন তো আলাদা হয়ই। আমরা সবকিছুকেই বুঝি তারা যা নয় তার বিপরীতে। লাল মানে কালো-না, সবুজ-না, হলুদ-না, ইত্যাদি। এই পার্থক্যদের মধ্যে কোনো গুরুত্ব বা ক্ষমতার ক্রমের মাত্রাভেদ নেই। তারা আর কেউ কাউকে নাকচ করে না, শুধু দরকষাকষি করে। তারা নিগেট করেনা, নেগোশিয়েট করে, ভাভা বলেছিলেন। এবং এই অবস্থায় যাকে আমরা পাই তার নাম দিয়েছিলেন থার্ড স্পেস। বা হাইব্রিড স্পেস। তৃতীয় ভূমি বা সঙ্কর ভূমি।

হাইব্রিড স্পেসের মানুষদের পরিচিতিটাই যাযাবর পরিচিতি। তাদের মূল নেই, তাই তারা ছিন্নমূলও হয়না। তাদের কোনো জাতি নেই, কোনো দেশ নেই। তারা এই পৃথিবীর নাগরিক। হাইব্রিড হয়ে যাওয়া পৃথিবীর। সেখানে কোনো প্রথম বিশ্ব নেই, তৃতীয় বিশ্ব নেই, আছে শুধু হাইব্রিড বিশ্ব।

লাকাঁ তার মুকুর-দশার তত্ত্বে একজন শিশুকে ভেবেছিলেন। যে তার আয়নার সামনে দাঁড়ায় এবং নিজেকে জানার চেষ্টা করে। নিজেকে সে দেখে সোজা, খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা একজন পূর্ণবয়স্কের মত। সেরকমই সে ভেবে নেয় নিজেকে। এটা আসলে একটা ফ্যান্টাসি, কল্পকথা, কারণ, তার মা তো তাকে পিছন থেকে ধরে রেখেছে। যাকে আয়নায় দেখতে পাচ্ছেনা শিশুটি। মা আয়নার ফ্রেমের বাইরে। শিশুটির একটি খামতি আছে, ল্যাক আছে। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। আয়নাটা তাই তাকে একটা উপায় বা সমাধান দিচ্ছে, তার নিজের পায়ে বড়দের মত সোজা হয়ে দাঁড়ানোর বাসনার। সম্পূর্ণ মানুষের ফ্যান্টাসিতে পৌঁছে দিচ্ছে তাকে। ঠিক আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণ আলেফের ফ্যান্টাসির মত। হাইব্রিড সেই আলেফের ফ্যান্টাসির মত, যেখানে সবকিছু আছে, সবাই আছে, সমগ্র আছে। সমগ্র মানুষের ফ্যান্টাসি। সমগ্র বা সম্পূর্ণ বলে যে কিছু হয় এই ফ্যান্টাসি। হেগেলবাদী বা মার্ক্সবাদী সমগ্র-ধারণার ক্ষেত্রে এই ফ্যান্টাসি নিয়ে আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

আর শিশুর ওই প্রতিবিম্বটাকে ভাবুন। সেটা একই সঙ্গে একটা মিমিক্রি, নকল। নকল বা মুখ-ভেংচানো যাই বলুন। তিনমাত্রিক একটা বিশ্বে, দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ নিয়ে বাঁচা একটি শিশুর একটি দ্বিমাত্রিক প্রতিরূপ। আয়নার ছবিটা তো একটা তলে, তার দৈর্ঘ এবং প্রস্থ আছে কিন্তু কোনো বেধ নেই। শিশুটির বদলি একটা দ্বিমাত্রিক খর্ব হয়ে আসা বিকল্প যে

শিশুটিকে নকল করে। নকল করে, কিন্তু পুরোপুরি না। শিশুটির ত্রিমাত্রিক ক্রিয়ার সে নকল করে দুই মাত্রায়। এই নকল বিকল্প তাই শিশুটির মতই ব্যবহার করে, কিন্তু পুরোপুরি না। ফ্যান্টাসির সঙ্কর সম্পূর্ণ আলেফের প্রতিবিম্বে একটা নকল খর্ব বিকল্প আলেফ — এটাই তৃতীয় বিশ্ব।

তৃতীয় বিশ্বের চামচারা ঠিক তাই-ই করে, যা করে প্রথম বিশ্বের ওই শিশু। প্রথম বিশ্বের শিশু তার বাজার ভিত্তিক ভারসাম্য অর্জন করে তার উপযোগিতাকে ম্যাক্সিমাইজ করে, সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে তুলে। সেরকম সেখানে করা যায়, সেই উন্নত বাজারে। অন্তত করছি বলে মনে করা যায়। তাই তার প্রতিবিম্ব চামচারাও এখানে তাই করে। দক্ষতার জয়ধবজা ওড়ায়। এখানে সেই বাজার সেই বাস্তবতা থাক ছাই না-থাক। প্রথম বিশ্বের বাচ্চা সাম্যের কথা বলে স্বাধীনতার কথা বলে। এখানের প্রতিবিম্বও বলে। (সেখানের সেই সাম্য আর স্বাধীনতার ধারণাতেও বিপুল পরিমানে জল আছে, আমরা আগেই দেখিয়েছি।) এখানের প্রতিবিম্ব ময়নাও আউড়ে যায় সেই একই স্লোগান। কিন্তু হায়, এই প্রতিবিম্বেরা সেই সবই করে, কিন্তু পুরোপুরি না, একটু কম, একটু খর্ব, একটু খাঁটো, একটু বেঁটে। করে মেটোনিম দিয়ে। প্রথম বিশ্বের কচি জ্যাকসনের সঙ্গে নাচে, আমাদের নকল কচিরা নাচে জ্যাকসনের ভিডিওর সঙ্গে। ওদের অ্যাকাডেমিকরা সেমিনার করে লাকাঁ দেরিদা লিওতারের সঙ্গে, আমরা সেমিনার করি তাদের পেপার নিয়ে, বা তাদের দেশ থেকে আগত স্পিভাক বা গুহদের নিয়ে।

তৃতীয় বিশ্ব তাই প্রথম বিশ্বের নকল, একটু খর্ব একটা বিকল্প প্রতিবিম্ব। প্রথম বিশ্ব, প্রথম বিশ্বের তত্ত্ব, প্রথম বিশ্বের সংস্কৃতি তার নিজের নকল গড়ে তুলতে থাকে, মিমিক্রি অফ দি ফার্স্ট ওয়র্ল্ড। এই নকল গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই আসে উন্নয়নবিদ্যা, সংস্কৃতিবিদ্যা (ডিভলপমেন্ট স্টাডিজ, কালচার স্টাডিজ)। তাদের কাজের পাতায় পাতায় মানচিত্র গড়ে ওঠে তৃতীয় বিশ্বের। এবং এই বিকল্প খর্ব নকল তৃতীয় বিশ্ব তো চিরকাল সেই বইয়ের পাতাতেই রয়ে যেতে পারে না, তাই ক্রমে তারা রূপ নেয়, আকার পায়, মূর্ত হয়ে ওঠে। (বোরহেসের আর একটা গল্প উকবার তলন অ্যান্ড অরবিস টারশিয়াস-এ, ঠিক এরকমই দেখেছিলাম আমরা, একদল জেলখানার কয়েদি খুব খুব চেয়েছিল একটা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ খুঁজে পেতে, কারণ তাদের জেলার তাদের বলেছিল যে যদি খুঁজে পায় তো তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, তাই মরণপণ চেয়েছিল তারা, এবং তাই খুঁজে পেতেও শুরু করেছিল ওই প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষদের, যে সভ্যতাকে তার কদিন আগেই একটা মেটাফিজিকাল রূপকথার কাহিনী হিশেবে পয়দা করেছিলেন কিছু তাত্ত্বিক পণ্ডিত।)

এভাবেই গড়ে ওঠে পশ্চিমের উত্তরউপনিবেশ। এবং গড়ে তোলে সেই পোস্টকলোনাইজড মনগুলোকে যারা পশ্চিমের বাইরে পশ্চিমকে বাড়িয়ে তোলে গজাতে থাকে, নির্মাণ এবং ধারণ করে। আমরা আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন দিয়ে সেই উত্তরঔপনিবেশিক মননকে ধরতে চেয়েছি। চালু উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্ব উপনিবেশের প্রভু ও প্রজার ভিতর অসমতাকে বোঝে, কিন্তু উত্তরউপনিবেশের এই চলমান উত্তরঔপনিবেশিক অসমতাকে অস্বীকার করে। আমরা সেখানেও পার্থক্য দেখি, এবং আমাদের তত্ত্ব দিয়ে তাকে পুর্নখচিত করি উত্তরঔপনিবেশিক অস্তিত্বে।

উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক চালু তত্ত্ব আমাদের একটা সুখের অনুভূতিতে নিয়ে যেতে চায়। আমরা সবাই সমান এই অতিনির্ণয়ের রাজত্বে। কিন্তু আমরা সেখানে পুর্নলিখন করি অসুখী চেতনাকে, এই অতিনির্ণয় আসলে অতিনির্ণয়ের অভিনয়, মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন।

এই মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশনই আমাদের তত্ত্বের মূল নিজস্বতার জায়গা। যার ভিত্তিটা গড়ে তোলে অন্য আর একটি দার্শনিক ধারণা, মার্জিন অফ মার্জিন। এদের আনতে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছে আরো কিছু দার্শনিক বর্গ নিয়ে। সিন্থেটিক স্পেস, সিম্পটম, ওভারডিটারমিনেশন ইত্যাদি।

মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন একটা দার্শনিক ধারণা যা ওভারডিটারমিনেশনের আপাত সমানতার ভূমিতে বশীকরণ এবং বশ্যতার, বা হেজেমনির একটা দাঁড়ানোর জায়গাকে আবিষ্কার করে। বশীকরণকে, ডমিনান্সকে চিরকাল যে সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট রকমে দেখে আসা হয়েছে তার থেকে তাকে বার করে আনে। ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয়ের ভূমির মধ্যেই তার নিজস্ব সমাপ্তিকে খুঁজে দেয় মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন।

মার্জিন অফ মার্জিন একটা এলাকা যা একমুখী বশীকরণ এবং বশ্যতার সম্পর্ক দিয়ে বোধগম্য হতে অস্বীকার করে। লাকাঁ যুক্তির ভিতর অযুক্তির পুনরাগমন আকারে দেখেছিলেন সিম্পটমকে, রোগলক্ষণকে। যখন সমগ্রতার বোধ দিয়ে যুক্তি দিয়ে আমাদের সব বাসনা আবেগ ইচ্ছা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছি আমরা, হেজেমনির ভিতর নিয়ে আসতে চাইছি, তখন সেই সজ্জিত কাঠামোর যুক্তির শরীরে ফোঁড়ার মত ফলে ওঠে অযুক্তির সিম্পটম, যাকে যুক্তি

কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তার সঙ্গে কৌশলগত এসেনশিয়ালিজমকে মিলিয়েছি আমরা। ধরুন এই লেখাটা — লেখা হচ্ছে শব্দ দিয়ে, সেই শব্দ গুলোর চূড়ান্ত অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব না, কারণ প্রত্যেকের নিজের নিজের অর্থ আছে এবং সেই অর্থগুলোও নিয়তই বদলাচ্ছে, অথচ তাও একটা ধরে নেওয়া অর্থের কাঠামো একটা প্রদত্ত দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখাটা একভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছেও যাচ্ছে। সেইরকম একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম দিয়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বকে ধরতে চেয়ে গড়ে তুলেছি আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন নামক বর্গ। মার্জিন অফ মার্জিন একটা জোর করে গড়ে তোলা ক্ষেত্রজ সারোগেট অপর যা দিয়ে আমরা চালু সমাজক্রিয়ার এবং তত্ত্বের বাইরে থেকে তাকে দেখতে পারি। মার্জিন অফ মার্জিন একটা অন্য নৈতিকতাকে বলে, যা চালু নৈতিকতাগুলোর বাইরে, যে নৈতিকতাগুলোকে আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে, 'জাতীয়তাবাদ', 'প্রভু-ভৃত্য', 'দাসত্ব' ইত্যাদি ধারণাগুলোর ভিতর। (বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন-এর ধারণা, কিন্তু সেটা বলেছি তো আমরা ওই বই দিয়েই) এই বইয়ের নায়ক, আমাদের অ্যান্টি-হিরো, সে কিন্তু কোলাবোরেশন নামক কাজকে ভালো-মন্দর বাইরে, বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল, মনে করে। মনে করে এর বাইরে যাওয়ার তার উপায় নেই। ভালো মন্দ বিচার করাটাই একটা বোকামি। দাসত্বই তার একমাত্র বাস্তবতা, তাই সে অকারণ রোমান্টিসিজম বাদ দিয়ে তার দাসত্বের একটু ভালো প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে। সে মনে করে চালু ওই নৈতিক অবস্থানগুলো ছড়িয়ে আছে সবজায়গাতেই, রামায়ণ থেকে মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল অব্দি। সেই সব নৈতিক অবস্থানের বাইরে তার নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান গড়ে তোলার কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম ব্যবহার করে সেই অ্যান্টি-হিরো।

আমাদের বইয়ের এক দুই তিন সাড়ে তিন চার আর পাঁচ এই ছটা চ্যাপ্টারে আমরা এই মার্জিন অফ মার্জিন-এর দৃষ্টিকোণকে গড়ে তুলেছি। আর সাপ্লিমেন্টে আমরা আমাদের এই অবস্থানের থেকে মার্ক্স-এর ভ্যালু ইকুয়েশনগুলোকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছি, সাধারণ বীজগণিত দিয়ে, এবং সেখানে আমাদের দৃষ্টিকোণকে নিয়ে এসেছি। নতুন ভাবে দেখেছি পুরোটাকে। ভেবেছিলাম এই লেখায় এর পরের এবং শেষ সেকশনে ওই সাপ্লিমেন্টের শেষ কয়েক পাতা থেকে কিছু প্রসঙ্গ সরাসরি নিয়ে আসব। আশা করেছিলাম যে এই দীর্ঘ লেখাটার শেষে সেটা খুব দুর্বোধ্য লাগবে না। সেই আশায় লিখলামও বেশ খানিকটা, কিন্তু তারপরে সেটা ডিলিট করে দিলাম, পুরো বইটার জার্নির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে কিছুতেই সেটায় পৌঁছনো যাচ্ছে না। বড্ড বেশি দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে। এই লেখাটার টেকনিকালিটির সীমিত পরিসরে তাকে আনা যাচ্ছে না। তাই এখানেই থাক। লেখাটা এখানেই শেষ হোক। এটা তো একটা ভূমিকা, তার আর ভূমিকা কতটুকু?

কথাশেষ

এই লেখাটা শেষ হয়ে গেল। লেখাটা টুকরো টুকরোয় লেখা হয়েছে আর টুকরোয় টুকরোয় তার কোয়ালিটি কন্ট্রোল করেছে আমার বন্ধু অভিজিত ঘোষ। যদি লেখাটা ধেড়ায়, তাই, ত্রুটিটা সম্পূর্ণই ওর। আর যদি উৎরে যায় তো সে ক্যালিটা আমার, কী পরিশ্রমই না করেছি, ছাবিবশে ডিসেম্বর থেকে আজ, উনিশ তারিখ, এই লেখাটা এই পঁচিশ দিনে শেষ করতে গিয়ে। লেখাটা পড়তে পড়তে অভিজিত খুব চেয়েছিল যে লাকাঁর প্রসঙ্গটা থাক, একজায়গায় সব গুলো জিনিষ পাবে লোকে। কিন্তু অনেক কথা ভেবে সেটা বাদ দিলাম। কাদের জন্যে লিখছি সেটা একটা বড় ব্যাপার এখানে। চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলে মানুষের কাছে প্রচারের একটা প্রবলেম ছিল তার ফর্সা রং। রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতারকে বেছে নিয়ে তাই তার কথা শোনাতে চেয়ে থাকতে পারেন কৃষ্ণদাস। দেরিদা ফুকো লাকাঁ এই অবতারদের মুখ দিয়ে, মানে এদের ইন্টারপ্রেট করতে করতে, নিজেদের কথা বলিয়ে নেওয়া এরকমই আর একটা বাবা খোঁজার স্ট্র্যাটেজি, যে বাবা খোঁজার ইঙ্গিত করেছি ১৯ নম্বর সেকশনে। এবার যাদের জন্যে এই লেখাটা তাদের কাছে বাবা হিশেবে লাকাঁ অনেক ন্যূন মার্ক্স বা হেগেলের বা আলথুসের গ্রামশির চেয়ে। তাই, লাকাঁ বাদ দিয়ে যদি মোদ্দা কথাটা বলা যায় তো ক্ষতি কী। আর দুহাজার পুজো সংখ্যায় অনুষ্টুপের লেখাটায় লাকাঁকে খুব সহজ করে লেখার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা খুব একটা উৎরেছে বলে নিজেরই মনে হয়নি। এই লেখাটা নিজেও নিজেরই অবস্থানের একটা উদাহরণ হোক না — এক ধরনের একটা সমগ্র হতে চেয়েছিল কিন্তু কিছু অসম্পূর্ণতা রইল, শত চাওয়ার পরেও। কিন্তু সেখানেও স্পষ্ট একটা আরব্ধ ছিল, অপরের ছেলেদের, তথা যদি অন্য কেউ চায় তার কাছেও পৌঁছনো। তাই তার নিজের একটা ওপেনিং ক্লোজার এবং এন্ট্রি-পয়েন্ট ছিল। এটা একটা কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম।

যার চৈতন্যচরিতামৃত এই লেখাটার একটা আদি আদর্শ, তারই কয়েকটা ছত্র দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। কৃষ্ণদাস যে অস্বস্তি থেকে লাইনগুলো লিখেছিলেন, আমারও সেই অস্বস্তিটাই কাজ করছে এই মুহূর্তে, তাও তো সবাই নাও

বুঝতে পারে এই লেখা, শক্ত লাগতে পারে — (এই একটা জায়গায় এই লেখার শর্ত ভাঙলাম আমি, কোনো বই থেকে কিছু আনলাম)

যদি পুনঃ কেহ কহে/ গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ/ তাই করি বর্ণন
সর্ব চিত্তে নারি আরাধিতে।

শুধু লাইন কটাকে পশ্চিম এই প্রভুর সাপেক্ষে পড়ুন। আমরা সবসময়ই আছি এক চাল পরে। পশ্চিম খেলছে সাদা গুটি নিয়ে। আমরা কালো। আমরা অবশ্য শুধু কালো না, বাদামি, হলুদ অনেক রকমই আছি। সাদার স্ট্র্যাটেজি একরকমের, কালোর আর একরকমের। তৃতীয় বিশ্ব প্রথম কালো দাবা চ্যাম্পিয়ন দিয়েছে, দ্রাবিড় বিশ্বনাথন আনন্দ। এখানেও তো একটা জয়েন্ট ফ্রন্ট হতে পারে। ভারতের উত্তরপশ্চিমের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণের লড়াই আজকের নয়। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ কালচারের কৃষ্ণকে রিজেক্ট করেছিল পূর্ব। পৌণ্ড্র বাসুদেব নিজেকে বাসুদেব বলে ডাকতেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। জরাসন্ধ এতটাই গাবিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে যে জরাসন্ধর সঙ্গে জিততে তঞ্চকতা করতে হয়েছিল তাকে। সুবে বাংলার মানুষ ওই কৃষ্ণকে কোনোদিনই নেয়নি। নিয়েছিল প্রেমিক কৃষ্ণ বাঁশিওয়ালাকে। গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হওয়ার পর থেকে আর তার জল পবিত্রতা দায়ী নয়, মানে ফরাক্কার পর থেকে। আমরা সেখানেরই মানুষ। আর আমাদের দক্ষিণতম প্রান্তে ছিল কপিলমুনির আশ্রম। যেখানে ভারতের প্রাচীনতম দর্শন, এবং নাস্তিক দর্শন, সাংখ্য। কি রোমাঞ্চকর রকমে আমরা সুবে বাংলার মানুষ প্রতিরোধ দিয়ে গেছি উত্তরের ব্রাহ্মণ্যকে। আমাদের চৈতন্যকে দিয়ে, সহজিয়া দিয়ে, বাউলদের দিয়ে। কাউবেল্টকে বাংলা চিরকালই নাকচ করে এসেছে। এখন শেষতম আক্রমণ আমাদের উপর হিন্দু ফ্যাসিজমের। কৃষ্ণদাসের লেখা বৃন্দাবন ঘরানার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল গৌড় ঘরানাকে। আসুন আবার আমরা প্রতিরোধ দিই, সেই লেখক কবি দার্শনিক কৃষ্ণদাসের নামে। একটা রাজনীতি ফুরোয়, আর একটা রাজনীতিকে আমাদের সামনে খুলে দেয় বাস্তবতাই।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মত সন্ধ্যা নামে